তোমার পতাকা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্কর প্রকাশন । ১৫।১এ, যুগলকিশোর দাস লেন । কলিকাতা-৬

আমার সাহিত্যকর্ম ও দেশাত্মবোধের প্রথম প্রেরণাস্থল
আমার মাতামহ ও মাতামহী
৺ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেবীর
স্মৃতি-উদ্দেশে

এই লেখকের অন্যান্য রচনা :

দ্বিতীয় অন্তর, জনপদবধূ এই তীর্থ,

সীমান্ত শিবির, পত্রলেখার উপাখ্যান, তীরভূমি,

কর্ণাটরাগ, নগরনন্দিনীর রূপকথা, অপরিচিতের নাম,

দেবকন্যা. সিন্দুর টিপ, ঢেউ উঠে পড়ে, স্বপ্ন সঞ্চার,

কতো আলোর সঙ্গ, নতুন নাম নতুন ঘর, সাক্ষী বালুচর,

অভিমানী আন্দামান, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, নীলাঞ্জন ছায়া, সীমাস্বর্গ,

বিদিশার নিশা, জলকন্যার মন, উত্তরাধিকার, নীলসিন্ধু,

পটমঞ্জরী, আনন্দভৈরবী, নয়ানজুলি,

কৃষ্ণপক্ষের আলো

ইত্যাদি

মুখবন্ধ

এ-বইতে কাহিনীর একটা বাতাবরণ আছে বটে, কিন্তু তবু একে ঠিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া চলে না, বরং 'রম্যোপন্যাস' বলা চলে।

'এপার বাংলা' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে আগ্রহ সঞ্চার করাতে উৎসাহিত হয়ে উঠি। যে সব বই এজন্য পড়তে হয়েছে, তার মোটামুটি একটি তালিকা গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হলো। সবার দেওয়া সব তথ্যই যে নিতে পেরেছি এমন নয়, তবু এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারদের চিন্তার সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছি, এই-ই আমার আত্মপ্রসাদ। যাঁরা কাহিনীর মতো এ-বই পড়বেন, তাঁদের কাছে সাল-তারিখ অনেক সময় বিঘ্নসঙ্কুল মনে হতে পারে, কিন্তু ওগুলি পরিহারও করতে পারিনি অনিবার্য কারণে; মনে হয়েছে, কোনো কোনো পাঠকের কাছে হয়ত প্রয়োজনীয় বলে গৃহীত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একখানি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নাম করতে চাই। বইখানি হচ্ছে ডি-ভি অ্যাথালের লেখা 'দি লাইফ অব্ লোকমান্য তিলক,' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২১ সালে পুণা থেকে। বইখানা আমি পেয়েছিলাম ১৯৬৫ সালে, কোহ্‌লাপুরের কাছে পান্‌হালা পাহাড়ে থাকাকালে। ওখানকার পোস্ট মাস্টার শ্রীবি-কে-কুলকার্ণি বইখানি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। এই বইয়ের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। যদি কেউ কোনোদিন দেশবন্ধুর জীবনী ও বাণী নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে তাঁর কাজে লাগতে পারে মনে করে ভূমিকাটি পরিশিষ্টে যথাযথ ছেপে দেওয়া হলো।

এই বই প্রকাশ করতে প্রকাশক নিতাই মজুমদার যে অপরিসীম যত্ন নিয়েছেন, সে কথা উল্লেখের দাবি রাখে। আর উল্লেখের দাবি রাখে আমার পরমাত্মীয় পরম সুহৃদ শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তাঁদের উৎসাহ ছিল আমার অন্যতম পাথেয়। সর্বশেষে উল্লেখ করবো আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তার সর্বাঙ্গীণ সাহায্য না পেলে 'তোমার পতাকা' লেখাই হতো না।

তীরভূমি

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়ে কোপাই নদী দেখার ফলে সে নদী মনের মধ্যে এমন ছায়া ফেলেছিল যে, টালিগঞ্জ অঞ্চলের আমাদের এই গলিপথ দিয়ে চলতে চলতে বার বার আমার কোপাইয়ের কথা মনে পড়তো। কোপাই কোন্ নদীতে গিয়ে মিশেছে জানি না, কিন্তু আমাদের টালিগঞ্জের এই কোপাই বহু বাঁক নিতে নিতে এক সময় বিশাল এক জনপথে গিয়ে মিলে গেছে। এবং যেখানে গিয়ে মিলেছে সেখানেই, বাঁ-দিক ঘেঁষে ছিল সেই রহস্যময় বাড়িটা।

বলা বাহুল্য, কোপাইয়ের বুকে সেদিন দেখেছিলাম বিশীর্ণ জলধারা, আর আমাদের এই কোপাইয়ে জন-ধারা। সাইকেল আছে, সাইকেলরিক্সা আছে, মাঝে মাঝে ট্যাক্সিও ঢুকে প'ড়ে বিভ্রাট বাঁধায়, বিপরীত দিক থেকে আসা সাইকেল-রিক্সারা তখন নির্গমনের পথ খুঁজে হয়রাণ হয়!

আমার বন্ধুরা এই সঙ্কীর্ণ গলিপথকে হলদিঘাট, থার্মোপাইলি ইত্যাদি হরেক নামে অভিহিত করে, কিন্তু আমি মনে মনে একে যেন কোপাই ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। বছর চারেক মাত্র আমরা এই গলির এক প্রান্তে উঠে এসেছি, কিন্তু এই চার বছরে যতই হেঁটেছি এই পথে, হেঁটেছি আর বাঁক পেরিয়েছি, ততই আমার কোপাইয়ের কথা মনে হয়েছে। কোপাইয়ের দুই তীরে জনশূন্য খোয়াই আর প্রান্তর, হয়তো বা দূরে দূরে দু-একটি কুটিরের আভাস থাকতে পারে, কিন্তু এখানকার কোপাইয়ের দুধারে ঠাসা বসতি, ইটের পর ইট, তবু এক-এক সময় আমার মনে হতো, সব বুঝি খোয়াইয়ে পরিণত হয়েছে, বাড়িঘর মানুষজন সব মিলিয়ে গেছে, পড়ে আছে সর্পিল বাঁক নিয়ে শুধু খোয়াইয়ের রেখা।

অবশ্য এ বিচিত্র মানসিকতার কথা কাউকে যে বলবো এমন মানুষ আমার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে কেউ ছিল না। কলেজের সীমানা পার হবার পরই এ-গলিতে এসে বাসা নিয়েছিলাম, কিন্তু হাঁটা-চলা আর মোড়ে দাঁড়িয়ে জটলা করাই সার হয়েছে, চাকরির দরজা কোথাও খোলে নি। মেজদার পরামর্শ মতো আর একটা বিষয়ে এম-এ দেবার চেষ্টা হয়ত করা যেতো, কিন্তু উৎসাহ আর ছিল না।

তার থেকে যে কাজে মেতে গিয়েছিলাম, তারই উত্তেজনার মধ্যে ডুবে থাকা শ্রেয় মনে হয়েছিল তখন। অথচ আমার মনের গঠনে এমন একটা কিছু আছে, যার ফলে একই সময়ে দুই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করা আমার পক্ষে তেমন অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। একই সঙ্গে মত্ততাও আছে, আবার নিস্পৃহতাও আছে। কোন কিছুতে উৎসাহ ভরে হাত লাগিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে মন চলে গেছে বিপরীত মেরুতে। মনে হয়েছে, দূর ছাই, কী হবে এসব করে? কিন্তু মন এ-দোটানায় থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ কিছু ছিল না, থাকলে সঙ্গীরা হয়ত তাদের বিপজ্জনক মত্ততার মধ্যে আমাকে অত সহজেই টেনে নিতে পারত না। কিন্তু এ-কাহিনীতে আমার স্থান অতি গৌণ বলেই নিজের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার নেই।

বলার শুধু এইটুকুই যে, আমাদের এই সর্পিল ও সংকীর্ণ গলিপথকে যারা থার্মোপাইলি বা হলদিঘাটে পরিণত করেছিল, আমি তাদের সমসৈনিক হওয়া সত্ত্বেও একটা যায়গায় সম্পূর্ণ বিযুক্ত ছিলাম, সেটি হচ্ছে আমার ঐ বিচিত্র মানসিকতার ক্ষেত্র, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে ওদের হল্‌দিঘাটকে বলতাম, কোপাই।

এই কোপাইয়ের বিভ্রম আমার আরও ঘটতো, যখন বড়োরাস্তার মোড়ের সঙ্গে সংলগ্ন সেই রহস্যময় বাড়ির পিছন দিককার উঁচু দেওয়ালে অজস্র 'লিখন' পড়তে পড়তে চোখ তুলে ওপরে তাকাতাম। বড়োরাস্তার দিকে মুখ করেই পুরনো ঐ বাড়িটা উঠেছে, সামনে এক ফালি জমি দেওয়াল দিয়ে ঘিরে নিয়ে। সেকেলে ধরনের উঁচু-উঁচু

ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি, বাইরে থেকে বোঝা যায়, বহুবার এতে সংস্কারের হাত পড়েছে, বহুবার বদলেছে এর রঙ, কিন্তু কোথায় যেন অনড় কিছু রয়ে গেছে, যা শত সংস্কারেও বদলে যাবার নয়। এই চার বছরে বাড়িটার যেটুকু নজরে পড়েছে, তাতে একটি ছোকরা চাকরকেই বার বার আসতে যেতে দেখেছি। একবার ডেকেডুকে তার নামও জেনে নিয়েছিলাম,—নিতাই। নিতাই নিতান্ত শিশু থেকে এ-বাড়িতে আছে। তার মা এ-বাড়ির রাঁধুনী। তার কাছ থেকেই শুনেছিলাম, বাড়ির কর্তামশাই অতি বৃদ্ধ, কোথাও বেরুতে পারেন না, তার একটি মাত্র নাতনী ছাড়া আর কেউ বেঁচেবর্তে নেই। নাতনীটি স্কুল-কলেজে পড়ছে। বন্ধুরা সাক্ষ্য দিয়েছিল, মেয়েটি খুব গম্ভীর, কারুর সঙ্গে মেশে না; কলেজে যেতো আর আসতো, কারুর দিকে তাকাতো না। আজকাল বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ হাতে সাধারণ মিলের শাড়ী পরে তাকে দশটা-পাঁচটা যেতে আসতে দেখা যায়, মনে হয় কোথাও চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়েছে হয়ত।

যেতে আসতে মেয়েটিকে আমিও দেখেছি বার কয়েক। ফর্সা-ফর্সা সুশ্রী মুখ, কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আপনমনে কী যেন গম্ভীরভাবে ভাবতে ভাবতে পথ চলে। কে কী বলছে না বলছে, কে দেখছে না দেখছে, সে-দিকে তরুণী-সুলভ লক্ষ্য একেবারেই নেই।

দাদু নাতনীর এই তো পরিচয়, এর মধ্যে গভীর রহস্যের কিছু নেই। তবু নিঃঝুম বাড়িটার দিকে তাকিয়ে এক-এক সময় মনে হতো, কী যেন এক রহস্য ওর অন্তরালে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। অবশ্য এ-কথা শুধু মনে হতো আমারই, আমার বন্ধুরা এসব নিয়ে মাথাও ঘামাতো না। আমি গলিতে ওদের দেওয়ালের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে দেখতাম, দেওয়ালের সীমা ছাড়িয়ে একটি কুর্চি গাছ হাওয়ায় পাতা কাঁপাচ্ছে, তার পিছনের বিন্দুতে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছেরও সগৌরব ঘোষণা চোখে পড়ে। ওদের বাড়ির পিছন দিকটা যে একটি বাগান,

সেটা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু ঠিক কেমন তার রূপ আমাদের জানা ছিল না। মাঝে মাঝে কুর্চি গাছের ছোট ছোট সবুজ পাতাগুলোর দিকে চোখ পড়তো, কখনো বা ধবধবে সাদা ছোট্ট কুর্চি ফুলও ফুটে উঠতে দেখতাম।

অথচ, কলকাতায় সুদুর্লভ, মৃদু সৌগন্ধে ভরা ঐ শুভ্র কুর্চিফুল বা কবি কালিদাস-বর্ণিত 'কূটজ-কুসুম'-এর এইভাবে বিচিত্র লিখন-চিত্রিত দেওয়ালটির ওপারে নিভৃতে ফুটে ওঠার কথা বন্ধুদের কাছে বলা চলতো না, কারণ, জানতাম ওরা ঠাট্টা করবে, অথবা দল থেকেই বাদ দেবে, বলবে,—তুমি সৈনিকের যোগ্য নও।

তাই মনের ভাব মনেই চাপা রেখে ওদের সঙ্গে একদিন থার্মোপাইলি বা হলদিঘাটের যুদ্ধে মেতে গেলাম। কেন এ যুদ্ধ, কিসের এ যুদ্ধ, এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন জ্ঞান আমার ছিল না. অকর্মণ্যের জীবনে কিছুটা গতিবেগ ও বৈচিত্র্য আনবার জন্যই হৈ হৈ করা। ছোটখাটো সংঘর্ষ লেগেই থাকতো, দুমদাম বোমার আওয়াজে সবাই অভ্যস্তও হয়ে গেছে। কিন্তু সেবার-যে সংঘর্ষটা ভয়াবহ রূপ নেবে, এটা ভাবতে পারি নি! অবশ্য এসব ব্যাপার তলিয়ে আমি কবেই-বা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম? অতর্কিত বিস্ফোরণে কারুর অঙ্গহানি হতে পারে, কেউ মারা পর্যন্ত যেতে পারে, এটা বোঝবার মতো বুদ্ধি সবারই ছিল, কিন্তু অঙ্গহানি প্রকৃতপক্ষে যে কী বস্তু, মৃত্যুর চেহারা যে সত্যিকারের কী,—তা বোধ হয় ঠিক একেবারে নিজের ওপরে না ঘটলে মানুষ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না।

সেদিনকার সেই ভয়াবহ সংঘর্ষে একটা গুলি এসে অতর্কিতে আমার বাম বাহুতে লাগতে আমি টের পেয়েছিলাম যন্ত্রণার স্বরূপটা কী! আমি ভয় পেয়ে দেওয়াল টপকে পালাতে গিয়েছিলাম, এমন সময় গুলিটা এসে বাহুতে লাগলো। আমি হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। হাঁটুর কাছে প্রবল যন্ত্রণা,—আমি আর উঠতে পারলাম না।

কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তটি আমার পুরোপুরি মনে আছে। আমি হলদিঘাটের শত্রুপরিবেষ্টিত রণাঙ্গণে নেই, আমি যেন নির্জন কোপাইয়ের বিশীর্ণ অথচ স্নিগ্ধ জলধারার পাশে শুয়ে আছি। কুর্চি গাছের পাতাগুলো ঝিরঝির করে কাঁপছে, রাতের অন্ধকারেও সে কাঁপন যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। দেওয়ালের ওপারে ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ, বাতি-নেভানো গলিটার নিশ্চিদ্র অন্ধকারের মধ্যে তুপাশ থেকে তুটি টর্চের আলো এসে তরোয়ালের ফলার মতো পরস্পরের সঙ্গে নীরবেই ঠোকাঠুকি করছে। তুমদাম শব্দ হচ্ছে ধোঁয়া উঠছে, —আমি সব দেখছি, কিন্তু আমাকে আর কোন সর্বনাশ এসে স্পর্শ করছে না। রাত্রিশেষের হল্‌দিঘাট যেন কোপাইয়ের ধারে আমাকে ফেলে রেখে দ্রুত তার পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমার জীবনের এই ঘটনাটিকে আরও রোমহর্ষকরূপে বর্ণনা করা যেতো। গলি যেখানে বড়োরাস্তায় মিশেছে, সেখানে, আমাদের প্রতিপক্ষরা একদিন ঢুকে পড়তে আমরা প্রতিরোধ করলাম। ওরা যে আমাদের আক্রমণ করবে এর আভাস আমরা পেয়েছিলাম বলেই সজাগ ছিলাম, নইলে রাত তিনটের সময় গলির মোড়ে ওদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যেতে পারতাম না। 'প্রতিরোধ' 'মোকাবিলা' এসব শব্দ ব্যবহার করছি বটে, আমি কিন্তু এ-দল ও-দল কোনো দলেরই সক্রিয় সদস্য ছিলাম না। একে তরুণ বয়স, তার ওপর বেকার, বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে মিশতে একটা উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া,—এ ছাড়া কোনো মহত্তর লক্ষ্য যে আমার ছিল না,এ-কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু সেদিন সত্যি সত্যি 'কাজ'-এ নেমে প'ড়ে একসময় যথার্থই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হলো, আমি যেন শত্রুব্যূহের মধ্যে প'ড়ে গেছি। তখন হাতে আমার কোনো অস্ত্র নেই, তাই আত্মরক্ষার জন্য উঁচু পাঁচিলে লাফ দিয়ে উঠে পালাতে গিয়েছিলাম।

এর পরের ঘটনা বড়ো বিচিত্র। বঙ্কিমবাবুর বই কবে পড়েছিলাম মনে নেই, কৎলু খাঁ, বিমলা, ওসমান, আয়েষা এইসব নামগুলি স্মরণে আছে। কে কাকে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' বলেছিল তা-ও ঠিক মনে করতে পারছি না,—কিন্তু এ ধরণের একটা রোমান্টিক ব্যাপার যে ঘটেছিল, সেটা ভুলি নি।

আগেই বলেছি, এ-কাহিনীতে আমার ভূমিকা নিতান্তই গৌণ, তাই নিজেকে 'জগৎসিংহ' আখ্যা দেওয়া হাস্যকরই হয়ে দাঁড়াবে। তবু সত্যের খাতিরে এটুকু বলতেই হয় যে, আমার অচেতন এবং রুধিরাক্ত শরীরটাকে বহন করে কোনো একটি ঘরে আনা হয়েছিল এবং জ্ঞান ফিরে আসার মুহূর্তে বিমলা-আয়েষাদের আনাগোনা আমার লক্ষ্য এড়িয়ে যায় নি।

অসহ্য যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে একটি ঘরে শুয়ে আছি, বিমলা-আয়েষারা একসময় অপসৃত হবার পর যার মুখ ভালো করে আমার নজরে পড়লো, তার কথা বঙ্কিমবাবু লেখেন নি। খাকি হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরা ওদের সেই ছোকরা চাকর নিতাই দাঁড়িয়ে আছে। ভয়-পাওয়া ফ্যাঁকাশে একখানা মুখ। বাঁ-হাতে আর ডান হাটুর কাছটাতে প্রবল যন্ত্রণা, তবু তা উপেক্ষা করে পরিহাসের সুরে বলতে গেলাম,—কৎলু খাঁ কই?

গলায় স্বর ফুটলো না, তবে কিছু একটা বলছি ভেবে নিতাই ঝুঁকে বললে,—ভাববেন না, ডাক্তারবাবু আসছে।

বলতে গেলাম,—তুই এখানে কেন? বিমলা কোথায়? আয়েষা? তিলোত্তমা?

কিন্তু উত্তরে নিতাই বললে,—ওপরে কর্তাবাবুর ঘরে ফোন আছে। ফোনে ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে।

বলার চেষ্টা করলাম,—ঘর এত অন্ধকার কেন? কারাগারের কোনো নিভৃত কক্ষে আমাকে রাখা হয়েছে বুঝি?

কিন্তু নিতাই তা বুঝলো না, সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়

-ভয়-করা গলায় হঠাৎ একটু উঁচু স্বরে ডেকে উঠলো,—মা? ও মা? শীগগির এসো।

ধবধবে সাদা কাপড় পরা একটি মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। মাথায় ঘোমটা। হাতে একটা গেলাস বলেই যেন মনে হলো। নিতাইকে কী যেন বললেন। তারপরে আমার কাছে এসে আমাকে নিতাইয়ের সাহায্যে সযত্নে একটু তুলে ধ'রে আস্তে আস্তে গেলাসের দুধটা খাইয়ে দিলেন তিনি।

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হতে লাগলো ঘরখানায় আর অন্ধকার নেই,—এদিককার সার-দেওয়া জানলাগুলি খোলা থাকায় স্বচ্ছ দিনের আলোয় ঘরখানা উদ্ভাসিত। আয়তনে ঘরখানা রীতিমতো বড়ো,—এক পাশে একটা খাটে আমি শুয়ে আছি, অন্য দিকে খানকতক চেয়ার জড়ো করা, একটা ভাঙামতো টেবিলও নজরে আসে।

যন্ত্রণার অবধি ছিল না, তবু মনে হচ্ছিল, এই ঘরখানাকে তিন ভাগে ভাগ করলে যা দাঁড়ায়, তেমনি একখানি ঘরে আমি থাকি, পাশে থাকে মেজদা, বৌদি আর তাদের দুই ছেলেমেয়ে। অন্য ঘরে আমার ছোট দুই বোন আর মা। বাবা থাকেন দূরদেশে, বছরে একবার আসেন, তখন আমারই ঘরে তাঁর অধিষ্ঠান হয়। আমার সব ছাপিয়ে মার মুখখানাই এবার মনে পড়ছিল। আমার খবর কি ওরা পেয়েছে? বন্ধুবান্ধবরাও কি জানে আমার খবর?

এই ধরণের উদ্বিগ্নতায় মন যখন তোলপাড়, তখন ডাক্তার এসে উপস্থিত। পিছনে পিছনে নিতাই আর তার মা। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হাত ধরে টানাটানি, পা ধ'রে টানাটানি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিত্রাহি চিৎকার। এই ডাক্তারের বয়স বড়োজোর বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, বেশ গোলগাল চেহারা, গায়ের রঙটা অবশ্য কালো। এঁকে আমি পাড়ার আশে-পাশে কোথাও দেখিনি। ইনি কোঁড়াফুঁড়ি যা করবার করলেন, তারপরে বাঁ হাতের রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজটা খুলে

ওষুধপত্তর লাগিয়ে আবার নতুন একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপরে পড়লেন পা-টাকে নিয়ে। বললেন,—এ যে বেশ ফুলে উঠেছে। কী দিয়েছো নিতাইয়ের মা? চূণ-হলুদ? ওতে হবে না।

বলতে বলতে আবার টানাটানি, আবার আমার চিৎকার। এবং আমার এবারকার চিৎকারে ঘরে যিনি ছুটে এলেন, তিনি সেই তরুণী মেয়েটি, গম্ভীর মুখে যিনি দশটা-পাঁচটা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। সাদা একটা আটপৌরে শাড়ী পরণে, মাথার চুল খোলা।

ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন,—একে হাসপাতালে পাঠালেই ভাল করতে।

মেয়েটি ধীর পায়ে এগিয়ে এলো, এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারের দিকে ফিরলো, বললে,—কেন, এখানে কী অসুবিধে হচ্ছে?

ডাক্তার আমার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন, ওকে একটু নিচু গলায় বললেন, যদিও সেটা আমি স্পষ্টই শুনতে পেলাম,—অপারেশন করতে হবে যে! হাতের ভিতরে গুলি রয়ে গেছে।

মেয়েটি উত্তর দিলে,—যা করবার আপনাকে এখানেই করতে হবে সলিলদা। নইলে অতদূর থেকে আপনাকে ডেকে পাঠাই?

সলিলবাবুর বোধ হয় ভিতরে ভিতরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল, এবারে রীতিমত বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন,—এসব ঝঞ্ঝাটে কেন যে জড়াও? কতদূর এ গড়াবে, তা তোমরা জানো?

মেয়েটি শান্ত গলায় বললে,—আমি নিমিত্তমাত্র, ঝঞ্ঝাট বলুন আর যাই বলুন তার সঙ্গে জড়িয়ে যাবার মূল হচ্ছেন ঠাকুর্দা। আপনি ত জানেন, শরীর মোটামুটি ভালো থাকলে উনি আজকাল লাঠি ধরে ধরে নিচে নেমে আসেন, ভোরবেলা বাগানে বেড়ান।

বলতে বলতে আমার দিকে নির্দেশ করলো মেয়েটি, তারপরে ডাক্তারবাবুকে বললে,—ওঁকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব স্বয়ং ঠাকুর্দার, আর কারুর নয়। যা আমরা সবাই করছি, ঠাকুর্দার নির্দেশেই করছি,—

আমরা হলে এ ঝঞ্ঝাটে সত্যিই জড়াতাম না, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দিতাম।

—সেটাই ভালো হতো, সলিলবাবু বললেন, কিন্তু স্বয়ং 'তোয়োমা' যখন এতে হাত দিয়েছেন, তখন আর কোনো ওজর-আপত্তি নেই।

মেয়েটি রাগ ক'রে বলে উঠলো,—আমার ঠাকুর্দাকে ঐ জাপানী নামে আপনি ডাকছেন কেন? আমার ঠাকুর্দা কি জাপানী?

সলিলবাবু গভীরস্বরে বললেন,—না, তা নয়। কিন্তু জাপানে যে 'তোয়োমা' নামটি কতো বড়ো শ্রদ্ধেয় নাম তা তুমি জানো না। আজকের ঘটনার সঙ্গে সেকালের একটা ঘটনার এমন মিল খুঁজে পেলাম যে, ঠাকুর্দাকে 'তোয়োমা'র যায়গাতেই বসাতে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছো, আমি কী বলছি? জাপানে আমি যাইনি, জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসও আমার জানা নেই,—যেটুকু জ্ঞান সে ঐ তোমার ঠাকুর্দার কাছ থেকেই পাওয়া। সেই আগে—যখন কলকাতায় শান্তি ছিল, লোকে নির্ভয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারতো, তখন সুযোগ পেলেই তোমাদের বাড়ি চলে আসতাম, ঠাকুর্দা কতো গল্প বলতেন, মনে নেই?

মেয়েটি মুখ নিচু করলো, কিছু বললো না। ডাক্তার বললেন,—দেখেছো, আমার সব মনে আছে। কিন্তু যাক এসব কথা, আমি সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে আসছি। কিন্তু সব কিছু যেন গোপনে থাকে, নিতাই বা নিতাইয়ের মা বাইরে কাউকে খবরদার কিছু বলো না। এঁকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কেউ কি টের পেয়েছে যে ইনি এখানে আছেন?

নিতাইয়ের মা-ই উত্তর দিলো কথার। বললে,—বোধ হয় না। টের পেলে অন্তত ওর দলের ছেলেরা এসে ঢুঁ মারত।

—যাই হোক, সাবধান।

মেয়েটি বললে,—ডাক্তার এ-বাড়িতে আসছে, এতে ওদের সন্দেহ হবে না?

—না বোধ হয়,—সলিলবাবু বললেন,—সাতাশী বছরের বৃদ্ধ যে বাড়িতে বাস করেন, সেখানে ডাক্তারের আনাগোনা স্বাভাবিক। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি সেই কথাই বলবো।

বলতে বলতে সলিলবাবু নিতাইয়ের দিকে ফিরলেন, বললেন—বুঝলে নিতাই ? ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়। তাতে ওঁর ত বটেই তোমারও বিপদ হতে পারে।

নিতাই বললে,—কথা দিচ্ছি, কাক-কোকিলেও টের পাবে না বাবু।

ওদের কথোপকথন মনোযোগ দিয়েই শুনছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছি, সেটা পরিহার করি কী করে ? আমার একটা অভ্যাস ছিল, জ্বরজ্বারী হলে আমার ভীষণ হাসিঠাট্টা করবার ঝোঁক হতো। বাড়িতে মায়ের কাছে—বিছানায় শুয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে হু-হু করে কাঁপছি আর মুখে নানারকম হাসির কথা বলে যাচ্ছি—এরকম ঘটনা বহুদিন ঘটেছে।

যন্ত্রণা ভুলতে এতক্ষণ মনে মনে যেরকম রসিকতায় ভরপুর ছিলাম, সেটা এবার আপনিই সোচ্চার হতে চাইলো। ডাক্তারবাবু যেই আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার নামটা কী ? আমি অমনি রসিকতা করে বলতে গিয়েছিলাম,—জগৎ সিংহ।

কিন্তু আমার আগেই স্বয়ং তরুণীটি বলে উঠলেন,—নাম বোধহয় রতন।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন,—চিনতে নাকি ?

মেয়েটির মুখে একটা সলজ্জ আভা খেলে গেল, মুখ নিচু করে বললে,—ঠিক চিনিনা তবে আসতে যেতে দেখেছি, পাড়ারই ছেলে।

আমি এবার গলায় জোর এনে কোনক্রমে বলে উঠলাম,—আসতে যেতে দেখলেই কি নাম জানা যায় ?

মেয়েটি আমার গলার স্বর শুনে চকিতে আমার দিকে একবার তাকালো, মুখে সেই সলজ্জ আভা তখনো মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু সে কোনো উত্তর দিলো না।

ডাক্তার আমার ক্ষীণকণ্ঠে কিছুটা উত্তেজনার কম্পন অনুভব ক'রে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন,—থাক, কষ্ট হচ্ছে যখন, তখন কথা বলবেন না, নামটা না হয় পরেই শুনবো।

কথা বলার জন্যই কিনা জানি না, আমার চোখের সামনে থেকে সব-কিছু যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তারের মুখ, মেয়েটির অবয়ব। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা অবসন্নতার ভাব। কিন্তু সে-সব উপেক্ষা ক'রে জোর গলায় আমি ব'লে উঠলাম,—রতন আমি হবো কেন? রতন উনি নিজে। রাস্তা দিয়ে উনি যখন হাঁটতেন, তখন রকে-বসে-থাকা ছেলেগুলো 'রতন রতন' বলে চেঁচাতো। উনি হয়ত বুঝতেন না, কিন্তু ওরা ডাকতো ওঁকেই।

বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, আমার চোখের সামনে ওঁদের চেহারাগুলি জলের ওপর ছায়া যেমন ঢেউ লেগে কাঁপতে থাকে, তেমনি ক'রে যেন থরথর করছে, এখুনি মিলিয়ে যাবে। তারই মধ্য থেকে থর-থর ক'রে ক'রে কাঁপা মেয়েটির অস্পষ্ট মূর্তি যেন সুদূর থেকে কথা বললো,—জানি। বুঝলেন সলিলদা, উনি সেই রকে-বসে-থাকা 'রতন'দেরই একজন।

প্রাণপণে চিৎকার ক'রে বললাম—মোটেই না।

কিন্তু আমার সেই চিৎকার একটা মৃদু গলার আওয়াজে পরিণত হলো। ডাক্তার কী লক্ষ্য ক'রে চট ক'রে আমার বুকে হাত রাখলেন। এবার বুঝলাম, বুকটা আমার হাপরের মতো সজোরে ওঠানামা করছিল।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন,—উত্তেজিত হবেন না। সামান্য কথায় এত উত্তেজিত হবার কী আছে?

—উত্তেজনা কী সাধে। উনি ভেবেছেন কী আমাকে! আমি—

হয়ত খুব জোরে জোরে এই কথাগুলি বলেছিলাম, কিন্তু তারপরে আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম, আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে এবং উচ্চারিতই হচ্ছে না। আমি বলতে চেয়েছিলাম,—আমি রকবাজও

নই, বোমা-ছোঁড়া সৈনিকও নই, আমি কী ক'রে যে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা আমি নিজেই ঠিক বলতে পারবো না। হয়ত বয়সের ধর্ম,—এই বয়সেই ত মানুষ বেশি ক'রে সঙ্গী খোঁজে, সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে চায়!

কিন্তু বেশ জানি, আমার কথা ওঁরা কেউই শুনতে পান নি। কী যেন লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে আমার হাতখানা ধ'রে নাড়ি দেখতে লাগলেন, কী ব'লে যেন চেঁচিয়েও উঠলেন, আমি শুনতে পেলাম না, সব যেন মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে গেল, আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরলো, তখন শিয়রের কাছে-বসা যার মুখ আমার প্রথমেই নজরে পড়লো, তাকে তিলোত্তমা, আয়েষা, বিনোদিনী, অলকা, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা প্রমুখ প্রখ্যাতা নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত কিনা বুঝতে পারলাম না। আগেই বলেছি, আমার স্বভাব ছিল, অসুস্থ হলেই মনটা রহস্যালাপেব দিকে ঝুঁকে পড়তো, কৌতুক করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতো।

আমার চোখ মেলার পর চুড়ি-পরা কোমল একখানি হাত যখন আমার ললাট স্পর্শ করলো, তখন অবসন্ন নায়কদের মতোই বলে উঠলাম,—আমি কোথায়?

অর্থাৎ, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি, না, অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছি!

কোমল ছুটি চোখ আমার দিক থেকে ফিরে অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো, মেয়েটি ডেকে উঠলো,—দাদু?

একবার নয়, বার কয়েক সে ডাকলো। তারপর দেখলাম তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ। রেখাঙ্কিত ললাট, কেশবিরল চুলগুলি সব সাদা, মুখে ধবধবে দাড়ি, যদিও তা' খুব প্রলম্বিত নয়, কাঁচি দিয়ে ডগাগুলি যথেচ্ছ ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কপালে, চোখের পাশে গভীর রেখা, ফর্সা মুখখানিতে অজস্র কুঞ্চন,—আমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন, সে চোখে স্নেহ আর

কোমলতা যেন ঝ'রে পড়ছে। থেমে-থেমে কাঁপা-কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন,—কেমন আছো ভাই?

মাথাটা কাত করে জানালাম,—ভালো।

মেয়েটি উঠে তার দাদুকে বসবার জায়গা ক'রে দিলো, টেবিল থেকে ওষুধ নিয়ে এসে আমাকে সযত্নে খাওয়ালো। ঘরে আলো জ্বলছে লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, সময়টা রাত। একটু বেশি রাতই হবে হয়ত। চারদিক কেমন যেন নিশুতি মনে হচ্ছে, কাছেই কোনো ঘরে হয়ত দেওয়াল-ঘড়ি আছে, তাতে ঢং ক'রে একটা আওয়াজ হলো।

বৃদ্ধটি বললেন,—জানো ভাই, পুলিস এসেছিল। বলে কিনা, সার্চ করবো। আমার দিদিমণিটি সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে উত্তর দিলো,—দাঁড়ান, বাড়ির মালিককে ডেকে দিচ্ছি। আমি দিদিমণির কাছ থেকে সব শুনে ঠুক ঠুক করে নিচে নেমে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম,—কী করবেন, সার্চ? করুন? তা' কী ভেবে আর ভিতরে ঢুকলো না, শুধু জিজ্ঞাসা করলো—আপনার বাড়িতে কেউ লুকিয়ে আছে? আমি উত্তর দিলুম,—না।

তারা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো, তারপরে আস্তে আস্তে চলে গেল।

বলতে না বলতে বৃদ্ধ হেসে উঠলেন আপন মনেই, তারপরে বললেন,—ঢুকে পড়লেই বা কী হত? তুমি তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছো। আমি বলতুম, আমার নাতি। খুব অসুখ।

ইতিমধ্যে মেয়েটি আবার কাছে এসে দাঁড়ালো, এবং দাদুর কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চেঁচিয়েই বললে,—সলিলদাকে ফোন করলাম। কাল ভোরেই চলে আসছে সলিলদা।

মেয়েটির চেঁচিয়ে বলার ধরণেই বুঝলাম,—বৃদ্ধ কানে একটু কম শোনেন বোধ হয়।

বৃদ্ধ মেয়েটির কথায় মাথা নাড়তে লাগলেন, বললেন,—সলিল বড়ো ভালো ছেলে। এই বয়সে কত বড়ো ডাক্তার হয়েছে দেখ্।

হবে না কেন, কী বংশের ছেলে! ওর এক জ্যেঠামশায় জাপানে গিয়ে সেখানেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন! টোকিওতে কী নাম তাঁর! আমি টোকিওতে গিয়ে ওঁর ওখানেই ত আগে উঠেছিলুম! কী রে দিদি, খাতাটা নিয়ে বসবি? আমি এখন গড়গড় করে অনেক কথা বলে যেতে পারবো।

মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ ক'রে তেমনি চেঁচিয়েই বললে,—ঠিক আছে, কিন্তু ঘড়ি ধ'রে এক ঘণ্টার বেশি নয়। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এমনিতেই অনেক রাত জেগে ফেলেছো আজ, বুঝলে? আরও জাগলে শরীর খারাপ হবে।

বৃদ্ধ হাসতে লাগলেন, আমার দিকে ফিরে বললেন,—দিদিমণি আমার শরীরের কথা ভেবেই গেল, বুঝলে ভাই? আশী-টাশী পেরিয়ে গেছি কবেই, আসলে ফাঁকি দিয়ে অনেক দিন রয়ে গেলুম, যাওয়া উচিত ছিল আগেই।

কথাটা লঘু সুরেই উনি বলছিলেন, কিন্তু মেয়েটির চোখ ছলছল করে এলো ওঁর কথায়, বললে,—চুপ করো ত দাদু, ও-সব কথা বোলো না।

দাদু হাসতে লাগলেন, বললেন,—তোমাকে দেখে অবধি ভাই, মনটা বড়ো খুশিতে ভরে গেছে। কেন ভ'রে গেছে জানো? তুমি গুলি খেয়ে বাগানে পড়ে গেছলে, তোমাকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে খুব বড়ো একটা কাজ করছি। তোমাকে পুলিসে খুঁজতে আসায় ত আরো চমৎকার লাগছে আমার! তুমিও সেই পথের পথিক, যে-পথে অনেক মহৎ লোক এককালে হেঁটে গেছেন।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ,, গলার স্বর কাঁপতে লাগলো, বললেন,—আমি যে জাপানে তাঁদের নিজের চোখে দেখেছি! সান-ইয়াৎ সেন, তোয়োমা, লালা লাজপৎ রায়, এম-এন রায়, রাসবিহারী বোস, ডঃ ভগবান সিং জ্ঞানী, হেরম্ব গুপ্ত,—কতো নাম

করবো ? তারপরে আমাদের ঐ সলিলের জ্যেঠামশাই মিস্টার এস, কে মজুমদার ! তিনিও কি কম ?

মেয়েটি এসে ওঁর হাত ধরে নাড়া না দিলে হয়ত তিনি আরও কিছু বলতেন। মেয়েটি বললে,—দাদু ! টেবিলে এসো ! আমায় ডিক্‌টেশন দেবে না ?

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ চল।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমার চোখ তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলো। নাতনীর হাত ধ'রে ঐ ঘরেরই এক কোণে একটা টেবিলের সামনে-রাখা ইজিচেয়ারে বসলেন তিনি, মেয়েটি বসলো টেবিলে, খাতা-কলম নিয়ে, টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে। বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপরে বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলছেন, আর মেয়েটি মুখ নিচু করে লিখে যাচ্ছে। কিন্তু এত আস্তে আস্তে বলছিলেন তিনি যে এখান থেকে আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আগেই বলেছি, ঘরটা ছিল বড়ো, একটা হলঘর বিশেষ। তার এক প্রান্তে কথা হলে অন্যপ্রান্ত থেকে তা বোঝা সহজ নয়। তবু আমার সারা মন উদগ্র হয়ে রইলো, যদি ওঁর কথার একটু কিছুও আমার কানে আসে !

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এত নিচু স্বরে উনি বলছিলেন যে, কিছুই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। তার ওপরে সেই প্রৌঢ়া বিধবাটি এলেন আমার কাছে এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে। আমি উঠে নিজেই সেটা মুখে তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। তিনি নিজেই যত্ন করে সেটা আমাকে খাইয়ে যেমন এসেছিলেন তেমন নীরবেই প্রস্থান করলেন।

আমি ঐ সৌম্য বৃদ্ধের কথাই ভাবছিলাম। বেশ লম্বা চেহারা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। হাতে একটা লাঠি। লাঠি ছাড়া বোধ হয় আজকাল চলতেই পারেন না। ভোরে অর্থাৎ রাত থাকতে উঠে নাকি বাগানে পায়চারী করেন। সেদিন ঐ রকম পায়চারী করতে

কয়তেই নাকি আমাকে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। আমার যত্ন-আত্তি সেবা-শুশ্রূষা যে ওঁরই ইচ্ছায় হচ্ছিল, সে কথা কোনো মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কেন?

ভদ্রলোক জাপানে ছিলেন। সেখানে উনি যাঁদের দেখেছিলেন বললেন, তাঁদের নাম কি আমি শুনেছিলাম? হয়ত বা আবছা শুনেছিলাম কয়েকজনের নাম, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে আমরা জানি কতটুকু? তাঁরা মহৎ ব্যক্তি, তাঁদের পথে নাকি আমরা হাঁটছি। অন্ততঃ বৃদ্ধের এই মত। কিন্তু নিজের মনেই প্রশ্ন জাগলো, কী ওঁদের পথ ছিল ঠিক জানি না, আমাদের কী কোনো নির্দিষ্ট পথ আছে? অন্ততঃ আমার জানা নেই। আমি হুজুগে-মত্ত হওয়া ছেলে, আমি কোন বিশেষ পথিক যে নই, সেকথা আমার থেকে বেশি আর কে জানে? এখন আমার মনে হচ্ছে, উনি আমাকে বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছেন। হয়ত বা উনি ভেবে নিয়েছেন আমি বিপ্লবী। কী সাংঘাতিক ভ্রম!

অথচ ওঁর এই বিভ্রমের অপনোদন আমি করি কী ভাবে? ভিতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম। কানে আসছে অদূর থেকে বৃদ্ধের গম্ভীর অথচ নিম্ন কণ্ঠস্বর। সবটুকু বোঝা যাচ্ছে না, শুধু ছিটকে আসছে দুটি একটি কথা—'গদর পার্টি', 'কামাগাতামারু' জাহাজ, 'ডঃ হরদয়াল' ইত্যাদি।

কেন জানি না, ওঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক আর যে-জন্যই হোক, আমি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছিলাম ওঁর প্রতি। ইচ্ছা হচ্ছিল, উঠে গিয়ে ওঁদের পাশে চুপচাপ বসি, মন দিয়ে শুনি ওঁর কথা। কিন্তু আমি অসহায়। সর্বাঙ্গে ব্যথা আর দুর্বলতা নিয়ে আমি বিছানায় প'ড়ে রইলাম, আর সেই মেয়েটি মুখ নিচু ক'রে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় একমনে লিখে রাখছে তার দাদুর কথাগুলি।

কিছুক্ষণ মানসিক অস্থিরতায় কাটাবার পর হঠাৎ আমার মনে জাগলো আরেকটি কথা। যাঁদের কথা উনি উচ্চারণ করলেন,

তাঁদের কথা ভাল ক'রে আমরা জানতে পারিনি কেন? আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছিলাম বাংলায়। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র,—অনেকের লেখাই আমাদের পড়তে হয়েছে, কিন্তু এঁদের কথা পড়িনি কেন? কেন এঁদের কথা আমাদের পাঠ্য বইতে ছিল না? ইতিহাসে আমার একটু অনুরাগ ছিল, দাদাদের কথায় ইতিহাসে এম এ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তার পাঠ্যতালিকায়ও ত এঁদের প্রসঙ্গ নেই। কেন নেই? কেন আমাদের জানতে দেওয়া হবে না এঁদের কথা? যারা আমাদের ক্লাসে এসে পড়াতেন, তারা প্রসঙ্গক্রমে দেশ-বিদেশের মুক্তি আন্দোলনের কত কথাই না আবেগভরে তুলে ধরতেন, এঁদের কথা বলতেন না কেন? কে ওঁদের কণ্ঠরোধ করতো? কিম্বা হয়ত এমনও হতে পারে, ওঁরা নিজেরাই এঁদের সম্বন্ধে জানেন না কিছু, জানতে হয়তো চেষ্টাও করেন নি। কেন করেন নি? কেন ওঁদের মধ্যে এঁদের সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার হয়নি? কেন?

এই রকম অজস্র প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল সেদিন সারারাত ধ'রে। অবসন্ন মন আর দেহ নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। সেই বিধবা মহিলাটি আর নিতাই আমার কাছে দাঁড়িয়ে। আমার চোখ-মুখ মুছিয়ে দিলেন তিনি। নিতাই প্যান নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহিলাটি মায়ের মতো স্নেহে আমাকে চা খাওয়ালেন, বিস্কুট খাওয়ালেন। এবং এর কিছু পরেই ঘরে এসে ঢুকলো সেই মেয়েটি। দেখে মনে হয়, সবে স্নান করে এসেছে, মাথার চুল পিঠের ওপর ফেলা, পরণে একটা সাধারণ গোলাপী শাড়ী। ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, খুশি-খুশি মুখখানা শিশির-ধোওয়া ফুলের মতোই স্নিগ্ধ। বললে,—চা খেয়েছেন?

মাথা নেড়ে জানালাম,—হ্যাঁ।

সে বললে,—সলিলদার ফোন এসেছিল। উনি এতক্ষণে রওনা

হয়েছেন, এসে পড়লেন বলে। আজ সকালটা এখানেই কাটাবেন, খাওয়া-দাওয়াও করবেন। খুব গল্প-গুজব হবে, দেখবেন।

বলতে-বলতে হঠাৎই আমার চোখে-মুখে কী লক্ষ্য ক'রে একটু কাছ ঘেঁসে ঝুঁকে দাঁড়ালো, নিচু গলায় বললে—মন খারাপ, বাড়ির জন্য?

স্পষ্ট উত্তর দিলাম—না।

—তবে? যন্ত্রণা হচ্ছে?

অল্প একটু হাসলাম মাত্র, উত্তর দিলাম না।

সে বললে,—সলিলদা আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।

বললাম,—আপনার দাদুর কথা ভাবছি।

একটু যেন অবাক হলো,—কী ভাবছেন। দাদুকে নিয়ে?

—উনি জাপানে ছিলেন?

—হ্যাঁ। অনেক দিন।

—কতো বয়স হলো?

বললো,—এইখানটায় ওঁরও ভুল হয়। কখনো বলেন, একাশী, কখনো সাতাশী।

—কানে একটু কম শোনেন, না?

—হ্যাঁ।

বলতে-বলতে মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, একটু হাসলো, মন্তব্য করলো,—বাঃ! এই ত বেশ কথা বলছেন! এ-ক'দিন আপনার মুখে কথাই শুনিনি। যদিও বা দু-একটা বলেছেন, ত খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে।

বললাম,—তা হবে। কিন্তু এই হাতটা এখনো নাড়তে পারছি না। পাশ ফিরতে পর্যন্ত কষ্ট।

আবার একটু ঝুকে আমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা দেখলো, তারপর বললে—সলিলদা আসছেন কী করতে? এইজন্যই ত! আপনাকে ভালো করে তুলতে।

—আপনার দাতু কোথায় ?

চোখ তুলে সামনের দরজাটা দেখিয়ে বললে,—ঘরে !

—ঐ ঘরেই উনি থাকেন ?

বলতে-বলতেই আবার একটু হাসলো মেয়েটি, বললে,—আমিও আছি, আপনার পিছনে।

বুঝলাম, আমার পিছনদিককার ঘরখানা ওর। তার মানে আমাকে মাঝখানে রেখে, ওঁরা তু-জনে তু-দিকে আছেন।

বললাম,—আচ্ছা, আপনার দাতু কোনো বই লিখছেন, না ? ঐ যে কাল রাত্রে—

মেয়েটির মুখখানা প্রদীপ্ত দেখাচ্ছিল। বললে.—বই হবে কিনা জানিনা, তবে লিখে রাখছেন।

বললাম,—উনি বলে যান, আর আপনি লেখেন, তাই না ?

মেয়েটি বললে,—হ্যা। উনি নিজে হাতে লিখবেন কী ক'রে ? ওঁর হাত কাঁপে। চোখেও ভালো দেখেন না। পুরু কাঁচের চশমা থাকা সত্ত্বেও একটানা পড়তে ওঁর কষ্ট হয়। সেজন্য সকালে আমার কাজ হচ্ছে, খবরের কাগজখানা ওঁকে পড়ে শোনানো।

—আজ শুনিয়েছেন ?

বললে,—ক-খ-ন। পাঁচ মিনিটে কাগজ পড়া শেষ। শুধু হেডিংগুলো শোনেন, আর কিছু না। খুব জরুরী কিছু থাকলে, হয়ত সেটা একটু পড়লাম, ব্যস।

এই সময় দরজায় সেই বিধবা মহিলাটিকে দেখা গেল, হাতে তাঁর প্লেট, ইত্যাদি। মেয়েটি বললে,—নিন, আপনার জলখাবার এসে গেছে। আমি দেখি, দাতু কী করছে !

মেয়েটি লঘু পায়ে সামনের দরজা দিয়ে দাতুর ঘরে চলে গেল। আমার কাছে এলেন সেই বিধবা মহিলাটি। তাঁর দেওয়া এক গেলাস তুধ, হালুয়া আর আপেলের টুকরোর সদ্ব্যবহার করছিলাম, এমন সময় ব্যাগ-ট্যাগ হাতে নিয়ে কলরব করতে করতে ডাক্তারবাবু

এসে হাজির। প্রথমেই পড়লেন তাঁর রোগীকে নিয়ে,—কেমন আছেন ?

—ভালো!

বললেন—ভেরি গুড। ওদিকে যা ভেবেছি, তাই। রাস্তায় ধরেছিল তোমার বন্ধুরা। 'তুমি' বলছি বলে মনে কিছু কোরো না, বয়সে তুমি ঢের-ঢের ছোট।

হেসে বললাম,—নিশ্চয়ই বলবেন। কিন্তু ওরা আমার 'বন্ধু' বুঝলেন কী করে ?

বললেন,—জিজ্ঞাসা করছিল, ও-বাড়িতে অসুখ কার ? আমি বললাম,—তোয়ামার। ওরা হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। 'তোয়ামা'কে ওরা চিনবে কী করে ? তখন হেসে বললাম,—ও-বাড়িতে একজন বুড়োমানুষ বাস করেন, দেখেছো ? তাঁকে আমি 'তোয়ামা' বলে ডাকি। কিন্তু ওরা কি অত সহজে ছাড়বার পাত্র ? বললে,— ও-বাড়িতে অন্য কোনো রোগী নেই ? আমি অবাক হবার ভান করে বললাম,—কই, না! আর কিছু বললে না ওরা, ছেড়ে দিলে।

বললাম,—ওরা 'স্পাই'-ও ত হতে পারে!

হেসে উঠলেন,—স্পাইরা দলবেঁধে থাকে নাকি ? তা নয়, দঙ্গল মিলে একটা রকে বসেছিল। আমাকে দেখে চট্ করে উঠে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। একবার ভাবলাম, যাক গে বলেই ফেলি। তারপরে ভাবলাম, না বাবা, দরকার নেই, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে! কিন্তু সে যাই-ই হোক, তোমাকে দেখে আজ ভালো লাগছে। অনেক ইম্প্রুভ্‌ড। এবার ভাই, তোমার নামটা বলে ফেলো ত ? নাম না হলে মুস্কিল। ডাকাডাকি করবো কী ভাবে ?

বললাম,—সঞ্জয়। সঞ্জয় চ্যাটার্জী!

—কী বললে,—চ্যাটার্জী!—বলতে-বলতে হো-হো করে হেসে উঠলেন,—বাপ্‌বাঃ! একেবারে পাল্‌টি ঘর!

—মানে!

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বললেন,—যে বাড়িতে রয়েছো, এরা 'ব্যানার্জী'। কী, পাল্‌টি ঘর হলো না?

এবং কী আশ্চর্য, ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে ঠিক সেই মুহূর্তেই দাদুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো সেই মেয়েটি। পাছে ডাক্তারবাবু আর কোনো রসিকতা করে বসেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—জানেন ডাক্তারবাবু, আমার ঐ তোয়ামা না কী বললেন, তাঁর কথা বড়ো জানতে ইচ্ছে করে।

ডাক্তারবাবু মেয়েটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন,—কোন্ তোয়ামা, এখানকার না, জাপানের?

মেয়েটি হাসি-হাসি মুখে ওঁর কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে,—জানেন সলিলদা, কাজ অনেকটা দূর এগিয়েছে। দাদু কাল বেশ খানিকটা ডিক্‌টেশন দিয়েছেন।

—বটে! তাহলে শুনিয়ে দাও!

মেয়েটি উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালো একবার, ডাক্তার-বাবুর দিকে ফিরে বললে,—এঁরই জন্যে। এঁকে পাবার পরই দাদু আবার সব মনে করতে পারছেন।

সলিলবাবু হেসে আমার দিকে নির্দেশ করে উত্তর দিলেন,—তাহলে সঞ্জয় ভায়ার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মেয়েটি চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বলে উঠলো, কিছুটা চাপা গলায়, নাম বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, সঞ্জয় চ্যাটার্জী। কিন্তু আমরা দেরি করছি কেন? শুরু করো?

মেয়েটি বললে,—বারে, সবে এলেন, চা-টা খান, তারপরে—

—আসুক না চা-টা, ততক্ষণে শোনা যাক।

মেয়েটি ডাক্তারবাবুর পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো, বললো,—কিন্তু উনি—অর্থাৎ আপনার রোগী—

বাধা দিয়ে সলিলবাবু বলে উঠলেন,—আমার রোগীর অবস্থা সুপারফাইন। কিন্তু তুমি আর দাঁড়িও না, দৌড়ে খাতা নিয়ে এসো।

—এখানেই?

—তা হোক না। শুনুক। কী ভায়া, আপত্তি আছে?

মাথা নেড়ে জানালাম,—না।

মেয়েটি দ্রুতপায়ে তার দাদুর ঘরে ঢুকে গেল।

সলিলবাবু আমার দিকে ফিরলেন, বললেন,—আমার এক জ্যেঠামশাই জাপানে বহুদিন ছিলেন। দাদু তাঁর কাছেই গিয়ে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। সেজন্যই বুঝতে পারছো, আমার ইন্‌টারেস্ট কোথায়?

বললাম, —আচ্ছা, এই দাদুটি কে? ইনি কেন জাপানে গিয়েছিলেন?

ডাক্তারবাবু বললেন,—অনেক আগে—১৯১৪-১৫ সালের কথা হবে বোধহয়—সঠিক সাল আমি বলতে পারবো না—তখন দেশী শিল্প প্রবর্তনের যুগ। সেই সময় দেশী শিল্প যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা কিছু কিছু শিক্ষানবিশকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন। এই দাদু—এঁর নাম শ্যামলেন্দু ব্যানার্জী—গিয়েছিলেন এনামেলের কাজ শিখতে। বাড়তি হিসেবে আরও কী-কী সব শিখে এসেছিলেন আমি জানি না। এখানে এসে পার্টনারশিপে এনামেল-কারখানা তৈরি করেন, আরও কী-সব ছোট-খাট শিল্প গ়ড়ে তুলেছিলেন। পরে শুনেছি, একমাত্র ছেলে মারা যাবার পর কী রকম যেন নির্লিপ্ত হয়ে যান। এককালে পয়সাকড়ি করেছিলেন; এখন বিশেষ কিছু নেই, এই বাড়িখানা ছাড়া। বাকিটা ত দেখতেই পাচ্ছো। একমাত্র নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই। বয়সও হয়েছে যথেষ্ট, সব-কিছু মনে রাখতে পারেন না। অথচ, মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যেন স্মৃতির দরজা হঠাৎ খুলে যায়,—দিব্যি গড় গড় ক'রে বলে যান। ঐ নাতনী—শেফালীই সব যত্ন করে টুকে রাখে।

ইতিমধ্যে খাতাখানা নিয়ে সেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকলো। বললো,—কাল অনিয়ম হয়েছে ত? একটু বেশি রাতে শুতে গিয়েছিলেন, এখন দেখছি বিছানায় শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাতাখানা খুঁজে খুঁজে পাই না, শেষে দেখি ওঁর বালিশের তলায় পড়ে আছে। খুব আস্তে, যাতে ওঁর ঘুম না ভাঙে, এমনভাবে তুলে নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছো। বসো এবার এই চেয়ারটায়।

বলে এগিয়ে গিয়ে চট্ করে নিজেই একটা চেয়ার টেনে আনলেন।

—একী—আপনি কেন—কী আশ্চর্য!

কিন্তু শেফালীর কোন বারণই তিনি শুনলেন না, চেয়ারটা টেনে এনে ওকে বসতে বলে নিজে আসন গ্রহণ করলেন,—তোমার দাদুর কথাটা ভায়াকে বলছিলাম। শিল্পপতি মানুষ, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে ত কোনদিন দেখি নি। অথচ, কত আগ্রহ নিয়েই না সেদিনকার মানুষগুলোকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন জাপানে। ভাবতে অবাক লাগে, তাই না?

শেফালী বললে,—আমিও কি কোনদিন জানতাম? বাবাকে আমার বিশেষ মনে পড়ে না, কিন্তু মা ত গেল এই কয়েক বছর মাত্র। কিন্তু মা-ও ঘুণাক্ষরে আমাকে কিছু জানায় নি। হয়ত মা-ও কিছু জানতো না।

—কিন্তু আর দেরি ক'রো না, শুরু করে দাও।

শেফালী তবু ইতস্তত করছিল,—আপনার জলখাবারটা—

—কিছু ভেবো না,—সলিলবাবু বললেন,—পেটুক মানুষ এসে পড়েছি, বামুন দিদি ঠিক তার কাজ করে চলেছে। সময়ে ঠিক এসে পড়বে। নাও, আর দেরি নয়, পড়ো।

খাতাটা খুলে ধ'রে চকিতে এক মুহূর্তের জন্য আমার মুখের দিকে তাকালো শেফালী,তারপরে বলতে লাগলো,—

ইয়োকোহামা বন্দর। আমাকে মজুমদার-দা কেন ওখানে পাঠিয়েছিলেন আজ তা মনে নেই, হয়ত তাঁর ব্যবসার ব্যাপারেই হবে। সেখানে যে সিন্ধী ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলুম, তিনি সন্ধ্যাবেলায় এক ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি গিয়েছিলুম। তখন অর্থাৎ সেই ১৯১৫ সালে, ওখানে রেশম আমদানী রপ্তানীর অফিস ছিল সিন্ধী ব্যবসায়ীদের। এ-পার্টির আয়োজন করেছিলেন তাঁরাই। সেখানে আলাপ হলো জয়মল বলে এক রেশম ব্যবসায়ীর সঙ্গে। কিন্তু তখন কি জানতে পেরেছিলুম এই রেশম-ব্যবসায়ীটি কে? পরে টোকিওতে ফেরার পর মজুমদার-দার কাছ থেকে সব জানতে পেরেছিলুম। তা-ও অনেকদিন পার হয়ে যাবার পর। যখন উনি বিশ্বাস করে আমাকে সব বললেন, তখন আমার মনে এঁদের কথা জানবার জন্য এক দারুণ আগ্রহ জন্মালো। আস্তে আস্তে আমি জানতে পারলুম। কোন্‌টা আগে জেনেছিলুম, কোনটা পরে, আজ ঠিক ক'রে বলতে পারছি না।

আজকের দিনে গদর-পার্টির খবর কজন রাখে জানি না, কিন্তু তখনকার দিনে কাগজে কিছু কিছু ছোটোখাটো খবর থাকতো, তা থেকে মানুষ এই পার্টির নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। নামটা জানতো বটে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ জানতো কী? সুদূর ক্যানাডায় এই পার্টির জন্ম বলে শুনেছিলুম। তাঁরা, অর্থাৎ ক্যানাডাবাসী ভারতীয়রা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছিল। তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে। বিশেষ করে বাংলার বিপ্লব-সাধনার সঙ্গে। দেশের ভিতরে-বাইরে এই বিপ্লব যদি যুগপৎ সাধিত হতো, তাহলে ভারত স্বাধীন হ'তো অনেক আগেই। কিন্তু একদিকে ছিল ব্রিটিশের দমন নীতি আর অন্যদিকে ছিল কিছু বিভীষণের দৌরাত্ম্য। তাই সব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। যতদূর মনে পড়ে সেটা ১৯১৩ সালের কথা। কামাগাতামারু জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আছে সন্দেহ ক'রে কলকাতার কাছে বজবজে গুলি

চালিয়ে ব্রিটিশ শাসনশক্তি সেদিন কতো যে নিরীহ যাত্রীর প্রাণ হরণ করেছিল তার হিসাবই বা কে দেবে?

আমি জাপানে বসেই শুনেছিলাম, গদর পার্টির লোকদের ক্যানাডা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবীরা কি দমে যাবার পাত্র? তাঁরা আমেরিকায় গিয়ে আবার সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। লালা হরদয়াল ছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

আমি ইয়োকোহামা বন্দরে যাঁর দেখা পেয়েছিলাম, তিনি হরদয়াল নন, তিনি অন্য ব্যক্তি। আগেই বলেছি তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন জয়মল বলে। এই জয়মল যে রেশম-ব্যবসায়ী নন, তা আমি অনেক পরে শুনেছিলাম। এঁকে ইয়োকোহামার সিন্ধীরা চিনতেন, তাঁর সঙ্গে বেশ সম্ভ্রম সহকারেই ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন দেখছিলাম। সাধারণ রেশম-ব্যবসায়ীর সঙ্গে কি লোকে ও-ভাবে কথা বলবে? পরে শুনেছিলাম, এই সিন্ধীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বহুদিনের। উনি এর আগে বছর তিনেক হংকং-এর গুরুদ্বারায় "গ্রন্থি" হিসাবে যখন ছিলেন, তখন থেকে ওরা ওঁকে চিনতো, ওঁর অনেক বক্তৃতাও শুনেছে তখন। এই সব সিন্ধীরা ব্যবসার খাতিরে আমেরিকা ফিলিপাইন, জাপান, চীনে যখন যাতায়াত করতো, তখন তাদের হংকং-এ নামতে হতো। কেউ জাহাজ বদলাবার জন্যে নামতো, কেউ নামতো ব্যবসার জন্য। তারা সব থাকতো হংকং-এর ঐ গুরুদ্বারায়। "গ্রন্থি" হিসাবে ঐ মন্দিরে থাকার সময় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে দুবার ইতিমধ্যে কারাবরণও করতে হয়েছে। এই সব কারণে তাঁকে দক্ষিণ এশিয়া, চীন ও জাপানের প্রবাসী ভারতীয়রা সবাই অল্প-বিস্তর চিনতো। ১৯১৩ সালে তাঁকে যখন ক্যানাডা থেকে বহিষ্কার করা হলো, তখন ত তিনি এসব অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতনামা পুরুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। যেমন প্রথম দর্শনে চিনতে পারিনি আরেকটি মানুষকে। তিনিও ভারত-থেকে-আসা এক জাহাজে করে সবে নেমেছেন ইয়োকোহামা বন্দরে। এই দুটি পুরুষের

সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এই ইয়োকোহামা বন্দরেই ঐ ডিনার পার্টিতে। তাঁকেও আমি দেখেছিলাম !! কিন্তু চিনবো কী করে ?

ওঁরা দুজনে খাবার টেবিলে যাবার আগে একান্তে গল্প করছিলেন। জয়মল যাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন, তিনি বাঙালী, ডাক্তারী পড়তে নাকি আমেরিকা যাচ্ছেন। জয়মল তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন এই কথা জানতে যে, তিনি সদ্য দেশ থেকে আসছেন, দেশের টাট্‌কা খবর অবশ্যই তিনি দিতে পারবেন। জয়মল সাত বছর দেশ ছাড়া। সাত বছর আগে দেশ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। যাতে ইয়োকোহামার গোয়েন্দারা টের না পায়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, নাম নিয়েছিলেন জয়মল, পরিচয় দিয়েছিলেন রেশম-ব্যবসায়ী বলে। অথচ 'জয়মল' নামধারী এই ব্যক্তিটি তখন দূর প্রাচ্যের বিপ্লবী যোদ্ধাদের সেনাপতি বা নেতা হিসাবে কাজ করছিলেন। এক হাজারেরও বেশি তাঁর যোদ্ধাদের সংখ্যা। এদের মধ্যে অনেককে আবার ছদ্মবেশে ভারতে পাঠানো হয়েছিল বিপ্লবের কাজ সংগঠিত করবার জন্য। তার মধ্যে নারী, পুরুষ দুই-ই ছিল। এখানে বলা দরকার, ইংরেজ তখন জার্মানীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে ব্যাপৃত, এই সময় দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত বলে বিপ্লবীরা মনে করতেন।

এইরকম পরিস্থিতিতেই সেই আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ডাক্তারটির সঙ্গে গল্প করছিলেন জয়মল। সিন্ধী ব্যবসায়ীরা বিপ্লবীদের প্রতি সমব্যথী ছিলেন, তাঁদের সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো মতামত দিতে বা মন্তব্য করতে শঙ্কিত ছিলেন। অথচ এই বাঙালী তরুণ যুবকটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছিলেন জয়মলের সঙ্গে। এবং এ-বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে জয়মল সেদিন মনে মনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। ডিনার শেষে বিদায় নেবার মুহূর্তে যুবকটি হঠাৎ জয়মলকে নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন,—সত্যি বলুন ত আপনি কে ? জাপানে কী করছেন ?

জয়মল হেসে উত্তর দিলেন,—নাম ত বলেছি জয়মল, আমি রেশমের ব্যবসা করি।

যুবকটি গাঢ়কণ্ঠে বললেন,—আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা যদি আপনার মতো দেশপ্রেমিক হতো, যদি থাকতো তাদের আপনার মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাহলে দেশ এতদিন ধ'রে ব্রিটিশের পদানত থাকতো না।

জয়মল একটু অবাক হয়েই তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তরুণটি একটু হাসলেন, বললেন,—আসুন না কাল সন্ধ্যাবেলা, আমার ওখানেই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবো!

বলে, যুবকটি তাঁকে তাঁর ঠিকানা দিলেন। জয়মল রাজী হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন যথারীতি পরদিন সন্ধ্যায়। ছোট্ট ঘরে একাই ছিলেন, সাদরে কাছে এনে বসিয়ে জাপানী প্রথায় চা এগিয়ে দিলেন তিনি। যখন তিনি চা ঢালছিলেন, তখন জয়মল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর হাতের দিকে। আগের রাত্রে যখন প্রথম আলাপ হয়েছিল, তখন তাঁর হাত দুটি দস্তানায় ঢাকা ছিল। আর আজ সেই হাত দুটি খোলা ছিল বলে তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর বাঁ-হাতের ওপরে বেশ বড়ো একটা কাটা দাগ। কিন্তু এই দাগটা তিনি কাল দস্তানা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন কেন? হঠাৎ-ই একটা কথা তাঁর মনে জেগে উঠলো। মনে পড়লো, হংকং-এ গুরুদ্বারায় বসে লাহোর থেকে প্রকাশিত 'জিমিদার' বলে একটি উর্দু কাগজে একজন তরুণের বিবরণ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কাগজটিতে বলা হয়েছিল ইনিই দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলেছিলেন প্রকাশ্য রাজপথে। কাগজটিতে তরুণটির সম্পর্কে অনেক কথা ছিল। কেমন তিনি দেখতে, শরীরের কোথায় তাঁর কী চিহ্ন আছে, সব কথাই ছিল, বোধ হয় সেটা হবে কোনো সরকারী বিজ্ঞপ্তি। ফটো ছেপে দিয়ে আততায়ীর বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকতো ঐসব সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে। জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে এত টাকা পুরস্কার, ইত্যাদি।

ওঁর মনে চকিতে সেই বিজ্ঞাপনের কথাই উদয় হয়ে থাকবে। ওঁর মনে হলো, এইরকম দাগ সেই আততায়ীর বাঁ-হাতে থাকবার উল্লেখও ছিল। আরও একটি চিহ্নের উল্লেখ ছিল। খাবার টেবিলে বসবার জন্য ওঁরা যখন তুজনে উঠলেন, তখন জয়মল লক্ষ্য করলেন, ওঁর পায়ের চেটোতেও একটা ক্ষতের দাগ।

জয়মলের আর সন্দেহ রইলো না। উনি এবার স্থির বুঝলেন, ইনি কে! কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না তখুনি। খাওয়া চলতে লাগলো, সঙ্গে আলাপ আলোচনাও। কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন জয়মল,—আপনি ত বাংলা দেশ থেকে এসেছেন, ওখানকার বিপ্লবের অবস্থা কী রকম?

উনি একটু হেসে বললেন,—অবস্থা আর কী, প্রচণ্ড দমন-নীতি চলছে ব্রিটিশ-সিংহের, কিন্তু বিপ্লবীরাও চুপ করে বসে নেই।

এই ধরণের কথা হতে হতে ওঁরা রাজনৈতিক আলোচনার আরও গভীরে প্রবেশ করলেন। কথা প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের কথাও এলো। পাঞ্জাবের তুজন বিপ্লবীর কথা উল্লেখ করলেন তরুণ ডাক্তারটি। তাদের একজন কর্তার সিং সরবা, আরেকজন ভি-জি পিংলে।

নাম তুটি শুনে জয়মল মনে মনে চমকে উঠেছিলেন। এ তুজন যে গদর-পার্টির লোক। এদের তুজনকে পাঠানো হয়েছিল ভারতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাজ করবার জন্য। সিপাহীদের মধ্যে যাতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা যায়, এদের কার্যকলাপ ছিল সে দিকেই নির্দিষ্ট।

কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। উঠে, পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে ডাক্তার বললেন,—আমি জানি আপনি মামুলি রেশম-ব্যবসায়ী নন। ঠিক করে বলুন ত, কে আপনি?

'জয়মল' নামধারী ব্যক্তিটি হাসলেন, বললেন—আপনিও ডাক্তার নন। আপনার সত্যিকার পরিচয় যদি দেন, ত, আমিও দেবো।

হাসলেন ডাক্তার, বললেন,—আগে আপনারটা শুনি?

জয়মল্ল এবার মৃদু কণ্ঠে বললেন,—আমি গদর পার্টির এশিয়াখণ্ডের অধিনায়ক। আমার নাম ভগবান সিং জ্ঞানী।

ডাক্তারের চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, বললেন,—ভাই ভগবান সিং!

—জী।

ডাক্তার বললেন,—আমি রাসবিহারী বোস।

দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। দুটি সহোদরের যেন মিলন ঘটলো।

॥ ২ ॥

আশ্চর্য, শুনতে শুনতে কাহিনীর মধ্যে এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে, শরীরের সব ব্যথা, সব গ্লানি যেন মুহূর্তে তিরোহিত হয়েছিল। চমক ভাঙলো একটি পদশব্দে। মেয়েটি মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালো, সলিলবাবুও অনেকটা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় ফেরালেন। দরজা দিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো সলিলবাবুর সেই বামুনদিদি। এক হাতে বড়ো একটা চীনেমাটির প্লেট, তাতে স্তূপাকৃত লুচি ইত্যাদি, অন্য হাতে জলভর্তি কাঁচের গেলাস।

মেয়েটি হাতের খাতাটা মুড়ে রেখে ভঙ্গিতে একটা উৎসাহের চাঞ্চল্য এনে বললে,—নিন সলিলদা, আপনার জলখাবার এসে গেছে।

সলিলবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কলরবে মুখর হয়ে উঠলেন না, তিনি যেন কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন। বামুনদিদি তাঁর সামনের টিপয়ে প্লেটটা রাখলো, গেলাসটা রাখলো, শেফালী সাগ্রহে বললে,—খান?

সলিলবাবু খাবারে হাত দিলেন, কিন্তু তাঁর সেই অভাবিত গাম্ভীর্য তখনো অব্যাহত রয়েছে। শুধু একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, তারপরে মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন,—কিন্তু তোমাদের সব কই?

—আমাদের হয়ে গেছে,—বলে মেয়েটি মুখ টিপে একটু হাসলো, বললো,—আপনার রোগীকে লুচি দেওয়া যাবে?

সলিলবাবু চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, দুটি চোখের তারায় এতক্ষণ পরে একটু কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠলো, দ্বিধাগ্রস্তের মতো বললেন,—তা-আরও দু-একটা দিন যাক না?

আমার শরীরে সেই ব্যথার ভাবটা আবার ফিরে এসেছিল। শেফালী আমার ক্লিষ্ট মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে সলিলবাবুকে বললে,—আজ ত ওঁকে দেখবেন ভাল করে?

—তা ত বটেই,—সলিলবাবু বললেন,—তবে তাড়া নেই। আসল কাজটা সেদিনই শেষ করে দিয়েছি,—গুলিটা বার করে দিয়েছি,—সেই যে সঞ্জয়ভায়া অজ্ঞান হয়ে পড়লো না? কপাল ঠুকে নিলুম একটা রিস্‌ক্। গুলিটা বেশি গভীরে ঢুকতে পারে নি বলেই কাজটা আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম,—কিন্তু ওটা আর পড়া হবে না?

শেফালী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, বললে, আমি চট করে দাদুকে দেখে আসছি।

সে পাশের ঘরে ঢুকে যেতেই সলিলবাবু বললেন,—তোমার ভালো লাগছে?

—খুব। কিছুই ত জানি না।

সলিলবাবু ধীরে ধীরে খাবার মুখে তুলছিলেন, বললেন,—তোমাকে দেখবার নাম করে এখানে ছুটে এসেছি কি সাধে? ওদিকে অজস্র রোগী। কম্পাউণ্ডারকে শুধু এখানকার কথা বলে এসেছি, জরুরী

কল-টল থাকলে এখানে যেন ফোন করে দেয়। আসলে, তোমার মতো আমারও এসব শুনতে ভালো লাগে।

একটু অসহিষ্ণু হয়েই এবার বলে উঠলাম,—আচ্ছা, এই রাসবিহারী বোস কে?

সলিলবাবু চোখ তুললেন, বললেন,—নাম শোনো নি ত?

—না।

—শরৎবাবুর 'পথের দাবী' পড়েছিলে? 'পথের দাবী'র 'সব্যসাচী' এই রাসবিহারী-চরিত্রের প্রেরণাতেই লেখা বলে শোনা যায়। এক-কথায়, একসময় ইনি ছিলেন একটি কিংবদন্তী বিশেষ। ছদ্মবেশ ধারণ করতে এমন নিপুণ ছিলেন যে, এঁকে চিনে বার করা কঠিন ছিল। ব্রিটিশ সরকার যখন এঁকে ধরবার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে, জীবিত অথবা মৃত এঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে হাজার-হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, কাগজে-কাগজে, হ্যাণ্ডবিলে-হ্যাণ্ডবিলে এঁর ছবি এঁকে ছেপে ধরিয়ে দেবার জন্য অজস্র লোভ দেখানো হচ্ছে, তখন ইনি নানান ছদ্মবেশে উত্তর ভারতে ঝড়ের মতো ঘুরে ঘুরে বিপ্লব-সংগঠন করে বেড়াচ্ছেন! ভাবতে পারো? এবং শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশে জাপানে চলে যাওয়া,—সেও কি কম দুঃসাহসের কাজ?

উনি থামতেই ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলাম,—বলুন না আমাকে সব?

—আমিও তোমার মতো কিছুই জানতাম না, সলিলবাবু বললেন, —ঐ বৃদ্ধের কাছ থেকেই আগে আগে শুনতাম। কিন্তু সবটা উনি ধারাবাহিকভাবে গুছিয়ে বলতে পারতেন না। শেষের দিকে ত কিছুই বলতে পারতেন না, জিজ্ঞাসা করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন শুধু। তোমাকে পাবার পর আবার বুঝি ওঁর স্মৃতি ফিরে এসেছে! দেখছো না, এ বাড়ির লোকেরা তোমার ওপর কতখানি কৃতজ্ঞ? শেফালীর তো কথাই নেই। সারা মনপ্রাণ ঢেলে ঐ খাতাখানা সে লিখে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবুর কথার শেষের দিকে শেফালী এসে ঘরে ঢুকলো, বললে,—দাদু উঠেছেন। আমি খবরের কাগজটা পড়িয়ে এলাম। কাগজ ত সবটা পড়েন না, শুধু হেডিংগুলো। এখন গেছেন বাথরুমে। নিতাইকে বলে এসেছি ওদিকে থাকতে, কখন কী দরকার হয় ?

—বোসো এবার চেয়ারে। বাকিটুকু শোনবার জন্য আমরা অধীর হয়ে আছি।

শেফালী চেয়ারে বসে খাতাখানা আবার সামনে খুলে ধরলো। বললে,—তারপরে দাদু লিখেছেন,—রাসবিহারী আর ভাই ভগবান সিং পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরে কথা বললেন রাসবিহারীই প্রথম,—কী আশ্চর্য ! আমি ভাবছিলাম ছ-ফিট লম্বা এক পাঞ্জাবী পুরুষকে দেখবো, মাথায় থাকবে পাগড়ি, মুখে দাড়ি গোঁফ থাকবে,—একেবারে পাক্কা শিখ।

ভাই ভগবান হাসতে লাগলেন, বললেন, —যে জন্য আপনি মিস্টার ঠাকুর হয়েছেন, আমিও সেজন্য সিল্ক-কাপড়ের ব্যবসায়ী জয়মল হয়েছি, দাড়ি-গোঁফ আর পাগড়ি থাকবে কোথা থেকে ?

আমি এত কথা বলে যাচ্ছি বলে মনে কোরো না যেন আমি ওদের কাছে বসে সব কথা শুনেছিলাম। আমি এসব কথা শুনেছি অনেক পরে। এখন শুধু গুছিয়ে পর-পর বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু থাক আমার কথা। ভাই ভগবান সিং জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা রাসবিহারীবাবু, আপনার মাথার ওপর হাজার-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে যখন চারিদিকে ছবিশুদ্ধ পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হচ্ছে, তখন আপনি জাহাজে উঠে জাপানে চলে এলেন কী করে ?

রাসবিহারী অল্প-অল্প হাসছিলেন, বললেন,—খুব সহজে। পাসপোর্ট নিয়ে।

—নিলেন কী করে পাসপোর্ট ? পাসপোর্ট নিতে গেলে ত নিজেকে পাসপোর্ট অফিসে যেতে হয় !

—গিয়েছিলাম নিজেই।

—ওরা সন্দেহ করেনি কিছুই ?

হাসলেন রাসবিহারী, বললেন—আমি তখন রাজা পি-এন-ঠাকুর। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন জাপানে যাবেন বলে কাগজে খবর বেরিয়ে গেছে। আমি রাজকীয় পোষাক পরে সোজা পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে সেই সুযোগটি নিয়েছিলাম। কবি যাচ্ছেন জাপানে, আমাকে আগে সেখানে যেতে হবে সব-কিছু বিধি-ব্যবস্থা করতে। সেজন্যে পাসপোর্ট দরকার। লালমুখো পাসপোর্ট-অফিসারকে এইসব কথাই বোঝালুম। সে আমার কাগজপত্র দেখতে চাইলো। কবি যে জাপানে যাচ্ছেন সে খবর তারাও রাখতো। আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করে পাসপোর্ট তৈরী করে দিতে আর দ্বিধা করলো না।

ভগবান সিং জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি যে পি-এন-ঠাকুর, এটা আপনার নিজের মুখে মাত্র শুনেই অফিসারটি বিশ্বাস করলো ? কোনো রেকোমেণ্ডেশন দরকার হলো না ?

মুচকি একটু হাসলেন রাসবিহারী, বললেন,—বলেছিলাম, পি-এন-ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়।

—ব্যস ? আপনার মুখের কথাতেই ওরা বিশ্বাস করলো ?

ঠোঁটের কোণে তখনও তার টুকরো হাসি, রাসবিহারী বললেন, —পি-এন ঠাকুরের আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা, ফর্সা টকটকে রং, মাথায় পাগড়ি সাদা রেশমের, পরণে বুক-খোলা দামী কোট, তার ভিতরে সাদা হাই-কলার সার্ট, সরু কালো পাড় দামী ধুতি, ধুতির পাড় সযত্নে কোঁচানো, পায়ে সোনালী জরি-বসানো নাগরা জুতো, হাতে রূপো দিয়ে মাথা বাঁধানো মালাক্কা বেতের দামী ছড়ি,—চলনে-বলনে ঝ'রে পড়ছে আভিজাত্য, ওরা বিশ্বাস করবে না ?

ভগবান সিং বললেন,—হয়তো খানিকটা কাজ হয়েছিল তাতে। আর তাছাড়া জাপান তখন ব্রিটেনের মিত্রশক্তি,—সেদিক থেকেও পাসপোর্টের ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে, তবু যা দিনকাল,

ইংরেজ তখন প্রতিটি ছায়ায় বিপ্লবী দেখছে, অত সহজে সে ছেড়ে দেবে ?

গাম্ভীর্যে এবং তার সঙ্গে মিশে একটা অব্যক্ত অনুভূতির উজ্জ্বলতায় মুখখানা থমথম করছে, রাসবিহারী বললেন,—আপনি আমার ভাই, আমরা একই পথের পথিক, তাই আপনাকে বলতে বাধা নেই, রেকমেণ্ডেশন একটা ছিল। আমি, অর্থাৎ পি-এন-ঠাকুর যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় এবং তাঁরই অগ্রদূত হয়ে জাপান যাচ্ছি, এ-পরিচিতিটুকু নাথাকলে যে ইংরেজ-বাচ্চা আমাকে জাহাজে উঠতে দেবে না এটা জেনেই সেটা আমি আগে থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম। আসল কথা, এটা জোগাড় করবার জন্য কটা দিন আমাকে চন্দননগর থেকে এসে কলকাতায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল।

—কে দিলেন ঐ পরিচিতি-পত্র ?

রাসবিহারী চোখ তুলে তাকালেন ভগবান সিং-এর চোখের দিকে, বললেন,—এটা আজকের দিনে আপনার অনুমানের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

ভগবান সিং বললেন,—আমার অনুমান, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

কোনো কথা না বলে রাসবিহারী মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ভগবান সিং বললেন,—এবার আপনি কী করবেন বাবুজী ?

রাসবিহারী বললেন,—আপনার-আমার আদর্শ এক,—ভারতের স্বাধীনতা। আমাকে জাপানেই আপাতত থাকতে হবে। এশিয়া-খণ্ডই আমার কর্মক্ষেত্র হোক।

একটুক্ষণ চিন্তা করবার পর ভগবান সিং বললেন,—আপনাকে আমি ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো।

—সান-ইয়াৎ-সেন ! পারবেন ?

ভগবান সিং বললেন—১৯১৩ সালের ডিসেম্বরের কথা বলছি। আমাকে তখন ক্যানাডা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জাপানে এসে তাঁর কথা খুব শুনতে লাগলাম। ডক্টর সেন চীন থেকে

পালিয়ে জাপানে এসেছেন। সান-ইয়াৎ সেন চীনের প্রধান নেতা, তাঁর কথা কোন্ বিপ্লবীই বা না শুনেছে! তাঁর সঙ্গে দেখা হলো এই জাপানে—টোকিওতে। সেই সময় মৌলানা আবুল বরকতউল্লা আমার সঙ্গে ছিলেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ডক্টর সেন আমাকে নিয়ে গেলেন প্রিন্স তোয়ামার কাছে। এই প্রিন্স তোয়ামা জাপানের জনপ্রিয়তম জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, এবং জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। যদিও তখন জাপানের সঙ্গে ইংরেজের মিত্রতা স্থাপিত হয়েছে, তবুও ইনি মনেপ্রাণে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করতেন। ইনি বলতেন,—এশিয়ায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ভারতের অর্থ, ভারতের সম্পদ, ভারতের জনশক্তি। এগুলি না থাকলে ইংরেজ এশিয়ায় এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। ব্রিটেন যদি চীনের সঙ্গে যুদ্ধে, বার্মার সঙ্গে এবং আফগানিস্তান ও পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলতে পারে, তিব্বত-বিজয় এবং বুয়োর-যুদ্ধেও যদি ভারতকে তারা ব্যবহার করতে পারে, তাহলে যেদিন জাপানের সঙ্গে ওদের যুদ্ধ হবে এবং এ-যুদ্ধ একদিন-না-একদিন হবেই, তখন ভারতকেও ওরা কাজে লাগাবে। এটা তাহলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন, নিজেদের জাতীয় স্বার্থেই, আমাদের দরকার ভারতকে স্বাধীনতা পেতে সাহায্য করা।

তোমার কথা বলার আগে আর একটি প্রসঙ্গ এখানে বলা দরকার। সিল্ক-ব্যবসায়ী জয়মল অর্থাৎ ভাই ভগবান সিং প্রিতমের কাছ থেকে পরে শুনেছিলাম, তিনি আর রাসবিহারী হোটেলের একটি ঘরে বসে একান্তে কথা বলছিলেন। বিষয়টা ছিল খুব জরুরী। সাংহাই থেকে জার্মাণ-কন্সালের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে হবে দেশে। সে-সব ব্যবস্থার জন্য একজনকে অবিলম্বে যেতে হবে সাংহাইতে। এই সব আলোচনা চলছে নিচু গলায় দুজনের মধ্যে, এমন সময় তাদের যে খাবার-দাবার দিয়ে গিয়েছিল, সেই জাপানী বেয়ারাটি এসে ঘরে ঢুকলো। জাপানী বেয়ারাটি খাওয়ার থালা-টালা

উঠিয়ে নেবার সময় ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললে,—আরেকটা ঘরে আরেকজন ভারতীয় রয়েছেন, তাঁর নাম মিস্টার এল-রায়।

কথাটা শুনে অবাক হলেন ওঁরা দুজনেই। ভাবতে লাগলেন —কে হতে পারেন এই এল-রায় ?

কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন রাসবিহারী,—এ আর কেউ নয়, স্বয়ং লালা লাজপৎ রায়।

ভগবান সিং উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—আপনি বসুন, আমি দেখে আসছি।

ভগবান সিং দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবং ফিরে এলেন কয়েক মুহূর্ত পরেই। বললেন,—হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়। আসুন।

ওরা বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে লালাজীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এ-সাক্ষাৎকারের কথাও আমি পরে শুনেছি। রাসবিহারী অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা জানতেন। উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের দিকে বিশেষ করে রাসবিহারীর কর্মকেন্দ্র। সেজন্য হিন্দী ও পাঞ্জাবী যে তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন এ-কথা বলাই বাহুল্য। ওঁদের তিনজনের মধ্যে অবশ্য হিন্দীতেই তখন কথাবার্তা চলতে লাগলো। ভারতের তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় তিনটি নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো, "লাল-বাল-পাল", অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক আর বিপিনচন্দ্র পাল। সেই তিনজন মহারথীর একজন, অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায় তাঁদের দুজনের সামনে সশরীরে বসে। ভগবান সিং রাসবিহারীর আচরণে তখন কিন্তু একটু অবাকই হয়েছিলেন। নিজেকে লালাজীর সামনে পি-এন ঠাকুর নামে পরিচয় দিলেন, আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন না। ভগবান সিং ভাবলেন, প্রথম সাক্ষাতে রাসবিহারীবাবুর নাম যে লালাজীকে বলিনি, এ দেখছি ভালোই হয়েছে।

কিন্তু লালাজীর ঘর থেকে বাইরে আসার পর একথা তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলেন না ভগবান সিং। বাবুজী যখন পরিচয় দেন নি, তখন অবশ্যই তার কারণ আছে; অযথা কৌতূহল নিয়ে কালক্ষেপ করা বিপ্লবীর স্বভাববিরুদ্ধ। ওঁরা দুজনে নিজেদের ঘরে এসে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

ভাই ভগবান সিং পরে বলেছিলেন,—সেই সময় আমি সাংহাইয়ের জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম আশা করছিলাম। কারণ তাঁরাই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন এ-রকম প্রত্যাশা ছিল। এই টেলিগ্রামটি অচিরেই এসে পড়লো এবং আমরা দুজনে আবার গোপনে মিলিত হলাম। অনেক আলোচনার পর স্থির হলো যে রাসবিহারী নিজেই যাবেন সাংহাইতে। কারণ, আমাকে ও-অঞ্চলে লোকে বিলক্ষণ চেনে, অনেকবার দেখেছে, সেজন্য আমার ওখানে যাওয়াটা খুব বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়তে পারে। আমি প্রাণের ভয় করি না, কিন্তু আমাদের প্ল্যান না বানচাল হয়ে যায়!

রাসবিহারী বললেন,—কিছু ভাববেন না, আমি যাবো।

ভাই ভগবান সিং শিউরে উঠেছিলেন এ প্রস্তাবে, বলেছিলেন,—না-না—আপনি যাবেন কী। আমরা অন্য কাউকে পাঠাব।

রাসবিহারী বলেছিলেন,—এ-কাজের গুরুত্ব বোঝেন? আমাকেই যেতে হবে। ভগবান সিং উত্তরে বলেছিলেন,—আপনার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে! আপনাকে ব্রিটিশের স্পাই যদি হাতে পায়, ত—

রাসবিহারী মুখ টিপে হেসেছিলেন, বলেছিলেন,—কলকাতায় যখন পি-এন ঠাকুরের ছদ্মবেশে এবং পি-এন ঠাকুরের পাসপোর্ট নিয়ে 'সানুকি মারু' জাহাজে উঠে বসলাম, তখন পুলিশ-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং টেগার্ট সন্দেহবশে দলবল নিয়ে জাহাজ তল্লাসী করতে এসেছিলেন, কিন্তু পি-এন ঠাকুরকে ধরতে পেরেছিলেন কী?

—কিন্তু এ যে সাংহাই। ব্রিটিশদের গোয়েন্দা ওখানে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

রাসবিহারী হাসতে হাসতে বললেন,—পি-এন ঠাকুরের আসল পরিচয় এখনো ওরা পায় নি। পি-এন ঠাকুরই যাবে সাংহাইতে। রবীন্দ্রনাথ কি সাংহাই যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন না? আমি যাবো তাঁর অগ্রদূত হিসাবে।

—বুঝেছি আপনার প্ল্যান,—ভগবান সিং বললেন,—তাহলে আপনিই যান বাবুজী।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভগবান সিং জার্মান রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশ্যে লেখা রাসবিহারীবাবুর একটি পরিচয়পত্র দিলেন সঙ্গে, আর দিলেন সংগৃহীত অর্থ। সে-সব নিয়ে রাসবিহারী রওনা হলেন সাংহাই অভিমুখে, একটি ছোট জাহাজের আরোহী হয়ে।

এই সাংহাইয়ের কথা ওঁর মুখ থেকে আমি খানিকটা শুনেছিলাম। সাংহাইতে প্রিন্স পি-এন ঠাকুর নামলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা তাঁর আসল পরিচিতি টের না পেলেও তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে ছাড়েনি। তখন চলছে ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধ, তার উপরে ব্রিটিশ জানতো যে, গদর পার্টির বহু বিপ্লবী ক্যানাডা থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ব এশিয়া-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই যে-কোনো ভারতীয় ও-অঞ্চলে গেলেই তার ওপর নজর রাখতো গোয়েন্দা পুলিশ।

ফলে, সরাসরি জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে না পারলেও দূতাবাসের কোনো এক প্রভাবশালী কর্মচারীর সঙ্গে দূতাবাসের বাইরে কোনো এক হোটেল-কক্ষে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতে চীনাদের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করা তাঁর ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি বটে, কিন্তু ভারত-মহাসাগরে দুর্ধর্ষ জার্মান রণতরী এমডেনের উপস্থিতির মাধ্যমে ভারতের ব্রিটিশ সিংহাসনকে কাঁপিয়ে তোলা ছিল তাঁর প্ল্যানের এক অন্যতম ফলশ্রুতি।

সাংহাই থেকে আবার টোকিওতে এলেন পি-এন ঠাকুর। কিন্তু ততদিনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা-চক্র পি-এন ঠাকুরের গতিবিধি সম্বন্ধে

সন্দিহান হয়ে উঠেছে। তাদের মনে এ প্রশ্নও জাগতে আরম্ভ করেছে,—কে এই পি-এন ঠাকুর? ইনি কি সত্যিই জাপানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রদূত হয়ে এসেছেন তাঁর জাপান-ভ্রমণের বিধিব্যবস্থা করতে? তাই যদি হয়, তাহলে ঐ রেভারেণ্ড নিক্কি কিমুরা লোকটি কে?

নিক্কি কিমুরাকে একজন জাপানী ধর্মযাজক বলা যেতে পারে। এই ভদ্রলোক ১৯০৭ সালে ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করতে। বলা বাহুল্য, টোকিওর বুদ্ধিজীবী মহলে ইনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং টোকিওতে আমার সঙ্গে এঁর পারচয়ও হয়েছিল।

ইনি গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। আমরা জানি না, কিন্তু ইনি জানতেন হীনযান পথাবলম্বী বৌদ্ধদের একমাত্র কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতে শেষ পর্যন্ত এই চট্টগ্রাম। এখানকার মঠে ইনি পালি আর সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন। এখানে থাকতে থাকতেই তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নাম শুনতে পান। রাসবিহারীবাবুর কথা বলতে বলতে শান্ত, সমাহিত মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। বলতেন,—বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলার ব্যাপারে তাঁর নাম বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁর ছবি দিয়ে পোস্টার আঁটা হয়েছিল। টাকার অঙ্কটা ঠিক আজ আমার মনে নেই, তবে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে।

রেভারেণ্ড কিমুরা বলেছিলেন,—বছর চারেক পরে আমি কলকাতা যাই। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে আমি তখন পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি যে জগদ্‌বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, এ আপনারা জানেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখাও করি। আমাকে তিনি পছন্দও করতেন খুব।

প্রায় প্রতিদিন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন যেতাম··আমি, অবশ্য যখন তিনি কলকাতায় থাকতেন, তখনই।

কিমুরার আরও কথা আমার মনে আছে। তিনি বলতেন—১৯১৫ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বললেন, তাঁর জাপান যাবার খুব ইচ্ছা। বছর খানিকের মধ্যে এ-ব্যবস্থা করা যেতে পারে কী? কিমুরা বিশ্বকবিকে উত্তর দিয়েছিলেন,—নিশ্চয় পারে। আপনি শুধু ভারতের নন, সমগ্র এশিয়ার আপনজন। জাপান আপনাকে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে।

কবি বললেন,—কিন্তু আমার কথা কি জাপানের জনসাধারণ বুঝবে? তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমার দোভাষী হয়ে।

কিমুরা বললেন,—সানন্দে।

কিন্তু বিশ্বকবি জাপানে যাবেন, তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা হওয়া চাই। এ-জন্য কিমুরা ঐ ১৯১৫ সালে মার্চ মাসের শেষাশেষি জাপানে ফিরে গেলেন সব-কিছুর বিধি-ব্যবস্থা করতে।

তিন-চার মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন তিনি শুনলেন, কে এক প্রিন্স পি-এন ঠাকুরও এখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের জাপান-ভ্রমণের তদ্বির-তদারক করতে। কিমুরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, তিনি এলেন জাপানে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তাঁর ওপর কি আস্থা রাখতে পারলেন না কবি? একজন আত্মীয়কে পাঠিয়ে দিলেন সরাসরি? অবশ্য এ-তাঁর মুহূর্তের চিন্তা। পরক্ষণেই মনে হলো, ভালোই হয়েছে। দুজনে মিলেমিশে কাজ করা যাবে। হাজার হোক তিনি জাপানী, তিনি আর কতোটা বুঝবেন ভারতীয় কবির ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা!

কিমুরা পি-এন-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য উন্মুখ হলেন। সেই সময় জাপানে অনেক ভারতীয়ই এসে জড়ো হয়েছেন, কেউ কারিগরীবিদ্যা অর্জনের জন্য, কেউ বা ব্যবসার জন্য। তাঁদের মধ্যে খোঁজ নিলেন, কিন্তু পি-এন-ঠাকুরের বাসস্থানের কথা তাঁরা কেউ

বলতে পারলেন না। তবে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তিনি শুনলেন লালা লাজপত রায়ের কথা। ভারতের প্রথম সারির তিনজন নেতার মধ্যে একজন হচ্ছেন লালা লাজপত রায়। ওঁর কথা কে না শুনেছে? তিনি তখন টোকিওতে, কিন্তু এতো বড়ো শহর এই টোকিও, এখানে কোন্‌খানে তিনি রয়েছেন, ঠিক সে-খবরটি তিনি পাচ্ছেন কোথায়? তখন ওখানে একটা ইণ্ডো-জাপানীজ সোসাইটি গঠিত হয়েছিল, তার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন কাউন্ট ওকুমা। অভিজাত-বংশীয় এই কাউন্ট ওকুমা তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বদান্যতার জন্য জাপানে প্রখ্যাত ব্যক্তি। কিমুরা গিয়ে অচিরেই দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে।

তিনি প্রশ্ন করলেন,—কী ব্যাপার? আপনার সব কুশল ত?

কিমুরা বিনীত ভঙ্গিতে বললেন,—সব কুশল। আমি আট বছর ভারতে থেকে, সম্প্রতি ফিরে এসেছি।

গম্ভীর মুখখানায় হাসির রেখা জাগলো, বললেন,—কাগজে পড়েছি সে-খবর। কেমন, সাধনায় আপনার সিদ্ধি লাভ হয়েছে তো?

কিমুরা বিনয়াবনত ভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন,—না। এখনো প্রাচ্যজগতের বিস্ময় রবীন্দ্রনাথকেই পুরো পাঠ করতে পারি নি।

কাউন্টের মুখখানা শ্রদ্ধায় ও আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন,—রবীন্দ্রনাথ? যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন!

কিমুরা বললেন,—হ্যাঁ। তিনি শীঘ্রই জাপানে আসবেন, আমি এসেছি তারই ব্যবস্থা করতে। পরে আবার ভারতে ফিরে যাবো।

কাউন্ট তখন যেন আনন্দে আর উৎসাহে ঝলমল করছিলেন,—প্রাচ্যজগতের এই মূর্তিমান বিস্ময়কে জাপান সারা মনপ্রাণ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে, আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি আপনার সঙ্গে আছি।

—সঙ্গে নয়, আপনি হবেন পুরোধা,—কিমুরা উত্তর দিলেন,—আপনার সাহায্যও প্রভাব ছাড়া আমি এক-পাও অগ্রসর হতে

পারবো না। কিন্তু কথাটা কী জানেন? কবির এক আত্মীয় প্রিন্স পি-এন-ঠাকুর জাপানে এসে বসে আছেন কবির ব্যবস্থাদি করবার জন্য। আপনি তাঁর সন্ধান জানেন?

কাউন্ট অবাক হলেন, বললেন,—না ত! এ নাম ত শুনিনি! কাগজেও এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ বেরিয়েছে বলে জানা নেই।

—আমিও খোঁজ করে দেখেছি, কিন্তু পাচ্ছি না সন্ধান। আচ্ছা, লালা লাজপৎ রায় কোথায় আছেন বলতে পারেন? তিনি হয়তো পি-এন-ঠাকুরের খোঁজ রাখেন।

কাউন্ট বললেন,—হ্যাঁ, লাজপৎ রায় টোকিতেই রয়েছেন জানি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের অত্যাচারে তাঁকে এরই মধ্যে কয়েকবার বাসস্থান বদলাতে হয়েছে। এখন ঠিক কোথায় আছেন, আমিও জানি না। কিন্তু দাঁড়ান, এক ভারতীয় ভদ্রলোক কাছেই থাকেন, তিনি হয়ত খোঁজ দিতে পারেন। ডেকে পাঠাচ্ছি।

কাউন্ট তখুনি গাড়ি দিয়ে তাঁর একটি লোককে পাঠিয়ে দিলেন। এবং প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই সাহেবী পোষাক-পরা পোক্ত চেহারার এক যুবক এসে হাজির হলেন। কাউন্ট এঁকে চিনতেন। এঁর আসল নাম কেশোরাম সবরওয়াল। তখন কী যেন ছদ্মনামে ঘোরাফেরা করতেন, আজ সে নামটা আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এই কেশোরামজীর কথা আমাকে বারে বারে বলতে হবে। ইনিও রাসবিহারীর মতো গোপনে পালিয়ে এসেছিলেন এবং এসেছিলেন বিনা পাসপোর্টে, এক জাহাজের খালাসী হয়ে। তাঁর অভিলাষ ছিল আমেরিকায় গিয়ে গদর পার্টিতে যোগদান করার। তাঁর তখন কাজ ছিল আমেরিকাগামী জাহাজে গিয়ে খালাসীর কাজ যোগাড় করার চেষ্টা করা। যে জাহাজে তিনি ভারত থেকে জাপানে এসেছিলেন, সে জাহাজের গন্তব্যস্থলই ছিল জাপান। অগত্যা জাপানেই তাঁকে নামতে হয়। এখানে এসে তিনি লালাজীর খোঁজ পান। কিন্তু পি-এন-ঠাকুরকে ইনি তখন চিনতেন না।

কিমুরাকে নিয়ে কেশোরামজী একটি হোটেলে এলেন। এই হোটেলেরই এক নিভৃত কক্ষে তখন লালাজী আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, হোটেলের খাতায় তাঁরও ছিল ছদ্মনাম।

লালাজী ঘরে বসে তখন আর একটি যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। বোধহয় কোনো গোপন আলোচনাই চলছিল, ওঁরা যাওয়াতে তিনি একটু বা বিরক্তই হলেন। হয়তো কেশোরামজী থাকায় সাক্ষাৎ না করেও পারলেন না। কিমুরার সঙ্গে কথাবার্তা বলে লালাজীর মনের মেঘ কেটে গেল। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত একটি পরিচিত-পত্রও কিমুরার সঙ্গে ছিল। সেটা দেখে এবং বিশেষ ক'রে কাউণ্ট ওকুমার কাছ থেকে আসছেন শুনে কিমুরা যে জাপানী স্পাই নন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলেন লাজপৎ রায়। তখন চা এলো, খোলা মন নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো। কিমুরা কথায় কথায় তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

লালাজী অবাক হয়ে একবার কেশোরামজীর দিকে তাকালেন। কেশোরামেরও চোখেমুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠেছে!

লালাজী বললেন,—পি-এন-ঠাকুরের জন্য আমার কাছে এসেছেন! তাঁর সঙ্গে এযাবৎ একবার মাত্র আমার দেখা হয়েছে, ভগবান সিং তাঁকে আমার কাছে এনেছিলেন। মানুষটি খুব অমায়িক আর ভদ্র, ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি তাঁর আচার-ব্যবহারে যেন উপচে পড়ছে। রবীন্দ্র পরিবারের উপযুক্ত ব্যক্তি। তা, তাঁর খবর ত আর আমি রাখিনি! তিনি ভগবান সিং-এর সঙ্গে কী দরকারে যেন তখ্‌খুনি চলে গেলেন, আর আসেন নি। সেই থেকে ভগবান সিং এরও দেখা নেই, তাঁরও দেখা নেই। সে-ও ধরুন, বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, মাসখানেক কি তারও বেশি। কী হে কেশোরামজী, তুমি তাঁর খোঁজ রাখো নাকি?

কেশোরাম বললেন,—আমি জানতাম ইনি আপনার সঙ্গে দেখা

করতে আসছেন। ইনি যে ঠাকুর মশাইয়ের খোঁজ করছেন, সেটা জানলে আমি সরাসরি এঁকে তাঁরই কাছে নিয়ে যেতাম। চলুন মিস্টার কিমুরা, মিঃ ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

ওঁরা উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। ওঠবার সময় কেউই লক্ষ্য করলেন না যে, লাজপৎ রায়ের কাছে যে শ্যামবর্ণ যুবকটি বসেছিলেন, তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

ওঁরা চলে যেতেই লাজপৎ রায় যুবকটির দিকে ফিরলেন, বললেন,—কী হে অবনী, প্রিন্স পি-এন ঠাকুরকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন?

যুবকটি শুধু ভারতীয়ই নন, বাঙালী, নাম—অবনী মুখোপাধ্যায়। সে অল্প হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে,—এখন আর কী দেখছেন? দু-দিন পরে ওঁকে নিয়ে দুনিয়া তোলপাড় হবে।

—মানে!

অবনী মুখ তুললেন, বললেন,—লালাজী, ভাই ভগবান সিং যখন আপনার কাছে পি-এন-ঠাকুরকে নিয়ে এলেন, তখন তাঁর মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন কী?

লালাজী বললেন,—হ্যাঁ, তা লক্ষ্য করবো না কেন? সুন্দর চেহারা—রাশভারী—আভিজাত্যপূর্ণ। আমাকে ত দারুণ সম্মান দিয়ে কথা কইছিলেন। তাছাড়া, দেখেছিলুম, মানুষটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অনেক ভিতরের খবরও জানে। তা, না জানবেই বা কেন, হাজার হোক, রবীন্দ্র-পরিবারের মানুষ!

অবনী ভ্রূ-দুটি ঈষৎ কুঞ্চিৎ করে প্রশ্ন করলো,—ভাই ভগবান সিংও ওঁর পরিচয়টা দেননি?

—দেবেন না কেন!—লালাজী উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিলেন, বললেন,—রবীন্দ্রনাথের জাপান আসার ব্যাপারে উনি আগেভাগে বিধিব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। তাছাড়া, খাঁটি জাতীয়তাবাদী মানুষ, ব্রিটিশের খয়ের খাঁ নন, যদিও প্রিন্স।

অবনী বললেন,—ভগবান সিং এখন টোকিওতে নেই, তাহলে

ওঁকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতাম, লালাজীর কাছে ওঁর আসল পরিচয়টা দিতে আপনার বাধাটা ছিল কোথায় ?

লালাজী আর থাকতে পারলেন না, উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, —কিন্তু আসল লোকটি কে, সেটা বলবে ত ?

অবনী ধীর, শান্ত অথচ নিচু গলায় উত্তর দিলেন,—রাসবিহারী বোস।

—বলছো কী !

—হ্যাঁ।

লালাজী উঠে দাঁড়ালেন, ঘরে দ্রুত পায়চারী করতে করতে এক সময় থামলেন, বললেন,—অবনী, তুমি জানো, তিনি কোথায় আছেন ?

—জানি।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারো তাঁর কাছে ? এখনি ?

—পারি।

লালাজী ওভারকোট্‌টা প'রে হাতে ছড়িটা নিতে নিতেও থমকে দাঁড়ালেন, বললেন,—আমাকে তখন পরিচয় দিতে চাননি, এখন চাইবেন কী ?

অবনী মৃদু মৃদু হাসছিলেন, বললেন,—যদি না চাইতেন তাহলে আমার মুখ থেকে আপনি তাঁর নামটা শুনতে পেতেন কী ?

লাজপৎ রায় অবনীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর ওঁর কাঁধে হাত রেখে শুধু একটি কথাই বললেন,—চলো।

আশ্চর্য, জায়গাটা লালাজীর হোটেল থেকে খুব বেশী দূরে নয়। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল তখন, অবনী তাঁর হাতের ছাতাটা খুলে ধরলেন। সেই একটি ছাতার নিচে দুজনে ঘন হয়ে একটা অপরিসর রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন, ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার পর।

মাঝারী ধরণের সুসজ্জিত একটি বাড়ি। গৃহভৃত্য দরজা খুলে দেবার পর, স্লিপে নাম লেখা বা কার্ড দেখাবার সৌজন্যের জন্য না

দাঁড়িয়ে ভৃত্যের হাতে ছাতা আর ওভারকোট জমা রেখে অবনী লালাজীকে নিয়ে সোজা হাজির করলো রাসবিহারী বসুর ঘরে।

জাপানী কায়দায় বসেছিলেন মাটিতে বিছানো গদীর ওপরে। বসুমশাইয়ের পাশে ছিলেন কেশোরামজী আর কিমুরা। লালাজীকে দেখে একটা অভ্যর্থনার ঘটা পড়ে গেল। রাসবিহারী উঠে ওঁর কর স্পর্শ করলেন। তারপরে সেই প্রথম দর্শনের দিন যেমন হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন,—কেয়া লালাজী, আপ আচ্ছা হৈ ত?

লালাজীর ওঁর চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে পাঞ্জাবী ভাষায় লালাজী যে-কথা বললেন, তাঁর মর্মার্থ হলো,—তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলে কেন? আমাকে কি বিশ্বাস করো নি? কেন বলো নি, তুমিই সেই, ভারতের আকাশে যাকে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-রেখা বলে বর্ণনা করা চলে?

কথা বলতে গিয়ে অভিমানে ও ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠস্বর সম্ভবত কাঁপছিল। রাসবিহারীর শান্ত মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসির রেখা, উত্তরে ঐ পাঞ্জাবী ভাষাতেই বললেন,—একটা বিশেষ কাজে হাত দিতে চলেছিলাম। ভগবান সিং-এরই কাজ। সে কাজে একটু বিপদের ঝুঁকি ছিল। পরিচয় পেলে তোমার সামনেই ভগবান সিং কথাগুলি তুলতো, আর তুমি আমাকে যেতে দিতে না, লালাজী! বজ্রের মতো কঠোর অন্তরের অন্তরালে কুসুমের মতো মৃদু যে হৃদয় তোমার বিশাল বক্ষের নীচে লুকিয়ে রেখেছো, তার পরিচয় কি আমি রাখি না?

লালাজী আর থাকতে পারলেন না, দু-হাতে ওঁকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, দুটি চোখের কোণ ভিজে উঠলো, আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেদের সামলে নিয়ে পরস্পর আসন গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী প্রশ্ন করলেন,—তারপর? তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো কে? অবনী বুঝি?

অবনী সরাসরি মাতৃভাষা বাংলায় বলে উঠলেন,—ভুল করেছি কী?

হাত বাড়িয়ে ওঁর কাঁধ স্পর্শ করলেন রাসবিহারী, সহাস্যে বললেন,—না ভাই না, লালজীকেই আমার সব থেকে এখন দরকার। নেতাকে যখন পেয়ে গেছি, তখন আর ভয় কিসের? ওঁর ছত্রতলে বসে এখন আমরা একযোগে কাজ করবো।

লালাজী তাকালেন কেশোরামজীর দিকে, কিমুরার দিকে। কিমুরাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইংরাজীতে,—কিছু বুঝতে পারছেন কী?

কিমুরা হাসলেন, বললেন,—তা পারছি, মনে হয়।

তারপরে রাসবিহারীর দিকে ফিরে, সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে বাংলায় (অবশ্য ভাঙা-ভাঙা বাংলায়),—বোসবাবু, পি-এন-ঠাকুরের ছদ্মবেশ যখন ছাড়লেন, তখন সোজাসুজি কথা হোক—আমি আপনাদের কোনো কাজে আসতে পারি কী?

রাসবিহারী তাঁর হাতখানা ধরলেন, বললেন,—আপনার আসল কাজ, কবিকে এখানে আনা। তাঁকে কাছে পেলে আমরা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবো না?

—সে আমি করবোই।

রাসবিহারী বললেন,—তারপরে রইলাম আমরা। আমরা চাই জাপানের বন্ধুত্ব, এর যোগসূত্র হবেন আপনি।

—সানন্দে, কিমুরা বললেন—আমার যথাসাধ্য আমি করবো।

অবনী বলে উঠলেন,—কিন্তু মিস্টার কিমুরা, একটা কথা ভেবে দেখবেন। জাপানের সঙ্গে ইংরেজের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে,—খুব বুঝেশুনে আমাদের কথা যাকে যা বলবার দয়া করে বলবেন। ইংরেজ আমাদের অস্তিত্ব টের পেলে বন্ধু জাপানকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলবে আমাদের।

রাসবিহারী মৃদু তিরস্কারে বললেন,—আঃ অবনী! মিলনের দিনে বিচ্ছেদের কথা কেন?

কিমুরা বললেন,—না-না, উনি ঠিকই বলেছেন। কথাটার গুরুত্ব উড়িয়ে দেবার নয়। তবে কি জানেন? এ রাজনৈতিক বন্ধুত্বটাকে জাপানের সাধারণ মানুষ খুব সুনজরে দেখেনি, হালের কাগজপত্র খুললেই দেখবেন, আমাদের পররাষ্ট্রদপ্তরের এই নীতির ওপর কী নিন্দার ঝড়ই না বয়ে গেছে!

লালাজী বললেন,—গ্রেট্ নিউজ, দারুণ খবর।

রাসবিহারী বললেন,—ঠিক বলেছেন। জাপানী জনগণের এই মনোভাবই আমাদের ভরসা; তবে, মিস্টার কিমুরা, আসল কাজটা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করুন। কবিকে আনান! তিনি যত তাড়াতাড়ি আসেন, ততই মঙ্গল। জাপান ও ভারতের মৈত্রীবন্ধন তিনি এলে দৃঢ় হবে। এবং এই মৈত্রীই আমাদের পাথেয়। বুঝতে পারছেন, আমি কী বলতে চাইছি?

কিমুরা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন, তারপরে সহসা ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন,—কবি কিন্তু নিজে থেকেই জাপানে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আচ্ছা, আপনাদের জন্যই কি আসতে চেয়েছেন?

রাসবিহারীর চোখদুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, বললেন,—আপনি বোধহয় ঠিকই ধরেছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তার ওপর কবি মন, কাঁদবে না তাঁর প্রাণ আমাদের জন্য? তিনি এলে সারা জাপান জুড়ে সাড়া পড়ে যাবে, তাঁর মধ্য দিয়ে জাপান ভারতকে দেখবে এবং চিনবে। তখন আপনাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গিও ঘুরে যেতে কতক্ষণ?

কিমুরা নির্বাক তাকিয়ে রইলেন রাসবিহারীর দিকে। তারপর মুখখানা ঈষৎ আনত করে মৃদুগলায় বলে উঠলেন,—তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে, কেমন করে সইবো!

চকিত হয়ে উঠলেন রাসবিহারী, অস্ফুটস্বরে বললেন,—বাঃ!

কিমুরা প্রদীপ্ত মুখে বললেন,—কবির লেখা। একটা লাইনই শুধু মনে আছে, আর মনে নাই।

—কোথায় পড়লেন?

—কলকাতায়। একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে। নামটা মনে নাই।

লালজী বললেন,—আফশোষের কথা, বাংলা শিখিনি, অথচ ইনি জাপানী, ইনি বাংলা শিখে এসেছেন।

রাসবিহারী দুটি হাত জড়ো করে বললেন,—মিঃ কিমুরা, আপনাকে আমি প্রণাম করি।

কিমুরা তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে দুটি হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ালেন, বললেন,—আমি আপনাদের প্রণাম করি, আপনারা কবির দেশে জন্মেছেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটলো এরপর।

অবনী কী যেন চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন,—বোসদা যে কত ভাষা জানেন, তার ইয়ত্তা নেই। উর্দু, হিন্দী, পাঞ্জাবী, এসব ত অনর্গল বলতে পারেন, তাই না বোসদা?

রাসবিহারী মৃদুহাস্যে বললেন,—থাক ওসব কথা।

লালাজী বললেন,—বাংলার দুটি শের। যতীন মুখোপাধ্যায়, যাকে তোমরা বাঘা যতীন বলো, আর এই বোসবাবু, যাকে লাহোরে বা উত্তরপ্রদেশে অনেকে 'ফ্যাটবাবু' বলে ডাকতো।

রাসবিহারী হেসে ফেললেন কথাটা শুনে। লালাজী বলতে লাগলেন,—দুই বিপ্লবী দুটি দিক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এঁরা আবার দুই বন্ধুও। বেনারস ছিল এঁদের দুজনের গোপনে মিলবার আস্তানা। যতীনবাবু নিয়েছিলেন পূর্বভারতের ভার, আর ইনি উত্তর-ভারতের, তাই না?

রাসবিহারী হাসতে হাসতে বললেন,—নেতা স্বয়ং যখন বলছেন, তখন কথাটা অস্বীকার করি কী করে? হ্যাঁ, বিপ্লব সংগঠনে সেইরকম একটা ভাগাভাগি হয়েছিল বটে। তবে—

বলতে বলতে মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললেন,—তবে

আমাদের পথের গুরু অরবিন্দ। তিনিই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন গীতা। বলেছিলেন,—মুক্তির মন্ত্র এতেই আছে।

একটু থেমে, মুখ নিচু করে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন,—জানেন লালাজী, বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপরে বোমা ফেলার ঘটনার পর যখন একদিন ব্রিটিশ বুঝতে পারলো আমিই এর হোতা, তখন আমাকে তিনটি মারাত্মক অপরাধে জড়িয়ে ফাঁসি দেবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এই খবরটা কানে যেতেই পণ্ডিচেরী থেকে ব্যাকুল হয়ে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের নেতা মতিলাল রায়কে চিঠি লিখেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ হয়ত বা ভেবেছিলেন আমি তখন চন্দননগরে আত্মগোপন করে আছি। মতিলাল আমার সহপাঠী। অরবিন্দ তাকে অনুরোধ করেছিলেন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর থেকে আমাকে ইংরেজরা যাতে ধরে নিয়ে না যেতে পারে, তার জন্য ফরাসী গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে আইনের বাধার কথা তুলতে। তিনি আরও লিখেছিলেন, যদি দরকার হয় আমি লিখবো প্যারিসে রাসবিহারীর জন্য।

লালাজী মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, বললেন,—আপনি ত তখন নিশ্চয়ই চন্দননগরে ছিলেন না?

—না, ঠিক সে-সময়ে ছিলাম না,—রাসবিহারী মৃদু হাসলেন, বললেন,—আমাকে যখন ইংরেজরা হন্যে কুকুরের মতো সারা ভারত জুড়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে, তখন আমি প্রিন্স পি-এন-ঠাকুর সেজে পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে লালমুখো অফিসারের সামনে বসে আছি। যাকে বলে একেবারে বাঘের গুহায়।

কথাটা শেষ করে হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

কেশোরাম বলে উঠলেন,—ভয় করেনি আপনার?

—ভয়?—ভ্রূকুটি মুহূর্তের জন্য কুঁচকে উঠলো তাঁর, বললেন,—এখানেই ত আসে গীতার কথা। যদি মরো, স্বর্গলাভ করবে,—আর যদি জেতো, মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হবে। আর তাছাড়া, আত্মার ত মৃত্যু

নেই, দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে রূপ বদলায় মাত্র, এ-ও গীতার কথা। আর যদি হানাহানি-মারামারির কথা তোলো, সেখানেও গীতার কথা আসে। কে কাকে মারছে? সবই বিধিনির্দিষ্ট। ভাষান্তরে বলা যায়, ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির ফলশ্রুতি। হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলেছে আমি নয়, ইতিহাস।

লালাজী মন্তব্য করলেন,—বাঃ! ঠিক বলেছেন।

রাসবিহারী বললেন,—এই গীতা বিপ্লবীদের কাছে যে কতখানি ছিল, তা ভাবীযুগ যদি বুঝতে পারে, তাহলে উপকৃত হবে। আর গীতার এই প্রেরণা, দেশ মাতৃকার প্রেরণা,—এসবের মূল ছিল বঙ্কিমে, শাখা-প্রশাখা অরবিন্দে। আরও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুরেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, লোকমান্য তিলক, বিপিন পাল এবং আমার সামনে যিনি বসে, লালা লাজপৎ রায়,—এঁরাই আমাদের মূর্তিমান প্রেরণা!

অবনী প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, লালমুখো সাহেব অমনি আপনাকে পাসপোর্ট দিয়ে দিলো? পাসপোর্ট করতে ত কাগজপত্র দরকার হয়। গণ্যমান্য দুজন ব্যক্তির সই লাগে। সে-সব ছিল?

—ছিল বইকি।—রাসবিহারী মুচকি হাসলেন, তারপরে ধীরে ধীরে সে মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া নামল, বললেন, তাহলে শোনো বলি। তোমাদের বলতে বাধা নেই। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং যদি আমাকে সাহায্য না করতেন, তাহলে হতো না। কাগজপত্র তৈরির ব্যাপারে, সই-সাবুদ জোগাড়ে তিনিই ছিলেন আসল মানুষ। বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নাম - গিরীশচন্দ্র নাগ।

—আর, পি-এন-ঠাকুরের পরিচিতি-পত্র?

রাসবিহারী উত্তর দিলেন,—I am directed to say that—সরকারী গৎ বুঝতেই পারছো অবনী,—এইভাবে লিখে সই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জনৈক সেক্রেটারি। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাঁরই ইচ্ছাতে হয়েছিল। উঃ! কলকাতায় 'সানুকি মারু'-জাহাজে উঠে

আমার খোঁজে টেগার্টের সেই ডেকময় ছুটোছুটি আমি কখনো ভুলবো না।

অবনী বললে,—টেগার্ট কাকে না খুঁজছে! আমি ত তার এক শিকার! খুব চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছি যা হোক!

কেশোরাম বললে,—আমার পেছনে টেগার্ট না থাকলেও অন্য কোনো গার্ট ছিল।

রাসবিহারী বললেন,—লালাজীও কি কম অত্যাচার সহ্য করেছেন? ওঁকেও ত দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে!

লালাজী গভীরভাবে কী যেন ভাবছিলেন, ওঁর নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে চমকে মুখ তুললেন। ধীর গলায় বললেন,— আরও একজন বিপ্লবী টোকিওতে এসেছে। বাঙালী। তবে তাঁর সঠিক খোঁজ এখনও পাইনি।

—কে তিনি?

—হেরম্বলাল গুপ্ত।

লালাজী বলতে লাগলেন,—হেরম্ববাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আমেরিকায়। আমিই তাঁকে বলেছিলাম সুযোগ মতো চলে আসতে। খবর পেয়েছি টোকিওয় এসেছেন, হয়ত বা আমার খোঁজও করছেন।

রাসবিহারী বললেন,—দেখো ত, আমরা আজ কতজন! সবাইকে জড়ো করো লালাজী, কাজ আরম্ভ করে দাও।

লালাজী সোজা হয়ে বসলেন, তারপরে পাঞ্জাবী ভাষায় যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো,—বান্দা হাজির, কী কাজ করিয়ে নিতে চাও, করাও।

রাসবিহারী লালাজীর একটি হাত ধরলেন, বললেন, —লালাজী, জননীর হাতে পায়ে শৃঙ্খল, সন্তানের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আসুন আমরা সবাই কালই বসি।

—কোথায়?

রাসবিহারী বললেন,—পি-এন-ঠাকুরের এই আস্তানায় নয়, আপনার ওখানে।

—বেশ,—বলে লালাজী উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে কেশোরামজী আর অবনী। কিমুরাও উঠছিলেন, কিন্তু রাসবিহারী তাঁকে ছাড়লেন না, বললেন,—প্রিন্স পি-এন-ঠাকুর স্বয়ং আপানাকে পৌছে দেবে, দয়া করে আর একটু বসুন।

কিমুরা অগত্যা বসে রইলেন। রাসবিহারী লালাজীদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন তাড়াতাড়ি। বললেন,—মিস্টার কিমুরা, গোয়েন্দারা যে তৎপর নেই, তা ভাববেন না। আপনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে, পি-এন-ঠাকুরও তাই। দুজনে এবার রাজকীয় ভঙ্গিতে বাইরে যাবো, গাড়ি চড়বো। তাতে করে ওরা বুঝবে যে, আমরা সত্যি সত্যিই কবির ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছি। আমাকে কাউন্ট ওকুমার কাছে নিয়ে যেতে পারেন?

কিমুরা বললেন,—এখন?

—হ্যাঁ।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কিমুরা বললেন,—চলুন, কিন্তু সেখানে কি পি-এন-ঠাকুরই থাকবেন?

হেসে বললেন,—আপাততঃ, তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

পি-এন-ঠাকুর এরপর উপযুক্ত পোষাক প'রে, হাতে ছড়ি নিয়ে, মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে, গাড়ি ডাকিয়ে কিমুরাকে নিয়ে কাউন্টের বাড়ি চললেন সুসমারোহে।

কাউন্টের সঙ্গে দেখা হল। পি-এন-ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-সূচী ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন, বললেন,—আমি শীগগিরই ফিরে যাবো। মিস্টার কিমুরা এসেছেন, আমার আর ভাবনা নেই। উনি কবির দোভাষীরূপেও কাজ করতে পারবেন। কিন্তু কাউন্ট, আপনার ওপর ভরসাও আমাদের কম নয়। আপনি ভারতের প্রতি

সহানুভূতিসম্পন্ন, জাপান-ভারত মৈত্রী দৃঢ় বন্ধনে গড়ে উঠুক, এ আপনি নিশ্চয় চান।

কাউন্ট বললেন,—নিশ্চয়ই। ভারত বুদ্ধদেবের জন্মভূমি।

—এবং রবীন্দ্রনাথের,—রাসবিহারী বললেন,—সাহিত্যই জাতির মূলভিত্তি, মৈত্রীবন্ধনের প্রধানতম যোগসূত্র। সুতরাং কবি যাতে সারা জাপান জুড়ে তাঁর বাণীকে ছড়িয়ে দিতে পারেন, সে-ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।

—নিশ্চয়ই,—কাউন্ট বললেন,—তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

—ধন্যবাদ,—রাসবিহারী উত্তরে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন,—আজ তাহলে উঠি, আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম, কিছু মনে করবেন না।

এইসব সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তার পর কিমুরা এবং রাসবিহারী বিদায় নিলেন। গাড়িতে বসে কিমুরার বাসস্থানের দিকে যেতে যেতে উভয়ে বাংলায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিমুরা বললেন,—কাল কি লালাজীর ওখানে বসছেন? আমার যাওয়ার দরকার আছে?

—না, আপনি কাল না গেলেও পারেন,—রাসবিহারী বললেন,—কী কথাবার্তা হয় না হয়, আমি আপনাকে পরে জানাবো। আপনি বরং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করুন। ভারত-জাপান মৈত্রী, আর রবীন্দ্রনাথ,—এ দুটোই আপনার এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত। মিস্টার কিমুরা, আপনি আমাদের যে কতখানি ভালবাসেন, সে-কথা জেনেই আমি এ-ধরণের অনুরোধ-উপরোধ করছি আপনাকে। আঃ! কী সুন্দর লাইনটি তখন বললেন আপনি,—তোমার শঙ্খ—?

কিমুরা মৃদু গলায় আবৃত্তি করলেন,—তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে, কেমন করে সইবো!

ওঁর হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিলেন রাসবিহারী, দুটি চোখ ভরে এলো জলে।

—হ্যাঁরে হেরম্ব গুপ্তের কথা আমি বলেছি ?

আমরা সবাই চমকে তাকালাম। সেই আমি বিছানায় শুয়ে আছি, পাশে সলিলবাবু—ডাক্তার, আর খাতা হাতে শেফালী।

শেফালী যখন পড়ার মধ্যে মগ্ন ছিল, তখন কখন যে তার দাছু এসে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন আমরা খেয়াল করিনি। হঠাৎ ঘরের এক কোণ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আমরা সবাই চকিত হয়ে উঠলাম। তিনি তাঁর নিজেরই বলা কাহিনীর কতটা শুনেছিলেন কে জানে, বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে এলেন, বললেন,—এই হেরম্ব গুপ্ত আমেরিকা থেকে এসে উঠেছিল সলিলের জ্যেঠামশাই মিস্টার মজুমদারের কাছে। এসব কথা বলেছি ?

শেফালী বললে,—না দাছু, এতটা বলোনি, আমি টুকে নিচ্ছি।

উঠে, কলমটা খুঁজে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলো। দাছু আর কিছু বললেন না আমাদের। কেমন একটা চিন্তান্বিত, ক্লিষ্ট ভঙ্গি তাঁর, হয়ত বা কিছু অন্যমনস্কও। কী যেন বিড়বিড় করতে করতে তিনি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

শেফালী তার লেখার কাজটা শেষ করে মুখ তুলে তাকালো, বললে,—আরও পড়বো ?

—নিশ্চয়ই,—বলতে বলতে সলিলবাবু মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন—তাছাড়া, আমার রোগীর পক্ষে এটা গ্রেট্ মেডিসিন, দেখছো না ? কেমন আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে ?

দুটি আয়ত চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে আমার ওপর স্থাপিত করে চোখ নামালো, তারপরে সলিলবাবুকে লক্ষ্য করে বললে,—আমি যে পড়ে শোনাচ্ছি, দাছু এতে কতো খুশি দেখেছেন ? এখন বাকিটা যদি উনি মনে করে করে বলতে পারেন, তাহলে একটি কাজের কাজ হয়।

বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে আবার চোখ ফেরালো, বললে, —কী ভালো লাগছে আপনার ?

কী বলবো ? প্রথমটায় যেন কথা খুঁজে পেলাম না, পরে বললাম,—এ এক অনাবিষ্কৃত জগৎ !

একটা খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়লো শেফালীর মুখে, বললে, বেলা কিন্তু অনেক দূর গড়িয়েছে। আপনাদের—

সলিলবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—বেলার কথাটা এখন শিকেয় তুলে রাখো। আর রোগীর ব্যাপারে ঘড়ি-ধরা টাইমের কথা বলছো ? সে দায়িত্ব আমার। ডাক্তার যখন পাশে বসে আছি, তখন ভয়ের কোনো কারণ নেই।

—তাহলে, পড়ি ?

—পড়ো।

শেফালী শুরু করলো,—পরদিন লালা লাজপৎ-এর ওখানে সবাই জমায়েত হলেন। রাসবিহারী, অবনী মুখার্জী ও কেশোরামজী। লালাজী বললেন,—হেরম্বর খোঁজ পেয়েছি যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে। এর মধ্যে একটা ব্যাপার হয়েছে, কেশোরাম আমার সেক্রেটারি হয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছে।

রাসবিহারী কেশোরামের দিকে সহাস্যে তাকালেন, তাঁর কাঁধে চাপড়ে দিয়ে বললেন—বহুৎ আচ্ছা !

লালাজীও হাসছিলেন, বললেন,—বিনা মাইনের সেক্রেটারি, বুঝলে না বোসজী ?

রাসবিহারী বললেন,—আপনার কাছ থেকে যা ও পাবে, তা মাইনের থেকেও অনেক বেশি।

কথাটা শুনে লালাজীর চোখ ছলছল করে এলো, বললেন,—এরা দধীচি বুঝলে ? এরা আছে বলেই মনে হয় মায়ের শৃঙ্খল মুক্ত হতে আর দেরি নেই।

লাজপৎ রায় তখন তাঁর বিখ্যাত বই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' লেখবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই বইয়ের মাধ্যমে বিদেশীদের কাছে ভারতের

বর্তমান অবস্থা, বিশেষ করে ব্রিটিশ-সিংহাসনের জঘন্য দমননীতির কথা বিশদভাবে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

কথায়-কথায় এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। লালাজী বললেন,—যেটুকু সময় পাই, বইয়ের খসড়াটা ক'রে ফেলি কী বলো?

রাসবিহারী বললেন,—নিশ্চয়ই। লালাজী, ছত্রপতি শিবাজী সম্পর্কে তুমি যে বইখানা লিখেছিলে সেখানা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু ম্যাজিনিগ্যারিবল্ডির যে জীবনী তুমি উর্দুতে অনুবাদ করেছিলে, সেখানা পড়েছিলাম। অবশ্য পড়েছিলাম বললে ভুল হবে, শুনেছিলাম। একজন পড়ে-পড়ে শুনিয়েছিলেন আগাগোড়া।

লালাজী একটু বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন,—বইখানা বাজেয়াপ্ত করেছে যে! পেলে কোথায়?

হাসলেন রাসবিহারী। বললেন—লাহোরে। সে এক কাণ্ড!

বলতে বলতে মুহূর্তের জন্য চোখদুটি বুজলেন। যেন মুহূর্তের জন্য স্মৃতির গভীরে অনুপ্রবেশ করলেন। আমি পরে দেখেছিলাম, এটা বোধ হয় ওঁর স্বভাবের একটা দিক ছিল। পুরানো কথা বলবার সময় মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে কী যেন ভেবে নিতেন। কল্পনা করছি, সেদিনও লালাজীর সামনে তিনি অমনি করে চোখ বুজে সবটা মনে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন,—মাত্র গত বছরের কথা। ডিসেম্বর মাস। লুকিয়ে লুকিয়ে লাহোরে গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে ছিল পিংলে, শচীন সান্যাল আর পরমানন্দ ঝাঁসি। আমরা উঠেছিলাম রামশরণ দাসের বাড়িতে। তখন কাজের জন্য লাহোরে আমার থাকা দরকার। অথচ জোট বেঁধে থাকা ত যায় না, বাসা ভাড়া নিতেই হয়। কিন্তু বাসা ভাড়া নেবো কী? ব্রিটিশ শাসকপক্ষ থেকে ফতোয়া জারি হয়েছিল, সস্ত্রীক না হলে কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া চলবে না। এবং যদি দিতেই হয়, ত, কর্তৃপক্ষকে আগেভাগে জানিয়ে রাখতে হবে।

—তারপর ?

রাসবিহারী লালাজীর প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই কেশোরাম বললে,—আমি জানি বোসজী আপনি কী বলবেন। আমি ঘটনাটা শুনেছিলাম। আমাদের এক সহকর্মী ছিল কেদারনাথ সেগল। এই কেদারের বন্ধু ছিল রামশরণ দাস।

রাসবিহারী ওর দিকে মুখ ফেরালেন, টুকরো হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের প্রান্তে, বললেন,—ঠিকই বলেছো। আমরা ব্রিটিশের ফতোয়া শুনে বড়ো বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম। শেষে কি লাহোর থেকে ফিরেই যেতে হবে? কিন্তু ফিরে গেলে যে কাজের ক্ষতি! কী করা যায়? অনেক আলাপ-আলোচনাতেও যখন কিছু স্থির হলো না, তখন ভিতর থেকে রামশরণ দাসের স্ত্রী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার ঘোমটাটা একটু সরিয়ে স্বামীকে বললেন—তোমরা এতো ভাবছো কেন? বাড়ি ভাড়া নেও, আমি বোসজীর স্ত্রী হিসাবে তাঁর সঙ্গে যতদিন দরকার হয় বাস করবো। লালাজী এই মহিয়সী মহিলার কাছ থেকেই আপনার উর্দু অনুবাদটি আমি আগাগোড়া শুনেছিলাম।

লালাজী বিস্ফারিত চোখে শুনছিলেন। শেষের দিকে চোখদুটি তাঁর ছলছল ক'রে এলো, বললেন,—এই সব মায়েরা আছে বলেই ভরসা হয় আমাদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে দেরি হবে না।

কেশোরাম বললে,—কেদারনাথের কাছে শুনেছি, এক বাড়ি বদলে আরেক বাড়ি, এইভাবে কেদার বাড়ি বদলিয়ে ওঁদের দুজনকে রেখেছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। প্রায় মাস দুই এ-ভাবে আপনারা ছিলেন, তাই না, বোসজী?

—মাস দুই? হ্যাঁ, তা হবে।

আমার মনে পড়ছে, এই সময় ওঁদের কথাবার্তায় একটু সাময়িক ব্যাঘাত পড়েছিল। জাপানী বেয়ারাট একটি কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল এই সময়। অবশ্য এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো,

আমি নিজের চোখে এসব কিছু দেখি নি, সবই আমার শোনা কথা।

কার্ডটা দূর থেকে লক্ষ্য করেই লালাজী বলে উঠলেন,—হেরম্ব গুপ্ত এলো নাকি ?

কিন্তু কার্ডটা হাতে পৌঁছতেই তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল, বললেন,—না, গুপ্ত নয়।

তারপর বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন,—নিয়ে এসো।

বেয়ারা দরজা ঠেলে বেরিয়ে যেতে না যেতেই ওঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—একজন জাপানী ভদ্রলোক। এখানকার কোন্ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ডক্টর শিওজাওয়া। এঁরই সঙ্গে সবার আগে আমার আলাপ পরিচয় হয়। হোটেল ঠিক করে দেওয়ার ব্যাপারে ওঁর সাহায্য পেয়েছিলাম যথেষ্ট। আমাদের বন্ধু।

শিওজাওয়া এসেছিলেন বিশেষ কোনো কাজ নিয়ে নয়, এমনিই দেখা করতে। যাকে বলে 'শিষ্টাচারমূলক সাক্ষাৎকার'। প্রাথমিক কথাবার্তায় বোঝা গেল, লালাজীর খবর মাত্র মুষ্টিমেয় ক'জন জাপানীই জানেন, আর জানে ভারতীয় ছাত্রদের কেউ কেউ। নইলে 'এল রায়' যে স্বয়ং লালা লাজপৎ রায়—এ খবর জানলে কাগজ-ওয়ালারা হৈ হৈ বাধিয়ে দিতো।

শিষ্টাচারমূলক সাক্ষাৎকার যখন, তখন উপস্থিত আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। লালাজী, অবনী ও কেশোরামের পরিচয় দিলেন ছাত্র বলে, আর রাসবিহারীর দিকে ফিরে বললেন,—ইনি হচ্ছেন প্রিন্স পি-এন-ঠাকুর, কবি রবীন্দ্রনাথের জাপান-ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে আগে ভাগে এসেছেন।

ডাঃ শিওজাওয়া সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,—খুব খুশি হলাম। আপনার কথা ওকুমার কাছে প্রথম শুনি। বলেই একটু হেসে মন্তব্য করলেন,—প্রধানমন্ত্রী মার্কুইস ওকুমা নয়, ইনি জাপান-ভারত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কাউন্ট ওকুমা।

কেশোরাম বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

শিওজাওয়া বললেন,—আজকে সকালের দিকে টাইক্কানের কাছে বোধহয় আপনি গিয়েছিলেন, না, মিঃ ঠাকুর?

পি-এন-ঠাকুর বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, মিষ্টার কিমুরার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কবির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁদের সঙ্গে ত দেখা করতেই হবে।

ভদ্রলোক বললেন,—টাইক্কান এখন আমাদের এখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। দেখলেন ওঁর ছবি?

রাসবিহারী বললেন, —না,তাড়া রয়েছে বলে চলে এলাম, পরে একদিন যাবো।

শিওজাওয়া বললেন,—ব্যারন ওকাকুরা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আপনাদের নিয়ে খুব হৈ-হৈ করতেন। ভগবান তথাগতের দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ওপর তাঁর আন্তরিক টান ছিল।

লালাজী রাসবিহারীর দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন,—ডক্টর শিওজাওয়া আসলে ওকাকুরার বিশেষ অনুরাগী। প্রথম আলাপেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আপনি ভারত থেকে যখন আসছেন, তখন ওকাকুরার নাম আশা করি শুনেছেন; ওকাকুরা ভারতে ছিলেন বেশ কিছুদিন। আমি বললাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর নাম শুধু শুনিই নি, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ফিরোজপুরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। আমি তখন ফিরোজপুর অনাথ-আশ্রমটিকে বছর তিন হলো গ'ড়ে তুলেছি। অনাথ মেয়েদের ত্রাণকার্যে নিযুক্ত আছি শুনে নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। আমার কথা শুনে ডক্টর শিওজাওয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। উনি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ওঁর সাহায্য না পেলে কি এভাবে এই জাপানে থাকতে পারতাম?

রাসবিহারীর মুখে একটা সশ্রদ্ধ প্রসন্নতার ভাব ফুটে উঠলো, শিওজাওয়ার দিকে ফিরে ইংরেজীতে যা বললেন,—তার অর্থ হলো,—

ওকাকুরার নাম ভারতে সবাই শুনেছে। আমি তাঁকে চাক্ষুষ দেখি নি, কিন্তু তাঁর কথা অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি। 'এশিয়া এক',—তাঁর এই উদাত্ত বাণী ভারতে যে শুনেছে, তারই মর্ম স্পর্শ করেছে। উনি শিল্প-রসিক, নিজেও শিল্পী, কিন্তু ভাবুক হিসাবে বোধহয় আরও বড়ো। এশিয়ার ঐক্যের স্বপ্ন দেখতেন, ভারতের সংস্কৃতির ওপরও ছিল ওঁর প্রবল টান। তাই না?

ডক্টর শিওজাওয়া উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন,—ঠিক বলেছেন। অশেষ ধন্যবাদ। ওকাকুরা ভারতে দিনগুলি কেমন কাটিয়েছেন, জানতে অভিলাষ হয়। ওঁর জীবনের খুঁটিনাটি জানা বড়ো দরকার। একটা বই লেখবার চেষ্টা করছি।

লালাজী বললেন,—ঠিক কত সালে উনি ভারতে যান, আপনার জানা আছে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ডক্টর শিওজাওয়া,—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেসব আমার নোট্ করা আছে। ১৯০১ সালের শেষ দিকে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল শিকাগোর ধর্মসভার মতো টোকিওতে একটি ধর্মসভা আহ্বান্ করা।

লালাজী রাসবিহারীর দিকে তাকালেন। রাসবিহারী বললেন,—আর বোধহয় এইজন্যই তিনি কলকাতায় এসে সবার আগে দেখা করেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। এবং যতদূর শুনেছি, তিনি বেলুড়ে কিছুকাল বাসও করেছিলেন। নাম শুনেছেন স্বামী বিবেকানন্দের?

—নিশ্চয়ই। তাঁর শিকাগোর বক্তৃতার বিবরণ কাগজে আমরা আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলাম—শিওজাওয়া বললেন,—কোথায় তিনি বাস করেছিলেন, বললেন?

—বেলুড়।

শিওজাওয়া তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক ছোট্ট নোটবই বার করে তাতে নামটি টুকে নিলেন, তারপর বললেন,—এইসব নামধাম পরে আমি আপনার কাছ থেকে ভালো ক'রে জেনে নেবো।

রাসবিহারী বললেন,—কিন্তু, যা বলছিলাম। স্বামীজী তখন ওঁর আহ্বানে জাপান আসতে পারেননি, জানেন বোধহয়, ১৯০২-সালে তিনি মারা যান। অর্থাৎ ওকাকুরার সঙ্গে বেলুড়ে যখন স্বামীজীর দেখা হয়, তখন স্বামীজীর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে।

বলেই, এখানে একটু থামলেন রাসবিহারী, সবার ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার তাকালেন জাপানী ভদ্রলোকটির দিকে। অবশ্য এ সব ভঙ্গি আমার কল্পনার চোখে দেখা। পরে আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর যে নিজস্ব ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেছিলাম, সেই গুলিই এই প্রসঙ্গে আরোপ করলাম আর কী!

জাপানী ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন রাসবিহারী,—আচ্ছা সিস্টার নিবেদিতার কথা শুনেছেন? মিস মার্গারেট নোবেল?

ডক্টর শিওজাওয়া বললেন,—শুনেছি বইকি! আইরিশ মহিলা, বিবেকানন্দের শিষ্যা হয়ে ভারতে এসেছিলেন। অনেক কিছুই করে গেছেন ভারতের জন্য।

রাসবিহারী লালাজীর দিকে মুখ ফেরালেন, পাঞ্জাবীতে বললেন, —লালাজী, নিবেদিতাকে প্রথম কোথায় আমি দেখি জানো? মেদিনীপুরে। সিস্টার এসেছেন ভাষণ দিতে, ছেলেরা তাঁকে দেখেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো,—হিপ্-হিপ্ হুররে! সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন নিবেদিতা, চোখদুটো যেন ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো, ছেলেদের ধমক দিয়ে বললেন,—তোমাদের মুখে বিদেশী বুলি কেন? আমার সঙ্গে চেঁচিয়ে বলো,—ওয়াহ গুরুজীকি ফতে! আমি সে-ছবি ভুলতে পারবো না।

ডক্টর শিওজাওয়াকে তারপরে বললেন,—ডক্টর, এই বেলুড়েই ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল। এবং এরও পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় রবীন্দ্রনাথের এই নিবেদিতারই মাধ্যমে।

ডক্টর উৎসাহিত হয়ে বললেন,—আপনার সঙ্গে শীগ্‌গিরই বসতে হবে আমাকে! কবে আসবেন আমার ওখানে বলুন? আমি সব

শুনবো। জানেন, আমি নিবেদিতাকে দেখিনি বটে, কিন্তু বিবেকানন্দকে দেখেছিলাম!

—তাই নাকি! কোথায়?

ডক্টর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন,—এই জাপানে। আমেরিকা যাবার পথে জাপানে এসেছিলেন। সে অনেক কালের কথা, আমার বয়সও তখন কম। ১৮৯৩ সালের কথা। জুন-জুলাই হবে, কোবে বন্দরে এসে উনি নামলেন। আমি কোবেতে যেতে পারিনি, আমি ওঁকে দেখেছিলাম টোকিওতে। ওসাকা, কিয়োটো, ইয়োকোহামা,—সব জায়গাতেই উনি গিয়েছিলেন। মাস খানেক, কি মাস দেড়েক ছিলেন জাপানে, কিন্তু আলাপ-আলোচনায় জাপানে যেন একটা অগ্নিশিখাই জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি!

ওঁরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলি, এই সময় কেশোরামজী বলে উঠলেন,—আমার এক কাকা স্বামীজীর খুব ভক্ত। তিনি মাদ্রাজে স্বামীজীর এক শিষ্য মিষ্টার আলাসিঙ্গার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বামীজীর লেখা কয়েকটি চিঠি আলাসিঙ্গা কাকাকে দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানি ছিল জাপান থেকে লেখা চিঠি। তার এক জায়গায় স্বামীজী লিখেছিলেন, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বছর চীন ও জাপানে যাক। বিশেষ ক'রে জাপানে। জাপানীদের কাছে ভারত এখনো সর্বপ্রকার উচ্চভাব ও মহত্ত্বের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

ডক্টর শিওজাওয়া বললেন,—অত্যন্ত সত্যি কথা। যাক, বড়ো আনন্দ হলো আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে। আজ তাহলে উঠি? মিঃ ঠাকুর, শীগগিরই একদিন বসতে হবে।

—নিশ্চয়-নিশ্চয়,—রাসবিহারী মাথার পাগড়িটা ঠিক করতে করতে লালাজীর দিকে তাকালেন, তারপরে বললেন,—আমিও উঠি, রাত হয়েছে।

তারপরেই, গলা নিচু করে পাঞ্জাবীতে বললেন,—এই সুযোগ

ছাড়া হবে না, একসঙ্গেই বেরিয়ে যাই। দিনকতক বোধহয় দেখা হবে না লালাজী। পরে যোগাযোগ করবো। আপনিও সাবধান, টিকৃটিকির উৎপাত বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, গুড নাইট।

বলে, ডক্টরের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার পি-এন্-ঠাকুর।

অবনী বললেন,—টিকৃটিকির কথা আমারও মনে হয়েছে। কেশোরাম আপনার কাছে থাকুক, আমি বেরোই। এখানে দেখাসাক্ষাৎ করা ঠিক হবে না, অন্য একটা ব্যবস্থা শীগগিরই করছি।

লালাজী বললেন,—ঠাকুরসাহেব যে বলে গেলেন, দিনকতক দেখা হবে না—তার মানে কী?

অবনী বললেন,—নিশ্চয়ই কোথাও যাবেন। লোকটা বসে নেই। পি-এন-ঠাকুর সেজে ওর সঙ্গে দেখা করছে বটে, কিন্তু সেটা বাইরের ব্যাপারে। তলে তলে কাজ ঠিক চলেছে।

—হেরম্ব এখনো এলো না কেন বলতে পারো?

অবনী যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন,—দেখা করার সুযোগ পাচ্ছেন না বোধ হয়। ঠিক সময়ে আসবেন। আপনার কাছে না এসে পারেন?

—তুমি যাচ্ছো কোথায়?

অবনী বললে,—ডেরায়। নতুন একটা ডেরা বার করেছি। এখান থেকে একটু দূরে।

—কোনো হোটেলে?

—না,—অবনী বললে,—একটি বাঙালী ছেলে এসে ছোট একটা বাসা নিয়েছে। তারই কাছে।

—বাঙালী ছেলে! কে বলো ত? আমাদের বন্ধু?

অবনী বললো,—না। এদেশে এসেছে কাজ শিখতে।

লালাজী প্রশ্ন করলেন,—বন্ধু করে নেওয়া যায় না তাকে?

অবনী বললেন,—বোধহয় পারা যাবে না,—বড্ড গোবেচারা।

বলেই একটু থেমে মন্তব্য করলেন,—লালাজী, বাসায় দুখানি ঘর। একটিতে সে থাকে, একটি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই ঘরেই আমাদের মিটিং হওয়া ভালো এবার থেকে। গলি ঘুপচি আছে, টিকটিকিরা সহজে টের পাবে না।

—বেশ। বোসজীকে খবর দিও তুমি।

—আচ্ছা।

অবনী চলে যাবার পর, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে লালাজী আর কেশোরাম পাশাপাশি দুটি খাটে আধশোয়া অবস্থায় গল্প করছিলেন। লালাজী ভিতরে-ভিতরে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন নানাকারণে। দেশের হালের খবর বিশেষ কিছু জানেন না। ভেবেছিলেন হেরম্ব এলে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারবেন। কিন্তু এখনো দেখা হলো না তার সঙ্গে। এইসব নানান চিন্তায় লেখার কাজও হচ্ছে না, আবার ঘুমও আসছে না। তাই শুরু করলেন কথাবার্তা।

বললেন,—আচ্ছা কেশোরাম, এই কাউন্ট ওকাকুরা সম্বন্ধে তুমি কী জানো?

কেশোরাম বললে,—আপনি ত তাঁকে দেখেছেন।

—হ্যাঁ দেখেছি,—লালাজী বললেন,—ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু বেশ আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। জাপানী সামুরাই, অতি অভিজাত বংশের মানুষ, দারুণ আদর্শবাদী।

কেশোরাম বললে,—আমি তাঁকে দেখিনি, কিন্তু কাকার মুখ থেকে শুনেছি। কাকা স্বামীজীর শিষ্য হিসাবে স্বামীজীর জীবনের শেষ বছর দুই প্রায়ই বেলুড়ে যেতেন। একবার গিয়ে দেখেন, জাপান থেকে দুজন অতিথি এসেছেন স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা মিসেস ওলিবুলের বান্ধবী স্বামীজীর অপর শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ওকাকুরা।

লালাজী বললেন,—মিসেস ওলি বুলের কথা আমি শুনেছি। খুব ধনী আমেরিকান মহিলা, স্বামীজী নাম দিয়েছিলেন ধীরামাতা।

এঁরই টাকায় স্বামীজীর বেলুড়-মঠের ভিত্তিস্থাপন।

কেশোরামজী ঈষৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে উঠলো,—বাঃ! আপনিও ত অনেক কথা জানেন, লালাজী!

লালাজীর মুখখানা একটু আরক্ত হয়ে উঠলো, বললেন—লাহোরের 'ট্রিবিউন' কাগজখানা নিশ্চয়ই দেখেছো। ওর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাকে এ-সব কথা বলতো, নইলে আর জানবো কোথা থেকে? এই ওকাকুরার কথাও প্রথম শুনি তাঁর কাছ থেকে। ছোট-খাটো মানুষটি, কিন্তু চেহারায় একটা আভিজাত্য ছিল। বনেদী সামুরাই বংশে জন্ম। ইংরেজী জানতেন মোটামুটি ভালোই। আমেরিকায় গিয়েছিলেন, সেখানেই আলাপ মিসেস ওলিবুলের সঙ্গে। ওলিবুলের কথাতেই ভারতে প্রথম আসেন তিনি স্বামীজীকে জাপান নিয়ে যেতে। জানো কেশোরাম, স্বামীজীর সম্পর্কে আমি আরও অনেক কথা শুনতাম লাহোরে বসে লালা হংসরাজের কাছ থেকে। লাহোর কলেজের প্রিন্সিপাল লালা হংসরাজ।

বলতে বলতে এক সময় হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বসেছিলেন লাজপৎ রায়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, পরে কেশোরামজী আমাকে সবই বলেছিলেন।

লালাজী আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন,—আচ্ছা কেশোরাম, মাদ্রাজে স্বামীজী তাঁর যে বক্তৃতাটি দেন, সেটা তুমি কাগজে পড়েছো বা শুনেছো? ব্রহ্মবাদিন বা ট্রিবিউন, কোন কাগজে পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই, চোখে পড়েছিল তোমার?

—কোন্ বক্তৃতা বলুন ত?

লালাজী বললেন,—মাদ্রাজে বড়ো একটা তাঁবুর মধ্যে সভার আয়োজন হয়, হাজার হাজার লোক স্বামীজীর বক্তৃতা শোনে। স্বামীজীর শিষ্য গুডউইন তাঁর বক্তৃতা নোট ক'রে নিতেন, ১৮৯৮ সালে যিনি উটকামণ্ডে টাইফয়েডে মারা যান। স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ফিউচার অব ইণ্ডিয়া'। এতে তিনি বলেছিলেন, অন্য

দেবতাদের পূজো-টুজো এখন রেখে দাও, গরিয়সী ভারতমাতাই সবার আরাধ্য দেবতা হোন আগামী পঞ্চাশ বছর। জানো কেশোরাম, কোন্ সালে স্বামীজী এই কথাটা বলেছিলেন? ১৮৯৭ সালে। এর্ সঙ্গে পঞ্চাশ বছর যোগ করো? তাহলে দাঁড়ায় ১৯৪৭ সাল। স্বামীজীর ইঙ্গিত অনুসারে তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবে। এতো দেরিতে, কেশোরাম?

কেশোরামজার কাছ থেকে পরে আমি সব শুনেছি, এরপর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারেন নি। কেশোরামও দিতে পারেনি উত্তর, লালাজীও আর কোনো কথা খুঁজে পাননি বেশ কিছুক্ষণ। কেশোরামের কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে তার কাকার কাছ থেকে স্বামীজীর কথা শুনতো বটে, কিন্তু লালাজী যে স্বামীজী সম্পর্কে এতোটা সশ্রদ্ধ বা যথেষ্ট খোঁজখবর রাখতে পারেন, এটা সে ভাবতে পারে নি। লালাজী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য-সমাজের হয়ে কাজ করতেন এবং দয়ানন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, এটুকুই সে জানতো। পাঞ্জাবের লুধিয়ানার জাগরাও বলে এক নগণ্য গ্রামে এক অসচ্ছল পরিবারে জন্ম, ওঁর পিতা লালা রাধাকিষণ সামান্য একজন স্কুল মাস্টার ছিলেন, এসব খবর কেশোরামের জানা ছিল। আরও জানা ছিল, লালাজী আইন পাস করে 'হিসার' বলে পাঞ্জাবেরই এক ছোট শহরে এসে ওকালতি করতে করতে ক্রমে ক্রমে নামজাদা উকিল হয়ে ওঠেন। তারপরে আর্যসমাজের কাজ, ধীরে ধীরে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ। তখনকার জীবনে প্রসিদ্ধ নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদের প্রভাব। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম যোগদান। ফিরোজপুরে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথাও কেশোরাম জানতো। তখনই ওঁর নামটা বেশি ছড়াতে শুরু করে, ইংরেজেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে ওঁর ওপর। তারপরে, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা লক্ষ্য ক'রে তাঁকে কংগ্রেস থেকে পাঠানো হয়

ইংলণ্ডে, দেশের পরিস্থিতি সে দেশে ভালোভাবে ব্যাখ্যা ক'রে শোনানোর জন্য। এখানেই দেখা হয় মহামতি গোখেলের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে একযোগে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। ১৯০৫ সালে কাশীতে কংগ্রেস-অধিবেশন। সে অধিবেশনে গোখেল সভাপতি। লোকমান্য তিলকও ছিলেন। সরকার তখন যে দমন-নীতি চালিয়েছিলেন, সে-সভায় তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান লালাজী। ট্রিবিউন প্রভৃতি কাগজে সে সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়। কেশোরামজী সে-সব অবশ্যই পড়েছিলেন। তারপরে ১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে প্রসিদ্ধ নেতা অজিত সিং-এর সঙ্গে লালাজীকে বার্মায় মান্দালয় জেলে নির্বাসনে পাঠায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। কাগজে কাগজে বড়ো বড়ো করে এই খবর ছাপা হয়। কঠোর সমালোচনা হতে থাকে। ঐ সালেরই নভেম্বর মাসে ওদের দুজনকে জেল থেকে চাপে পড়ে খালাস দিতে বাধ্য হয় সরকার। তারপরে সুরাট কংগ্রেসের কেলেঙ্কারী, ঐ সালেরই ২৬ ডিসেম্বর ভেঙে যায় সুরাট কংগ্রেস। লালাজী তারপরে আসেন নেতৃত্বের প্রথম সারিতে। সারা ভারত জুড়ে তখন 'লাল-বাল-পাল' একটা কিম্বদন্তিতে পরিণত হয়। লালাজীর ওপর সরকারের দৃষ্টি আবার প্রখরতর হয়। তাঁকে শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলো। কিন্তু লালাজী যে এরপরে কোথায় গেলেন সে-খবর কেউ জানতো না, অনুমান করা হতো, বোধহয় আমেরিকায় গেছেন তিনি ; আমেরিকায় গিয়ে 'গদর' পার্টির লালা হরদয়ালের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কেশোরাম নিজে এই খবরই জানতো। তাই ওঁকে জাপানে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, এসবই পরে আমি শুনেছিলাম কেশোরামের কাছ থেকে। সেদিন, ঐভাবে স্বামীজীর কথা উঠতে লালাজী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকবার পর নীরবতা ভঙ্গ করলেন লালাজীই প্রথম, তারপরে বললেন,—মাদ্রাজ থেকে তোমার কাকার

বন্ধু আলাসিঙ্গা পেরুমল 'ব্রহ্মনাদিব' বলে যে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতো, তাতে স্বামীজীর বক্তৃতা খুব বেরুতো। আর বেরুতো ট্রিবিউনে, কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিররে। অবশ্য তাঁর খবর অন্যান্য কাগজেও যে অল্পবিস্তর না বেরুতো এমন নয়, তবে এই তিনটি ভারতীয় পত্র-পত্রিকাই ছিল প্রধান। কোন কাগজে যে অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন পড়েছিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু তাতেও স্বামীজী যা বলেছিলেন, তা আমাদের মনে দাগ কাটবার মতো। তিনি বলেছিলেন,—ইতিহাস ইংরেজের কৃতকার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে-গ্রামে—দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান করে দিয়েছে। কেশোরাম, ইংলণ্ডের মাটিতে পা রেখে, ইংরেজদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছিলেন, চেয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ চীনাদের দিকে, ভগবানের হাতিয়ার হিসাবে তারাই নেবে এর প্রতিশোধ। তারাই তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। তারা সমগ্র ইয়োরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোন কিছুর অস্তিত্ব রাখবে না!

শুনতে শুনতে কেশোরামজীও উঠে বসলো, সবিস্ময়ে বলে উঠলো, —কী বললেন লালাজী, চীনারা?

লালাজী একটু নড়ে-চড়ে বসে নিজেকে একটু সামলে নিলেন, বললেন,—হ্যাঁ চীনারা। চীনাদের মধ্যে কী পরিবর্তন আসছে লক্ষ্য করেছো? অদূর ভবিষ্যতে ওরা যে কতদূর শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না! সামন্ততান্ত্রিক মাঞ্চু রাজাদের পতন একটা সোজা ঘটনা নাকি। ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ মাঞ্চু-রাজবংশের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। এবং এরই সুযোগ নিলেন চীনের বিপ্লবীরা। সান ওয়েন, অর্থাৎ যাকে তোমরা সান ইয়াৎ সেন বলে জানো, তাঁর মতো বিপ্লবী নেতা যে দেশে জন্মায়, সে দেশ ভাগ্যবান।

—সান ইয়াৎ সেন! তিনি ত এখানে, এই জাপানে!

লালাজী বললেন,—জানি। এবং এ-ও জানি তার সঙ্গে আমার দেখা একদিন হবেই।

কেশোরাম বললে,—বোসজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। বোসজীর কাছেই তাঁর কথা একদিন শুনছিলাম বসে বসে। ১৮৬০ সালে জন্ম। তাঁর জন্মের দুই বছর আগে তাইপিং বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করেছে মাঞ্চুরাজ। ছোটবেলায় এই বিদ্রোহীদের বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতেই তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। কুয়াংটুং প্রদেশে এক গরীব চাষী-পরিবারে জন্ম। ওঁর বাবা খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

লালাজী আগ্রহ সহকারেই শুনছিলেন, বললেন,—ওঁর ছোট-বেলাকার খবর তত জানি না। বলো দেখি, কী শুনেছো?

কেশোরামজী বললো,—মাত্র তেরো বছর বয়সে দাদার কাছে হাওয়াই দ্বীপে চলে যান, সেখানে পড়াশুনা করেন পাঁচবছর। তারপরে আসেন হংকং-এ, এখানে ডাক্তারী পাস ক'রে প্রাকটিশ শুরু করেন।

লালাজী ওর কথার রেশ ধরেই বলতে লাগলেন,—কিন্তু ভিতরে যাঁর দেশ-প্রেমের আগুন জ্বলছে, তিনি শুধু ডাক্তারী ক'রে আর বেড়াবেন কতদিন? দেখতে দেখতে একটা রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুললেন তিনি, নাম দিলেন,—সিং-চুং-হুই, যার মানে হলো, চীন বাঁচাও সমিতি। চীন-জাপান যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লব করলেন বটে, কিন্তু সার্থক হতে পারলেন না। তারপর কয়েকটা বছর পর পর আরও চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কিছু হলো না। রাজরোষ এড়াতে শেষ পর্যন্ত ওঁকে আমাদের মতো পালিয়ে যেতে হলো দেশের বাইরে। গেলেন ইংলণ্ডে। ওঁর মাথার জন্য মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। ইংলণ্ডে ওঁকে একদিন অতর্কিতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে চীনা দূতাবাসে আটকে রাখা হলো। কী পরিণতি হতো জানি না, ওঁর প্রাক্তন শিক্ষক স্যর জেমস্ ক্যান্টিলের চেষ্টায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের চাপে ওঁকে ওরা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইসব নিয়ে

তখনকার কাগজগুলিতে খুব বড়ো-বড়ো করে খবর বেরুতো, তোমার মনে নেই ?

কেশোরাম বললেন,—হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে আছে। তখনই ও ওঁর নামটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

লালাজী আপন আবেগে বলে চলেছেন,—আমরা ইটালীর ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির বিপ্লবী জীবন থেকে প্রেরণা নিয়েছি, আর সান ওয়েন নিয়েছেন নিজেদের দেশেরই বীর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ থেকে। অবশ্য, ধন্যবাদ লোকমান্য তিলককে, তিনি শিবাজী উৎসবের ব্যবস্থা করে আমাদেরই দেশের বীরত্বের মহিমার দিকে আমাদের চোখে ফিরিয়ে দিলেন। আচ্ছা কেশোরাম, চীনাদের বক্সার আন্দোলন সম্পর্কে কিছু জানো ?

কেশোরাম বললে,—সামান্য। আমাদের দেশে ও-সব কথা বেশি প্রচার যাতে না হয়, সেদিকে ব্রিটিশের লক্ষ্য কি কম ?

লালাজী বললেন,—ঠিক বলেছো। আমি জেনেছিলাম লালা হরদয়ালের কাছ থেকে। হরদয়ালের মতো মেধাবী ছাত্র খুব কমই দেখা যায়। বৃত্তি নিয়ে বিলেতে পড়তে গেলেন, এসব খবর ত তুমি নিশ্চয়ই জানো। 'গদর'-পার্টিকে নতুন করে উজ্জীবিত করতে আমেরিকা যাবার আগে দেশে এসেছিলেন ; ব্রিটিশ তখনই তাঁকে জেলে পুরতো, একরকম জোর করেই তাঁকে আমেরিকা পাঠানো হয়। তা, এই হরদয়াল যখন দেশে এলেন বিলেত থেকে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়। ওঁর কাছ থেকেই শুনি বক্সার বিদ্রোহের কথা। বক্সার বিদ্রোহের দুটি দিক ছিল। একদল চাইতো চীনা থেকে বিদেশীদের উচ্ছেদ করতে, আর একদল চাইতো মাঞ্চু সরকারের পতন। আমাদের দেশে বিপ্লবী সংস্থা যেমন গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট যুব-সমিতি, যারা লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, ড্রিল প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম-কসরৎ করতো, তাদের মধ্য থেকে,—ঠিক তেমনি ঘটেছিল চীনদেশে ; ওদের ব্যায়ামের প্রধান

বিষয় 'বক্সিং',—সেজন্য বক্সিং যারা করতো, সেই বক্সাররাই হয়ে দাঁড়ালো বিপ্লবী। তাই এই আন্দোলনের নামকরণ হয়েছে 'বক্সার-বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি, তবে এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক মাঞ্চু গভর্নমেন্টের ভিত্তি যে টলমল করে উঠেছিল, এ বিষয়ে ভুল নেই। আর, এই সুযোগটাই নিয়েছিলেন সান ওয়েন বা সান ইয়াৎ সেন। দেশের বাইরে নানান জায়গায় কম চাইনিজ বাস করতো না, তাদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে লাগলেন সান ইয়াৎ সেন। ঠিক আমাদের হরদয়াল বা অন্যান্যদের মতো। তারপরে লুকিয়ে দেশে এসে বা লোক পাঠিয়ে বিভিন্ন বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে লাগলেন; ১৯০৫ সালের আগস্টে সবাইকে নিয়ে একটি প্রগতিপন্থী বিপ্লবী দল গড়তে সফলকাম হলেন, নাম হলো,—তুং-মেং-হুই, যার মানে করলে দাঁড়ায়,—'মিলন সমিতি।' এই মিলন সমিতির মাধ্যমে তিনি যে আগুন জ্বাললেন, তাতে হ্যাঙ্কাও-এর রাজকীয় সৈন্যরা পর্যন্ত বিদ্রোহের সামিল হলো। এইবার বুঝেছো কেশোরাম, আমাদের বাংলাদেশে টাইগার যতীন বা যতীন মুখোপাধ্যায় কেন চেয়েছিলেন সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লববাদ ছড়িয়ে দিতে? আমাদের বোসজীর কথাই ধরো না কেন, উনিও ত চেয়েছিলেন সেটা। বাঘা যতীন কাজ করতেন বাংলাদেশে আর বোসজী কাজ করতেন উত্তর ভারতে। উদ্দেশ্য ছিল একই। বিশ্বাসঘাতকতা আর দলের কারুর কারুর সামান্য অসর্তকতার জন্য সব কিছু ভেস্তে না গেলে কী কাণ্ডটাই না হতো বলো দেখি!

কেশোরাম বললে,—তা বলে কেউ আপনারা হাল ছাড়েন নি। ওদিকে হয়েছে গদর-পার্টি, জার্মানীতে হয়েছে বার্লিন কমিটি, দেশে কাজ করছেন টাইগার যতীনবাবু, নরেন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

উত্তেজিত হয়ে লালাজী বলে উঠলেন,—কিন্তু লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা! কত লোকের যে ফাঁসী হবে, তার ইয়ত্তা আছে? দেশের

বাছা বাছা বিপ্লবীরা আন্দামানের সেলুলার জেলে কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছে কে জানে!

রাত তখন অনেক। ওঁদের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। কেশোরামজী পরে আমাকে বলেছিলেন, সে রাত বোধহয় পুরোই আমাদের জেগে কেটেছিল। লালাজী আবার একটু থেমে, নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেছিলেন সান ইয়াৎ সেনের কথা। ১৯১১ সালের সেই বিপ্লব প্রচেষ্টার ফলে মাঞ্চুরাজের পতন ঘটে, গড়ে ওঠে প্রজাতন্ত্রী সরকার, যার প্রেসিডেণ্ট হন ডাঃ সান ইয়াৎ সেন। কিন্তু মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য। শিশু প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে আর বিভিন্ন বিপ্লবী-সংস্থার মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আরও জোরদার করবার জন্য তিনি পদত্যাগ করে জেনারেল য়ুয়ান-শিকাইকে প্রেসিডেণ্ট করলেন। দেশের স্বার্থে এ কতো বড়ো ত্যাগ বলো দেখি। তাঁর এই দেশপ্রেম আর স্বার্থত্যাগ তাঁকে তাঁর দেশেই শুধু দেবতা করে তোলে নি, সারা জগতের দেশপ্রেমিকদের কাছে তিনি প্রণম্য হয়ে উঠলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য দেখ। জেনারেল য়ুয়ান ছিলেন সেনাপতি, তাঁর হাতে ছিল আধুনিক সমর-শিক্ষায় সৈন্যদল। এরা শেষ পর্যন্ত পুরোভাগে এসে পড়ায় বিদ্রোহের সুফল যে তাড়াতাড়ি ফলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু য়ুয়ান ছিল আসলে স্বার্থপর আর প্রতিক্রিয়াশীল। সে হয়ে দাঁড়ালো ডিক্টেটর। প্রজাতন্ত্রের ভাবধারাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সে নিজেকে মাঞ্চুরাজাদের উত্তরাধিকারীদের মতো সিংহাসনে বসলো। ফলে সান ওয়েনকে আবার বিদ্রোহ করতে হলো। এ-বিদ্রোহ অবশ্য অচিরেই দমিত হলো, সান ওয়েন বা সন ইয়াৎ সেনকে জাপানে এসে নির্বাসনে থাকতে হলো। কিন্তু, উনি কি বসে আছেন? আমার ত তা মনে হয় না।

এইখানে, আমি শ্রীসঞ্জয়, যে এই কাহিনীর অন্যতম শ্রোতা,—তার কথা একটু বলা আবশ্যক। শ্রীসঞ্জয়-রূপী আমি ডাক্তারবাবুরই মতো তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম। শেফালী দম নেবার জন্য কিম্বা

যে কারণেই হোক, পাঠে সামান্য একটু ছেদ দিয়েছিল। সেই ফাঁকে দরজার পাল্লায় একটা শব্দ হতেই আমাদের চমক ভাঙলো। আমাদের মতো শেফালীও চকিত হয়ে দরজার দিকে মুখ তুলে তাকালো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিতাইয়ের মা, মাথার ঘোমটা একটু ওঠানো। শেফালীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললে,—দিদিমণি, বেলা যে অনেক হলো। দুটো বেজে গেছে।

অপ্রতিভ হয়ে শেফালী উঠে দাঁড়ালো। এবার আর ডাক্তারবাবু বাধা দিতে পারলেন না। সুতরাং সভা ভঙ্গ হলো। শেফালী খাতাগুলি গুছিয়ে রেখে নিতাইয়ের মার কাছে উঠে এলো, আস্তে আস্তে বললে,—হ্যাঁরে, দাদুর খাওয়া হয়ে গেছে?

নিতাইয়ের মায়ের গলার স্বর শুনতে পেলাম,—কখন! চেয়ে দেখ না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

এসব খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। ডাক্তার এরপর আমাকে নিয়ে পড়লেন। আমার ড্রেসিং ইত্যাদি। তারপরে ওঁরা গেলেন খেতে, নিতাইয়ের মা এলো আমাকে খাওয়াতে। এসব শেষ ক'রে আবার যখন আসর বসলো, তখন ডাক্তারবাবু শেফালীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আর কতোটা লেখা আছে?

শেফালী আর একখানা বাঁধানো খাতা উঁচু করে দেখালো, বললে,—আরও একখানা খাতা।

তার মানে বোঝা গেল, সান ইয়াৎ সেনের কথার সঙ্গে সঙ্গে একখানা খাতা পুরো শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সলিলবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন,—আমারই দুর্ভাগ্য, আর বেশি সময় দিতে পারবো না। বড়ো জোর এক ঘণ্টা। কিন্তু এ ছেড়ে কি উঠতে ইচ্ছা করে, তুমিই বলো?

শেফালীর মুখখানা খুশির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আমার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে,—আপনার রোগী ঐ উনি আসাতেই দাদুর সব মনে পড়ে গেল, নইলে ওঁর ডায়েরী থেকে

আর উদ্ধার করা যেতো কতটুকু ? কি সুন্দর গুছিয়ে বলেছেন, না ? যেমন ভাবে বলেছেন, ঠিক সেইভাবে আমি লিখে নিয়েছি।

ডাক্তারবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন,—ডায়েরী ছিল নাকি ওঁর ?

—বারে, ছিল না ?—শেফালী বললে,—ছু-খানা বাক্স ভর্তি ডায়েরী। ছিঁড়ে গেছে—পৃষ্ঠা লাল হয়ে গেছে—কোথাও কোথাও লেখাগুলো অস্পষ্ট !—ডায়েরী লেখার ঝোঁক নাকি ছিল ওঁর বরাবর। এই বছর পাঁচেক আর তেমন লেখতে পারেন না। তবু প্রতি বছর বড়ো ডায়েরী একখানা করে ওঁর জন্য কিনে আনতেই হয়। এবারেও এনেছি। কিন্তু বছর পাঁচ ধরে ডায়েরীগুলির অধিকাংশ পৃষ্ঠাই সাদা রয়ে গেল। চলুন না ঐ ঘরে, দেখাচ্ছি সব।

—না থাক,—ডাক্তারবাবু বললেন,—বিশ্রাম করছেন, এখন আর ডিসটার্ব করে লাভ নেই, অন্য একদিন এসে দেখে যাবো।

শেফালী বললে,—পুরোনো পুরোনো বইও আছে অনেক। বাঁধানো সেকেলে পত্রিকাই কি কম ?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, সেগুলো আসতে-যেতে নজরে পড়েছে। আচ্ছা ডায়েরীগুলি কেমন করে লেখা ? বাংলায়,—বেশ গুছিয়ে ?

শেফালী একটু হেসে বললে,—না-না। ইংরেজীতে লিখে গেছেন—ছোট ছোট করে—অনেকটা আউটলাইনের মতো। আপনি আমি পড়ে বিশেষ কিছুই বুঝবো না। তাহলে ত ওঁকে কষ্ট না দিয়ে ডায়েরী ধরে ধরে আমিই হয়ত লিখে যেতে পারতুম। তবে হ্যাঁ, সাল-তারিখগুলো পাওয়া যায়। এইগুলোই খুব দরকারী।

সলিলবাবু বললেন,—সাল তারিখগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে লিখছো বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—খুব ভালো। নাও, পড়ো এবার,—বলেই আমার দিকে

মুখ ফেরালেন ডাক্তারবাবু, মন্তব্য করলেন,—কী, ঘুম-টুম পাচ্ছে না ত ?

বললাম,—না।

—তাহলে শুরু হোক।

—হোক।

শেফালী খাতাখানা মুখের সামনে মেলে ধরলো।

সে-রাত্রে ওঁদের দুজনের চোখে ঘুম ছিল না। সান ইয়াৎ সেনের কথা ওঠার পর খানিকক্ষণ নীরবতার মধ্যে কেটে গিয়েছিল। দুজনেই যেন নিজের নিজের চিন্তার মধ্যে মগ্ন। সেই চিন্তার প্রবাহই যেন এক সময় সোচ্চার হয়ে উঠলো লালা লাজপৎ রায়ের কণ্ঠে, বললেন,—সান ইয়াৎ সেন চেয়েছিলেন প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করতে। চীনের জাগরণও যেমন সারা এশিয়ার পক্ষে কাম্য, ভারতের জাগরণও তাই। এ কথা বুঝেছিলেন ওকাকুরা। মিস্ ম্যাকলাউড, ধর্মপাল, ওকাকুরা এবং ওকাকুরার সঙ্গে গিয়েছিলেন আরও একজন জাপানী—রেভারেণ্ড ওডা—এঁদের নিয়ে অসুস্থ শরীরেও স্বামী বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থে। স্বামীজীর সঙ্গে ওকাকুরার কী অন্তরঙ্গ কথোপকথন হয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু সারনাথ দেখার পর স্বামীজী কাশী থেকে ফিরে আসেন বেলুড়ে, আর ওকাকুরা উত্তর ভারতে আরও ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আমাদের মতো যাদের সঙ্গে দেখা হতো, তাদের একান্তে ডেকে বলতেন জাতীয়তার কথা, বলতেন গুপ্ত সমিতি গঠন করার কথা, আর বলতেন,—Asia is one,—এশিয়া এক। জানো কেশোরাম, পরে যখন নিবেদিতার সঙ্গে বেলুড়ে ওঁর একান্তে আলাপ হয়, তখন দুটি ভারতপ্রেমীর সহযোগে যেন একটি অগ্নিশিখা দপ করে জ্বলে উঠলো। নিবেদিতার কাছে আসতো তরুণ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ। এই সুরেন্দ্রনাথের গৃহেই পরে থাকতেন ওকাকুরা। ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

পরিচয় করিয়ে দেন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ কেন, সমগ্র ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেই। আমি সরলা দেবীর কাছ থেকে এ-সব খবর শুনেছি। জানো ত কেশোরাম, এই সরলা দেবী কে?

কেশোরাম একটু হাসলো, বললো,—জানি না আবার! বাংলাদেশে বীরাষ্টমীব্রতের স্রষ্টা ইনি, তরুণদলকে জাতীয়তাবাদে দীক্ষা দেওয়া কিম্বা সংগঠিত করায় এঁর অবদানই কি কম? এঁকে ত পুলিশ একসময় গ্রেপ্তার করার আয়োজন করেছিল! ব্যারিস্টার সি-আর-দাশ খবরটা জানতে পেরে এঁকে সাবধান করে দিয়ে আসেন।

লালাজী বললেন,—আরে, জানো দেখছি সব! জানবে ত বটেই, এঁদের খবর কোন্ বিপ্লবীই বা না জানে! সরলাদেবীর মা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, নামকরা লেখিকা, রবীন্দ্রনাথের দিদি। সরলাদেবীর বিয়ে হয় কিন্তু আমাদের লাহোরের রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে। রামভজ আমার বিশেষ বন্ধু, আমাদের আর্যসমাজের একজন স্তম্ভ বলতে পারো। রাজনীতিতে উগ্রপন্থী, এঁর সম্পাদনায় লাহোর থেকে যে উর্দু সাপ্তাহিকটি বেরোয়, তা দেখেছো তুমি?

—হ্যাঁ, হিন্দুস্তান। তাই না?

—ঠিক বলেছো,—লালাজী বললেন,—রামভজ পাঞ্জাবের বড়ো ঘরের ব্রাহ্মণ। এই বিয়ের ফলে আমাদের আর্যসমাজের সঙ্গে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল!

কেশোরাম বললে,—রামভজজীকে আমি লাহোরে দেখেছিলাম একটা সভায়। বছর আটেকের ফুটফুটে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

লালাজীর কণ্ঠস্বর যেন স্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠলো, বললেন,—দেখেছো তুমি দীপককে? ওর নাম দীপক। ভারী সুন্দর হয়েছে বাচ্চাটা!

বলে, একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন লালাজী, তারপরে বলতে শুরু

করলেন,—আসল কথা কেশোরাম, তুমি আজ সঙ্গে আছো বলেই এত কথা বলে যাচ্ছি।

কেশোরাম বললে,—বলুন লালাজী, শুনতে খুব ভালো লাগছে।

তোমরা এইখানে মনে রেখো, আমি লালাজীকে দেখিনি, আমার যা শোনবার, তা শুনেছিলাম কেশোরামজীর কাছ থেকে। কেশোরামজী যে কতো আগ্রহ নিয়ে এ-সব কথা শুনেছিলেন, তা' আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করে যে বলতে পেরেছিলেন,—এ-থেকেই তা প্রমাণ হয়।

কিন্তু যাক সে সব কথা। লালাজীর কথাই বলি। লালাজী বলতে লাগলেন, রামভজ দত্তচৌধুরী লাহোরে ব্যবহারজীবী ছিলেন। লাহোরে থাকতেন বটে, ওঁদের আসল বাড়ি ছিল 'কঞ্জরুর'-এ। সরলাদেবীকে বিয়ে করবার আগে রামভজজী আগে পর-পর দুটি বিয়ে করেছিলেন। জানো ত, অল্পবয়সেই পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণদের বিয়ে হয়? সে-বউ দুটি বাঁচেনি, তাদের ছেলেপিলেও ছিল না। আসলে রামভজজীর তৃতীয়া পত্নী হচ্ছেন সরলাদেবী,—দুজনের মধ্যে বয়সের ফারাক কম ছিল না। ওঁদের বিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম বৈদ্যনাথ ধামে। যাই হোক, এই সরলাদেবীর কাছ থেকেই ওকাকুরার অনেক খবর পেয়েছিলাম। ওকাকুরা যে খুব ঘনঘন সিগারেট খেতেন, এ-খবরটাও আমার জানতে বাকি ছিল না। কিন্তু কেশোরাম, আসল কথা যা তোমাকে বলতে চাইছিলাম, তা এ-প্রসঙ্গ নয়। একদিকে ওকাকুরা যে গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পে জাতীয় ভাবধারার উৎসাহ দিতেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতেন, তেমনি আবার নিবেদিতার কাছে এসে নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় একটি বই লিখতেন, The ideals of the East, ইংরেজী ভাষায়। এই বই লেখার আগেই মিসেস ওলি বুল কলকাতায় এসে গেছেন। আসলে এই ওলি বুলই ওকাকুরাকে পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি খুব আড়ম্বর করে পার্টি-টার্টি দিয়ে ওকাকুরাকে কলকাতা-

সমাজে পরিচিত করে দিয়েছিলেন বলে শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম সুরেন্দ্র ঠাকুরকে নিয়ে ওকাকুরার আবার উত্তর ভারত-ভ্রমণের কথা। সেবার স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বেরিয়ে বুদ্ধ গয়া, সারনাথ, কাশী গিয়েছিলেন, তারপর মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতিদের সঙ্গে অজন্তা-ইলোরা পর্যন্ত। এবারের ভ্রমণটা অন্যরকম। শুনেছি, সুরেন্দ্রঠাকুর আর ওকাকুরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছেন, রাতের বেলা আশ্রয় নিয়েছেন পথের পাশে যে সরাইখানা পেয়েছেন, সেখানেই। আর তরুণদলদের কাছে পেলেই ওকাকুরা নাকি প্রশ্ন করতেন,—দেশের জন্য কী কাজ করছো?

উনি একটু থামতেই কেশোরাম বলে উঠলো,—ওকাকুরা সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন আপনি লালাজী, ডঃ শিওজাওয়াকে সব বললেন না কেন?

লালাজী একটু হেসে বললেন,—তুমিও যেমন! এসব আর এমন কি খবর, ডক্টর অবশ্যই এসব জানেন। আসলে আমার থেকে বোসজী খবর রাখেন আরও বেশি। বোসজীর কাছ থেকেই ডক্টর সব শুনে নেবেন। তারপরে শোনো কেশোরাম, যে-কথা বলছিলাম? ওকাকুরার বইখানি, যেটি লিখতে মিসেস বুল্, মিস ম্যাকলাউড আর সিস্টার নিবেদিতা অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিলেন তাঁকে, সেটি প্রকাশিত হলে যেন দেশের ওপর দিয়ে অগ্নিপ্রবাহ খেলে গেল! নিবেদিতা লেখায় শুধু প্রেরণাই দেননি, তিনি আগাগোড়া টাইপ করে ওর কপি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর বইয়ের ভাব ও ভাষা বাংলা থেকে পাঞ্জাব—আমাদের সবার মধ্যে দারুণ উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিল। আমি তখন যে-সব প্রবন্ধ কাগজে-কাগজে লিখতাম, তাতে ওকাকুরার এই ভাবধারার প্রভাব থাকতো, ওঁর বই থেকে কোটেশন পর্যন্ত তুলতাম। বইখানা আকারে খুব বড় নয়, ছোট। আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছিলাম। ওঁর বইখানা আরম্ভ হয়েছিল কী ভাবে জানো? Asia is

One, এই কথাটা দিয়ে ওঁর বক্তব্য শুরু। আর শেষ হয়েছিল যে কথাটা দিয়ে, সেটি হলো,—Victory from Within or Death from without. ওকাকুরার কাছে আমরা কম ঋণী নই। এশিয়া যে ইয়োরোপ নয়, এশিয়ার যে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই যে এশিয়াকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে,—এটাই ছিল ওকাকুরার ভাবধারা। শুনেছি, জাপানে যখন Industrialisation বা শিল্পায়ন শুরু হলো, জাপান যখন দ্রুত পাশ্চাত্য জড়বাদকে গ্রহণ করতে লাগলো, তখন এই ওকাকুরা এবং ওঁর মতো আরও কয়েকজন রুখে দাঁড়িয়ে জাতীয়বাদের দিকে জাপানের মোড় ফেরাতে সচেষ্ট হলেন। এর জন্য ওঁকেও নাকি এ-দেশে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। সরকারী উচ্চপদ, উচ্চ ক্ষমতা, এসব নাকি হেলায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। তুমি জানো এসব কিছু ?

কেশোরীরাম ধীর গলায় বললে,—বোসজীর কাছ থেকে শুনেছি। এই জাতীয় জাগরণ এবং 'এশিয়া এক হও' বাণী, এর প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানে যে বিপ্লব-সংস্থা গড়ে ওঠে, তার অন্যতম নেতা হচ্ছেন তোয়ামা, যাঁর কাছে গিয়েছিলেন বোসজী, আর যাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন স্বয়ং সান ইয়াৎ সেন।

লালাজী মন দিয়ে শুনছিলেন। আবার উঠে বসলেন বিছানার ওপর। জানালার বাইরে আকাশ তখন বোধ হয় অল্প অল্প ফরসা হয়ে আসছিল। পরস্পরের মুখ ওঁরা আবছা দেখতে পাচ্ছিলেন। লালাজী বলতে শুরু করলেন,—তোমার সঙ্গেও আমি দেখা করবো, ওঁদের ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির নাম আমি জাপানে পা দিয়েই শুনেছি। ওকাকুরা এই বিপ্লববাদেই ছিলেন দীক্ষিত। ভেবে দেখো কেশোরাম, কলকাতায় দুই বিপ্লববাদীতে দেখা হওয়াটা কী অদ্ভুত ঘটনা। আমি ওকাকুরা আর নিবেদিতার কথাই বলছি। সিস্টারও কম যান না। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে থাকতেই উনি

বিপ্লবপন্থী। প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের প্রভাবে ছিলেন প্রভাবান্বিতা, আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। আর এই দুইয়ের সহযোগে এক মহান বাণী সোচ্চার হয়ে উঠলো ওকাকুরার কণ্ঠে,—Victory from within, or Death from without কেশোরাম, এই জাপানে আমাদের একটা কিছু করে যেতে হবে!

ওঁরা কথাবার্তা বলছেন, আকাশ আরও ফরসা হয়ে এলো, কেশোরাম উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখে জলটল দিয়ে এলো। এসে দেখলো, লালাজী যেন ধ্যানস্থ মূর্তির মতো বসে আছেন। আরও কিছুক্ষণ কাটলো। মহানগরী ততক্ষণে জেগে উঠেছে। একটু পরে, ওভারকোট ঢাকা, ছাতা হাতে একটি তরুণ বয়স্ক মানুষ এসে বাইরের দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলো। টোকার ধরণে একটা সংকেত ছিল। লালা লাজপৎ রায় চমকে উঠে বললেন,—দেখো ত, চেনা মানুষ মনে হচ্ছে। হেরম্ব এলো নাকি?

কেশোরাম ঘর ছেড়ে পাশের ঘর পেরিয়ে বাইরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলো। দরজায় আবার সেই ধরণের টোকার সংকেত। চট্‌ করে পাল্লা খুলে চৌকাঠের ওপর দরজা আগলে দাঁড়ালো কেশোরাম। বিপ্লবীদের শিক্ষাই ছিল এরকম। সদা সতর্কভাব। সাবধানের মার নেই। তাকে দেখে মাথার টুপিটা একটু ওঠালো আগন্তুক। বেঁটে মতো দোহারা চেহারা, কালো-কালো চেহারার ছেলেটিকে দেখেই চিনতে পারলো কেশোরাম। এর পুরো নাম জানা নেই, 'দাস' বলেই পরিচিত মহলে বিখ্যাত। একটি ভারতীয় ছাত্র। ছাত্রটিও তাকে চেনে। তবে আসল নামে নয়, আসল নাম লালাজী-বোসজী-অবনী এবং আরও অন্তরঙ্গ দু-একজন ছাড়া কেউ জানে না। যাই হোক, ছাত্রটি একটি ছোট্ট কাগজ তার হাতে দিলো, নিচু গলায় বললে,—মিস্টার টেগোর আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন।

বলেই, আর সে দাঁড়ালো না, কুয়াশার মতো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মেলে মুহূর্তে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেশোরাম দরজাটা

আলো করে বন্ধ করে ফিরে এলো ঘরে। ছোট্ট চিরকুট। তাতে পেন্সিলে লেখা,—He has not reached tokyo, he is in Manilla. নিচে লেখা আছে—'T'.

লালাজী উৎসুক হয়েই ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—কী ব্যাপার কেশোরাম?

কাছে এসে নিচু গলায় কেশোরাম বললে,—বোসজী নোট্ পাঠিয়েছেন। হেরম্ব গুপ্ত এখনো টোকিওতে আসেন নি, তিনি এসেছেন ফিলিপাইনে—ম্যানিলায়।

—ও, তাহলে আমি ভুল খবর পেয়েছিলাম?

কেশোরাম বললে,—ভুল নয়। হয়ত টোকিও-তেই আসছিলেন, আগে ম্যানিলায় নেমে গেছেন কোনো জরুরী কাজে।

লালাজী প্রশ্ন করলেন,—কে দিয়ে গেল চিঠিটা?

—দাস।

—দাস কে?

কেশোরাম বললে—যে-বাড়িতে অবনী উঠেছেন, তারই একটি ঘরে থাকে। এখানে কী শিল্প শিখতে এসেছে যেন, স্টুডেণ্ট।

—বাঙালী?

কেশোরাম বললে,—বাঙালী বলেই পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু বোসজী বলেন,—কথাবার্তায় টানটা ঠিক খাঁটি বাঙালীর নয়। অবনীবাবুকে খোঁজখবর নিতে বলে গেছেন বোসজী।

—স্পাই-টাই নয় ত?

কেশোরাম বললে,—না, তা নয়। তাহলে অবনী ওর বাসায় গিয়ে উঠতেন না। তবে, আমাদের inner circle-এ নেবার মতো লোকও নয়। সাধারণ ছেলে।

লালাজী কী যেন ভাবলেন এক মুহূর্ত, তারপরে একসময় বিছানা ছেড়ে মেঝেতে পা দিতে দিতে বললেন,—অবনী কিন্তু আমাদের উত্তর ভারতেই কাজ করতো, জানো ত? অথচ কলকাতারই ছেলে।

বোসজী ওকে খুব ভালোভাবেই চেনে। হরদয়াল, বীরেন চ্যাটার্জী, বরকতুল্লা,—এদেরই মতো বিদেশে কাজ করবার জন্য তাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। ভালো কথা, বরকতুল্লাকে জানো ত?

কেশোরাম বললে, বরকতুল্লা ত জাপানেই কাজ করতেন। এখানে কিছুদিন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে গেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল ভালোই। কাগজে-কাগজে যে সব প্রবন্ধ লিখতেন ভারত সম্পর্কে, সে সব ভালো লাগতো না ইংরেজ-জাপ সরকারের। ফলে, ওর চাকরি ত গেলই, জাপান থেকে বহিষ্কৃতও হলেন।

—কতজন কতদিকে আমরা কাজ করছি, একটা কিছু হবে না?

বলতে বলতে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলেন লালাজী।

সেদিন সন্ধ্যার পর অনেকটা হন্তদন্তের মতো অবনী এসে উপস্থিত। এসেই বললে, লালাজী, গাড়ি এনেছি, স্ট্রাইক দি টেণ্ট। পাঁচমিনিট সময়।

লালাজী আর প্রশ্ন করলেন না, তাড়াতাড়ি নিজের বাক্স আর বেতের ঝুড়িটা গুছিয়ে নিতে তৎপর হলেন, কেশোরামও তাই। ওঁরা জানেন, বিপ্লবীর কাছে 'স্ট্রাইক দি টেণ্ট' শব্দটার অর্থ কী। অর্থাৎ একখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। এখানকার খবর শত্রুপক্ষ টের পেয়ে গেছে। শত্রুপক্ষ জাপানী পুলিশও হতে পারে, ইংরেজদের গুপ্তচরও হতে পারে। কিন্তু ঠিক এই সময় প্রশ্ন প্রতি-প্রশ্ন করে কালক্ষেপ করা ওঁদের নীতি নয়। লালাজীকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে দিয়ে, অবনীর কাছ থেকে ডেরার সন্ধান জেনে নিয়ে কেশোরাম হোটেলের ম্যানেজারের কাছে চলে গেল বিল মেটাতে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এই কেশোরামই ছিল তখন লালাজী আর রাসবিহারী বসুর চলমান ব্যাঙ্ক। আর ওঁদের দুজনেরই টাকার কিছু অংশ, সম্ভবত মোটা অংশই কেশোরামজীর কাছে থাকতো। রাসবিহারী টোকিওতে এসেছিলেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। ওঁকে

এখানে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন ভাই ভগবান সিং। টাকাটা এইভাবে ভাগ ভাগ করে রাখাও ওঁদের কর্মপদ্ধতির অন্যতম নীতি।

ওঁদের নতুন ডেরাও খুব দূরে নয়, ঘুর পথে হাঁটতে হাঁটতে কেশোরাম সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো ঘণ্টাখানেক পরেই। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি তখন থেমেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা একটা হাওয়া দিয়েছে খুব জোর। কেশোরামের হয়ত নম্বর মিলিয়ে বাড়িটা খুঁজে পেতে একটু দেরি হতো, কিন্তু রাস্তার মোড়ে তাঁরই জন্য দাঁড়িয়েছিলেন কিমুরা। ওঁকে দেখে কাছে এসে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে পাশাপাশি চলতে শুরু করলেন।

ছোট দোতলা বাড়ি, কিমুরাই দেখা গেল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁর চেনাজানা ভদ্রলোকের বাড়ি, ভদ্রলোক নিজে চলে গেছেন কোবেতে, বাড়িটা খালিই পড়েছিল। কাছেই বড়ো একটা হোটেল, সেখান থেকে খাবার আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেনও তিনি।

ওঁকে দোতলার নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে কিমুরা চলে গেলেন। ঘরে রয়েছেন স্বয়ং রাসবিহারী, রীতিমত ঝকঝকে স্যুট পরণে, কিন্তু মাথায় পাগড়িটা নেই, রয়েছে একটা ছাইরঙের ফেল্ট হ্যাট। লালাজী বসে আছেন একটা ইজিচেয়ারে ফায়ার প্লেসের পাশে, কাছেই একটা চেয়ারে অবনী মুখার্জী। সামনের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম, টোস্ট, ডিম ইত্যাদি। ওঁকে দেখেই বলে উঠলেন রাসবিহারী,—এসো এসো খেয়ে নাও—তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি।

লালাজীর মুখখানা গম্ভীর। অবনীর মুখও থমথমে। নীরবেই ওদের প্রাতরাশ শুরু হলো।

কেশোরাম বললে,—ইঁদুররা গন্ধ পেয়েছে বুঝি?

রাসবিহারী বললেন,—ইঁদুর কেন, টিকটিকি বলো। জাপানী পুলিস এতটা তৎপর নয়, কিন্তু ইংরেজের এমব্যাসী হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। টিকটিকি লাগিয়েছে। নতুবা সাত সকালে ডেরা ভেঙে

তোমাদের নিয়ে আসি? পি-এন. ঠাকুরের আস্তানাতেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি পুরুস্টু মুর্গা দেখলে কোন্ শেয়ালের না জিভ লকলক করবে বলো?

কথার ধরনে লালাজীর গম্ভীর মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো। আসলে থমথমে, গম্ভীর আবহাওয়াটাকে হালকা করে দেবার জন্যই রাসবিহারী হাসির লহর তুলে বললেন,—তারপর কেশোরাম? কাল সারারাত না ঘুমিয়ে ওকাকুরার গল্প শুনে কাটিয়েছো ত?

কেশোরাম কিছু বললো না, একটু হেসে চাম্‌চে শুদ্ধ খাবারটা মুখে পুরে দিলো।

রাসবিহারী লালাজীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—ওকাকুরাকে তুমি তাহলে চাক্ষুষ দেখেছিলে?

হ্যাঁ, তা দেখেছিলাম,—লালাজী বললেন, আমাকে কংগ্রেস থেকে আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয় জানো ত? লণ্ডনে মিঃ গোখেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়; আমরা একযোগে কাজ করি। গোখেল পুনার প্লেগের ঘটনার পরেই ফিরে আসেন, আমিও চলে আসি। ওকাকুরা এসেছিলেন একেবারে আমার আশ্রমেই আমার সঙ্গে দেখা করতে।

রাসবিহারী বললেন,—তবে ত জাপানের পুরুষসিংহকে তুমি দেখেই ছিলে। জানো কেশোরাম, ভারী মজার একটা গল্প শুনেছিলাম কলকাতায়। স্বামী বিবেকানন্দকে ত উনি জাপানে নিয়ে আসবার জন্য গিয়েছিলেন? অক্রুর যেমন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যেতে এসেছিস; এ-ও ঠিক তেমনি আর কী! স্বামীজী তাই ঠাট্টা করে ওকাকুরাকে বলতেন, অক্রুর খুড়ো। ওকাকুরা আর অক্রুর, দুটো কাছাকাছি শব্দও বটে। শেষ পর্যন্ত 'অক্রুর' মুছে গিয়ে শুধু খুড়োতে দাঁড়িয়েছিল। ধীরা মাতা, জয়া বা নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, খুড়ো কী বললে? ওঁরা প্রথম প্রথম রহস্যটা ধরতে পারতো না, ওরা ভালো মানুষের মতো উত্তর দিতো,

কুরো বললে, ইত্যাদি। ওদের মুখে 'খুড়ো' উচ্চারণ সহজে হয় না, ওরা 'কুরো' কে ওকাকুরার সংক্ষিপ্ত নাম বলেই ধরে নিয়েছিল।

রাসবিহারীর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ফেললো। রাসবিহারী হাসি থামিয়ে বললেন, ওকাকুরা কম কাজ করেন নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছেন, ঠাকুরবাড়ির ত কথাই নেই, ক্রীক রো-র রাজা সুবোধ মল্লিকের কাকা হেম মল্লিকের সঙ্গেও ওঁর এমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল যে, জাপানে ফেরবার সময় হেমবাবুর ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আমি তার খোঁজ করেছিলাম, সে অনেক কাল হলো দেশে ফিরে গেছে! ওকাকুরার জন্য জাপানের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান তখনকার দিনে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।

রাসবিহারীর কথা শুনতে শুনতে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে অবনী বলে ওঠে,—ওকাকুরাকে আমি দেখিনি বটে, কিন্তু আমার বন্ধু লাডলিমোহন মিত্রর কাছ থেকে তাঁর কথা খুব শুনতাম।

—কে, কেমিস্ট লাডলি?—রাসবিহারীর মুখখানা স্নেহে কোমল হয়ে আসে, বললেন,—সে-ও অনুশীলনের সভ্য ছিল। বোধ হয় সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে ওকাকুরাকে দেখে থাকবে।

অবনীকেও মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত মনে হয়, বলে ওঠে,—লাডলি আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে কতবার এসেছে। ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ছিল অনুশীলনের অফিস, ওখান থেকে সুকিয়া স্ট্রীট আর কত দূর? খুব জোরে জোরে হাঁটতো লাডলি, হেঁটে ওঁর সঙ্গে পারতুম না। যেন ঝড়ের বেগে এসে পড়তো আমাদের বাড়ি। যাদুগোপালবাবুর ব্যবস্থায় নরেন ভট্টাচার্য্য চলে গেল বাটাভিয়ায়, সেটা এপ্রিল মাস আর তার পরেই উত্তর ভারতে থাকাকালীন যতীনদার নির্দেশ পেয়ে আমি জাপান চলে আসি, লাডলি আমাকে sea off করতে এসেছিল বোম্বে পর্যন্ত। বম্বে থেকে আমি জাহাজে উঠি। কলম্বো হয়ে বার্মা। ঘুর পথে আসার দরুণ বোসদার পরে এসে এখানে পৌঁছই।

লালাজী বললেন,—তুমি বোধ হয় যাদুগোপাল মুখার্জীর কথা বললে ?

—হ্যাঁ। আর যতীনদা হচ্ছেন,—যতীন মুখার্জী, টাইগার যতীন।

রাসবিহারী, যিনি এতক্ষণ হালকা সুরে কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ যেন কিসের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

লালাজী বললেন,—যাদুগোপালবাবুর কথা শুনেছি। তাঁর এক দাদা ক্ষীরোদগোপালকে বার্মায় কাজ করতে পাঠানো হয়, না ? আমি মান্দালয় জেল থেকে খালাস পাবার পরেই বোধহয় পাঠানো হয়, তাই না ?

অবনী বললে,—না-না—আপনাদের সুরাট কংগ্রেসের পরে তাঁকে পাঠানো হয় ১৯০৮ সালে। রেঙ্গুনেই প্রথম বাসা নিয়ে আমাদের কাজ করতেন তিনি, তখন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেইসময় ভোলানাথ অর্থাৎ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কেও শ্যামদেশে পাঠানো হয়েছিল। ভোলানাথের সাংকেতিক চিঠি আসতো প্রথমে ক্ষীরোদগোপালের কাছে, যেখান থেকে তিনি আবার পাঠিয়ে দিতেন কলকাতায় যাদুবাবুর কাছে। জানেন লালাজী, শ্যামদেশে ভোলানাথ ভালোই কাজ করছিল। রীতিমত একটি বিপ্লবী কেন্দ্র আমাদের গড়ে উঠেছিল শ্যামে। ওখানকার এক বাঙালী উকিল কুমুদ মুখোপাধ্যায় আর পাঞ্জাবী অমর সিং ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাজের ভার নেন।

—আর ক্ষীরোদগোপাল ?

অবনী বললে,—ক্ষীরোদবাবু কাজের সুবিধার জন্য বর্মা-সীমান্ত মিকটিলায় সরে যান। যতীন হুই বলে আমাদের আর একজন লোক ছিল তখন রেঙ্গুনে।

রাসবিহারী এই সময় মুখ তুললেন, বললেন,—সত্যেন সেনের নামটা করলে না ? আমি সান ইয়াৎ সেনের কাছ থেকে শুনেছি তাঁর নাম। সাংহাইতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল সত্যেন সেন, গতবছর।

অবনী বললে, শুনেছিলাম। সে ভাঙাপথে বর্মা আর চট্টগ্রাম হয়ে দেশে ফিরেছিল, ভোলানাথ গিয়েছিল জাহাজে। ভোলানাথ পেনাঙে জার্মান যুদ্ধজাহাজ এমডেনের গোলাবর্ষণ দেখতে পেয়েছিল।

এমডেনের উল্লেখে রাসবিহারীর ঠোটের প্রান্তে হাসির রেখা ফুটে উঠলো, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

অবনী বললে,—সুরেন করের কথা মনে পড়ছে? রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের প্রেম-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক? তিনি আমেরিকা হয়ে জার্মানী গিয়ে সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করেন। জার্মানীতে আমাদের বার্লিন কমিটি এই ভাবেই জোরদার হয়ে ওঠে।

রাসবিহারী এইসময় হাতঘড়ি দেখে বলে উঠলেন,—অবনী, সময় হয়ে গেছে।

অবনীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ওভারকোট গায়ে চড়িয়ে আর মাথায় ফেল্ট হ্যাট এঁটে সে বিনাবাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেল।

রাসবিহারী কেশোরামের কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিলেন। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তিনিও শীগ্‌গির বেরুবেন।

লালাজী বললেন,—পি-এন ঠাকুরকে এখন আর চেনা যায় না।

রাসবিহারী মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন,—যথাসময়ে আবার তাঁর দেখা পাওয়া যাবে।

কেশোরাম রাসবিহারীকে বলল, আপনারও চেহারা এলোমেলো, মনে হয়, রাত্রে আপনারও ঘুম হয়নি।

রাসবিহারী এবারও মৃদু হাসলেন—কিছু বললেন না।

লালাজী বললেন,—তোমাদের ম্যাভেরিক জাহাজের ব্যাপারটা কী বলো ত?

রাসবিহারী বললেন,—ওতে করেই ত অস্ত্রশস্ত্র আসবার কথা ছিল। আসলে এটা হচ্ছে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর একখানা পুরানো তৈলবাহী জাহাজ। স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোর এক জ্যাবসে কোং

বলে একটি জার্মান ফার্ম এটি কিনেছিল। ছোট্ট জাহাজ। একজন অফিসার আর ক্রু মিলে এতে লোকও ছিল ২৫ জন মাত্র। তার সঙ্গে ওয়েটার হিসাবে ছিল পাঁচজন পাশা। এরা সবাই কিন্তু ভারতীয়। এদের জোগাড় করেছিল স্যানফ্র্যানসিস্কোর জার্মান কনস্যুলেটের ফন ব্রিঙ্কেন আর গদর পার্টির রামচন্দ্র। হরদয়ালের পর রামচন্দ্রই চালাচ্ছিলেন আমেরিকার গদর পার্টি। এদের সঙ্গে জাহাজে ছিল আবার গদর পার্টির হরি সিং; তার কাছে কয়েক ট্র্যাঙ্ক ভর্তি ছিল গদর পার্টির ছাপানো প্রচার পত্র।

—তারপর!

রাসবিহারী বললেন,—এর ক্যাপ্টেন সুইডেনের অধিবাসী হলেও জার্মান। 'মিলার' এই ছদ্মনাম তাকে দেওয়া হলেও তার আসল নাম—এইচ-সি নেলসেন। সাংহাইতে এর একটা বাসাও আছে। চৌখস ব্যক্তি।

—ধরা পড়লো কী করে?

রাসবিহারীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, একটুক্ষণ থেমে থেকে তিনি বললেন,—ব্যবস্থা অনুযায়ী অর্থাৎ প্ল্যানমাফিক কোনো মালপত্র না নিয়েই ম্যাভেরিক যাত্রা করেছিল ২২এ এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান পেড্রো বন্দর থেকে। এখান থেকে প্রথমে যায় লোয়ার ক্যালি-ফোর্নিয়ার স্যান জোস দেল ক্যাবো বন্দরে। সেখান থেকে রওনা হয়ে জাভার 'অ্যাঙ্কোর'-এ তার পৌঁছানোর কথা। পথে মেক্সিকোর ছ-শো মাইল পশ্চিমে সকোরো দ্বীপে একমাস ধরে বসে থাকে। ক্যাপ্টেন মিলারের ওপর নির্দেশ ছিল এখানে সে অপেক্ষা করবে। অ্যানিলার্সেন বলে অস্ত্র-বোঝাই একটি জাহাজ এখানে আসবে। তার কাছ থেকে অস্ত্রগুলো নিয়ে একটা ট্যাঙ্কে রাইফেলগুলো রেখে তার উপর তেল ভরে নেবে, অন্য ট্যাঙ্কে রাখবে গোলাবারুদ। কিন্তু অ্যানিলার্সেন ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারলো না। ম্যাভেরিক তবু অপেক্ষা করছিল। এমন সময় ইংরেজদের দুটি আর আমেরিকার

একটি যুদ্ধজাহাজ এসে ম্যাভিরিককে ঘিরে ফেলে সার্চ করে। হরি সিং যে তার ট্রাঙ্ক নিয়ে ধরা পড়েনি এই রক্ষে। যাই হোক, ক্যাপ্টেন মিলার হয়ত অ্যানিলার্সনের জন্য আরও অপেক্ষা করতো, যুদ্ধ জাহাজগুলির তাড়া খেয়ে জাহাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ম্যাভেরিক পথে হেলো জনসন দ্বীপ ছুঁয়ে মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ২২শে জুলাই বাটাভিয়ায় পৌঁছেছে। ডাচেরা অন্তরীণ করে রেখেছে জাহাজটাকে।

—তারপর ?

—বাকি খবর আমাদের জানতে হবে, লালাজী।

লালাজী বললেন,—এতো খবরই বা তুমি জানলে কী করে ?

রাসবিহারী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন,—সিঙ্গাপুরের একটা কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। অবশ্য এতো detail তাতে নেই। খবর পাওয়ার অন্যান্য source আমাদের আছে। ভগবান সিং চ্যালাচামুণ্ডা কম জোগাড় করে রেখে যায় নি। আচ্ছা চলি।

আর দেরি না করে ওভারকোট আর হ্যাট-টা টেনে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর লালাজী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—বারবার আমরা হেরে যাচ্ছি কেন কেশোরাম, তবে কি এটা আমাদের সঠিক পথ নয় ?

কেশোরাম কথাটার উত্তর না দিয়ে ম্যাভেরিকের প্রসঙ্গই তুললো। তার মনেও বোধহয় এতক্ষণ ম্যাভেরিক ঝড় তুলেছিল। সে মৃদু গলায় বললে,—বোসদাকে বাইরে থেকে ঠিকমত বোঝার উপায় নেই। ভিতরে তুমুল ঝড় চলছে, বাইরে হাসিখুসি ভাব,—ঠাট্টা-তামাশা। ওঁর কাছ থেকেই কথায় কথায় বুঝেছিলাম, এই ম্যাভেরিক জাহাজের ব্যাপার নিয়ে কী ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন উনি। বারবার ওঁদের নেতা বাঘা যতীনের কথা বলতেন। বলতেন, যতীন অপেক্ষা করে আছে। আরেকদিন বললেন,—আমার রওনা হবার আগেই নরেন ভট্টাচার্য বাটাভিয়া যাত্রা করে। তার ছদ্মনাম—হেনরি মার্টিন। তারই বা কী খবর ?

লালাজী বললেন—কিন্তু আমরা কি এখন চুপ করে বসে থাকবো কেশোরাম?

কেশোরাম বললে,—লালাজী, ওঁদের কিন্তু সেইরকমই নির্দেশ। এখন দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকাই বোধহয় ভালো। তাতেই ওদের উপকার করা হবে!

লালাজী চুপ করে রইলেন।

কেশোরাম বললো,—আমি যা খবর রাখি, শুনবেন?

—বলো?

কেশোরাম বলতে লাগলো,—খবর এসেছিল জার্মানরা করাচীতে জাহাজ পাঠাবে। আসলে এ-একটা চক্র। বার্লিন ভারতীয় কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী জার্মাণ সরকার কর্তৃপক্ষ আমেরিকার কন্সাল জেনারেলকে নির্দেশ পাঠাবে, সেই নির্দেশ আসবে সাংহাই-এ। সাংহাইয়ের কন্সালই ফার ইস্টের কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত। বোসজীর কাছে শুনেছি, সাংহাইয়ের এই কন্সালের নির্দেশে বাটাভিয়ার কন্সাল মার্টিনকে কাজকর্মের ব্যাপারে ওখানকার নাম-করা ব্যবসায়ী থিওডোর হেলফ্রিশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মার্টিন অর্থাৎ নরেনবাবু বাটাভিয়ায় এসে হেলফ্রিশকে ঐ জাহাজ বাংলার অভিমুখে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে দেশে ফিরে যান। ব্যবস্থা ছিল জাহাজ সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে ভিড়বে এবং অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে অস্ত্রের এক অংশ যাবে বালেশ্বরের কাপ্তিপদায়, এক অংশ কলকাতায়, আর এক অংশ যাবে পূর্ববঙ্গের হাতিয়ায়। হাতিয়া থেকে এইসব অস্ত্রশস্ত্র পূর্ববঙ্গের নানান জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। যতীনবাবুর আরও কী কী প্ল্যান ছিল বোসজী জানেন।

লালাজী উঠে দাঁড়ালেন, চুপচাপ পায়চারী করতে লাগলেন, যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ। পায়চারী করতে করতে একসময় থমকে দাঁড়ালেন, বললেন,—ওরা কি এক সঙ্গে কোথাও গেছে মনে হয়?

কেশোরাম মাথা নেড়ে বললো—বিপ্লবীদের তা নীতি নয়। দু-জন নিশ্চয়ই দু-দিকে গেছে।

—কখন আসবে কে জানে!

কিন্তু মাসখানেক দেখতে দেখতে কেটে গেল তারপর। ওদের দেখা নেই। না এলেন রাসবিহারী, না অবনী। দুজনেই খুব উদ্বিগ্ন, এমন সময় কিমুরার পাঠানো একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে হেরম্ব গুপ্ত এসে হাজির। ম্যানিলায় আটকে ছিলেন তিনি। বছর চল্লিশেক বয়স তখন, কিন্তু চলনে-বলনে একেবারে যুবক। বললেন,—ভাই ভগবান সিং-এর কাছ থেকে আপনাদের সবার খবরই শুনেছিলাম।

—কোথায় ভগবান সিং?

হেরম্ব মুচকি হাসলেন, বললেন,—বিপ্লবী কি গন্তব্যস্থানের কথা বলে? তবে আভাষে বুঝলাম, জাভা-টাভার দিকেই যাবে।

লালাজী বললেন,—তোমার খবর কী?

—আমার খবর আর কী?—হেরম্ব বললে,—তোমার নির্দেশে চলে এলাম। এদিককার কাজ করতে হবে। কিন্তু দুঃসংবাদ হচ্ছে, অ্যানি লার্সেন অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করেছিল স্যান দিয়াগো বন্দরে। কিন্তু ঠিক মতো সকেরো দ্বীপে পৌঁছতে না পারায় ম্যাভেরিকের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। অ্যানি লার্সেন হনলুলু ছুঁয়ে জাভার দিকেই এগিয়ে ছিল ম্যাভেরিকের খোঁজে। ডাচ সরকার সার্চ করে কিছুই পায়নি। অর্থাৎ ওপর-ওপর সার্চ করে ছেড়ে দিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে আসল খবর টের পায়নি।

—তারপর?

হেরম্ব বললেন,—জাহাজ ফিরে আসে, প্যাসিফিকে এধারে-ওধারে ম্যাভেরিকের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়ে জুনের শেষে আমেরিকার হকিয়াম বন্দরে নোঙর করে। এখানেই ঘটে গেল বিপদ। জাহাজ তল্লাসী ক'রে আমেরিকা সরকার অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে গেছে। আমেরিকার জার্মান

কন্সাল এগুলিকে জার্মান সম্পত্তি বলে আদালতে দাবি করেছিল; আদালত সে-দাবি মেনে নেয় নি। বরং এর মধ্যে ইণ্ডিয়ান প্লটের গন্ধ পাচ্ছে।

লালাজী অবশ্য কেশোরামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, হেরম্ব গুপ্তকে। তাই তার সামনে এসব গোপন খবর আলোচনা করতে হেরম্বের আর দ্বিধা ছিল না।

লালাজী বললেন,—ম্যানিলাতে কিছু কাজ করলে?

গুপ্ত বললেন,—একটু করেছি। আমেরিকা প্রবাসী দুজন জার্মান ম্যানিলা থেকে রওনা হবে 'হেনরী এস' বলে একটি জাহাজ নিয়ে। এই জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র তুলতে হবে। অনেক টাকা দরকার অস্ত্র কিনতে। দেখা যাক ভগবান সিং কী করে। সে টাকার ব্যবস্থা করার ভার নিয়েছে।

—আমেরিকার খবর কী?

হেরম্ব বললে,—আমেরিকায় বার্লিন কমিটির যে শাখা ছিল, তাতে আমার বদলে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে নেওয়া হয়েছে। সেইজন্য তোমার ডাক পেয়েই চলে এলাম। খোদ জার্মানীতে যেতে পারলে সুবিধা হতো। বার্লিন কমিটির মুখোমুখি হতাম।

এ-কথায় কোনো মন্তব্য করলেন না লালাজী।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে এক সন্ধ্যায় অবনী এসে হাজির। চোখমুখ বসে গেছে, চেহারাও বিপর্যস্ত। হেরম্বকে দেখে থমকে থেমে গিয়েছিল। লালাজী পরিচয় করিয়ে দেবার পর মুখ খুললো। বললে,—বোসদা এসেছে?

—না।

অবনী চোখ তুলে তাকালো, বললে,—তাহলে কি বাঘের মুখে গেল নাকি? সাংহাই?

—তুমি খবর জানো না?

—না।

পরে, অবনীর কাছ থেকে যা খবর পাওয়া গেল, তা হলো এই যে, মার্টিন বাটাভিয়ায় এসেছিলেন। এসে কলকাতায় হ্যারি এ্যাণ্ড সন্সকে সাংকেতিক টেলিগ্রাম পঠিয়েছিলেন, বিজনেস হোপফুল। এই হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স হচ্ছে বিপ্লবীদের পরিচালিত একটি ঝুটো প্রতিষ্ঠান। মার্টিনেরই বন্ধু হরিকুমার চক্রবর্তী এটির দেখাশোনা করতেন বেশির ভাগ। ওরা টাকা পাঠাতে লেখে মার্টিনকে। মার্টিন হেলফ্রিশের কাছ থেকে নিয়ে টাকা পাঠিয়েও দেন কিছু। কিছু পরে পাঠানো হবে এই আশ্বাস নিয়ে এবং অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে মার্টিন দেশে ফিরে যায় জুনের মাঝামাঝি। প্লটটাও ছিল দারুণ, বাঘাযতীন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় ত? বাংলায় গোরাসৈন্য বেশি নেই। যা ছিল, তাদের পরাস্ত করতে বিপ্লবীদের বেগ পেতে হবে না। শুধু চাই অস্ত্র। একটু শুধু ভয় ছিল মারমারি বাঁধলে ইংরেজরা বাংলার বাইরে থেকে সৈন্য আনতে পারে। এজন্য বাঘাযতীন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে বালেশ্বরে। এর ভার নেন স্বয়ং বাঘাযতীন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ব্যবস্থা করতে চক্রধরপুরে পাঠিয়ে দেন তিনি ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে। সতীশ চক্রবর্তীর ওপর ভার দেওয়া হয় অজয়ের ওপর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের সেতুটা উড়িয়ে দেবার জন্য। অস্ত্র নেবার জন্য হাতিয়ায় পাঠিয়ে দেন তিনি নরেন চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তীকে। আর কলকাতার ভার ছিল মার্টিন, অর্থাৎ নরেন ভট্টাচার্য এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ওপরে। এঁরা প্রথমে সদলবলে কলকাতার কাছাকাছি অস্ত্রাগারগুলি লুঠ করবে, পরে দখল করে বসবে কলকাতার শহর। ব্যাঙ্কক থেকে কুমুদ মুখার্জী এসে খবর দিয়েছিল, ওখানকার জার্মান কন্সাল একটি জাহাজে পাঁচ হাজার রাইফেল ও গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে। কিন্তু এসব খবর ইংরেজরা টের পেয়ে গেছে।

অবনী এসব সংবাদ দেবার পর বললে,—সাতই অগষ্ট কলকাতায়

হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স সার্চ করা হয়। এই ঠিকানায় হেলফ্রিশ কয়েক কিস্তিতে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট্ পাঠিয়েছিল। এই টাকার শেষ :২হাজার টাকা ইংরেজ গভর্নমেণ্ট হাতিয়ে নিয়েছিল। শুধু কি তাই? ভোলানাথকে যতীনবাবু পাঠিয়েছিলেন বোম্বাই অঞ্চলে। সেখান থেকে হেলফ্রিশকে জাভার ঠিকানায় ভোলানাথ যে টেলিগ্রামে সাবধান করে দিয়েছিল, তা-ও টের পেয়ে গেছে পুলিশ।

—তারপর?

অবনী একটু দম নিয়ে বললে,—নরেন ভট্টাচার্য আবার বাটাভিয়া রওনা হয়ে গেছেন। কিন্তু তার থেকেও বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের শাখা ছিল বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম। পুলিস সেখানেও গন্ধে গন্ধে গিয়ে হাজির হয়েছে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের ঘটনা। এখানেই থাকবার কথা যতীনবাবু ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর।

—কী করে টের পেলো পুলিস?

অবনী বললে,—তা জানি না।

কয়েকটা দিন আরও উদ্বিগ্নতার মধ্যে কেটে গেল। অবনী তার নিজের ডেরা ছেড়ে দিয়ে উঠলো গিয়ে ছাত্র সেজে ছাত্রদের এক হোষ্টেলে। রাসবিহারীর জন্য কয়েকদিন উৎকণ্ঠায় কাটানোর পর অবশেষে ১৩ই সেপ্টেম্বর অবনী এসে থমথমে মুখে খবর দিলো,—বোসদা এসেছেন। এখানে নয়, পি-এন-ঠাকুরের ডেরায় আসুন। আমি বরং হেরম্ববাবুকে আগেভাগে নিয়ে যাচ্ছি। দল বেঁধে যাওয়াটা ঠিক নয়। কেশোরামজী, তুমি লালাজীকে নিয়ে এসো।

কিন্তু রাসবিহারীর ডেরায় এসে কী দেখলেন ওঁরা? ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত একটি মানুষ, চুপসে-যাওয়া চেহারা, ফায়ার প্লেসের লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। হাতে সিঙ্গাপুরের একটি খবরের কাগজ। লালাজীকে দেখে স্বাগতও জানালেন না কিছু না,

—শুধু গম্ভীরস্বরে লালাজী, আওয়ার গ্রেট কম্যাণ্ডার ডায়েড এ গ্লোরিয়াস ডেথ্।

—মানে।

রাসবিহারী অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—১০ই সেপ্টেম্বর আমাদের মহান অধিনায়ক বাঘাযতীন এক গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছেন।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি শ্রীসঞ্জয়, যতীন মুখোপাধ্যায়ের কথা খুব বেশি জানতাম বলে গর্ব করতে পারি না। কোন্ পার্কে তাঁর যেন একটা মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন-সংগ্রাম-কাহিনী, আমরা এ-যুগের ছেলে, আমাদের কাছে পৌঁছেই বা দেওয়া হয়েছে কতটুকু? ছোট বয়স থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলির কথা মনে মনে একবার ভেবে নিলাম, কিন্তু কোথাও যতীন মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী বিবৃত ছিল, এমন প্রসঙ্গ স্মরণে এলো না। হয়তো বা তাঁর সম্পর্কে আলাদা কোন বইটই কেউ লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু সে-বইয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করবার কোন ব্যবস্থা কোথাও ছিল কী?

আমি যখন চকিতের জন্য এই সব কথা মনে মনে পর্যালোচনা করছিলাম, তখন শেফালীও দেখি স্তব্ধ হয়ে গেছে। শেষ কথাগুলো পড়বার সময় তার গলা কেঁপে উঠেছিল এটা টের পেয়েছিলাম, হয়ত চোখেও জল এসেছিল। মুখখানা নিচু করে হয়ত নিজেকে সামলে নিচ্ছিল সে। ডাক্তারও চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছিল না,

জানালার বাইরে যে-টুকু আকাশ দেখা যায়, সেখানে অস্তগামী সূর্যের আভা সাদা মেঘের কিনারে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, এখুনি সন্ধ্যা হবে; একটি দুটি ক'রে তারা ফুটে উঠবে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সলিল ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, —আমার আর বসা হলো না, এখন না উঠলে আর উপায় নেই।

শেফালী মুখ তুললো, চোখের পল্লব থেকে অশ্রুর স্পর্শ তখনও বিলীন হয়নি; আস্তে, ঈষৎ কাঁপা গলায় সে বললে,—আর একটু শুনবেন না?

ডাক্তার বিষণ্ণ চোখে তাকালেন, বললেন,—উপায় নেই। দেখি যদি, কাল একসময় আসতে পারি। দাদুর সঙ্গে দেখা করে যাই। তুমি কিন্তু থেমো না শেফালী, লিখে যাও। বলে, ধীর পায়ে দাদুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শেফালী চকিতের জন্য আমার চোখের দিকে তাকালো, বললে,—আপনি শুনবেন তো?

—নিশ্চয়ই।

—দাঁড়ান, চা দিতে বলি।

বলতে বলতে খাতাখানা রেখে সে উঠে দাঁড়ালো।

আমার মনে হচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে শেফালীর রেখে যাওয়া খাতাখানা টেনে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, না-থাক। তার থেকে শেফালীর মুখ থেকেই সব শোনা যাক। ওর পড়ার মধ্য দিয়ে এ-কাহিনীতে যে প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছিল, তার স্পর্শ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো কেন? সত্যি, প্রাণ মন ঢেলে অদ্ভুত আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল শেফালী।

ধীরে ধীরে একের পর এক ঘরের কাজগুলো শেষ হলো। চায়ের পর্ব, আলো জ্বলে ওঠা, ইত্যাদি।—কিন্তু এসবকিছু হয়ে যাবার পর শেফালী যখন আবার খাতাখানা মুখের সামনে মেলে ধরলো তখন মনে হলো, কোথায় যেন একটা ছন্দপতন হয়ে গেছে।

একখানা চেয়ার খালি ডাক্তারবাবু চলে গেছে। একটা আড়াল ছিল, সেটা হঠাৎ যেন অপসারিত। ঘরে আর কেউই নেই, আমি আর সে মুখোমুখি। শেফালী মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করলো,—পড়বো তো?

অল্প একটু হেসে মাথা নেড়ে জানালাম,—হ্যাঁ।

শেফালী খাতাখানা পড়তে গিয়েও হঠাৎ কী মনে করে সেটা নামিয়ে রাখলো, আমার দিকে তাকালো, বললো,—জানেন ত, ওঁর নাম কেন 'বাঘা যতীন' হয়েছিল?

বললাম,—বাঘের মতো সাহসী আর দুর্জয় ছিলেন বলে? না কি, ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে পরাক্রমশালী বীরের মতো লড়াই করেছিলেন বলে, নাম হয়েছিল বাঘা যতীন?

শেফালী বললে,—এভাবে ব্যাখ্যা করলেও অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না, তবে ওঁর এই নামের পিছনে ছোট্ট একটা ইতিহাসও আছে। আমি কোথায় পড়েছিলাম মনে করতে পারছি না। বলিষ্ঠ মানুষ। গ্রামে বাঘের উৎপাত হয়েছিল বলে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলেন বাঘ শিকারে। সঙ্গীদের একজনের কাছে ছিল বন্দুক, আর ওঁর নিজের কাছে ছিল একখানা ছোরা। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বাঘের দেখা পাওয়ামাত্রই ওঁর সেই বন্দুকধারী সঙ্গীটি অস্ত্রের ব্যবহার করে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ বন্দুক তোলার জন্য তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। বাঘ দৌড় দিয়ে সামনে যতীনবাবুকে পেয়ে তাঁরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে বাঘটিকে মেরে ফেলেছিলেন বলেই গ্রামের লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল—বাঘা যতীন। অবশ্য কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ওঁকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল বাঘের সেই মারাত্মক স্পর্শ সারাবার জন্য। শোনা যায়, যে ডাক্তারটি তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, বাঘের চামড়াটা তাঁকেই উপহার দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

এই পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ চুপ করেছিলো শেফালি। হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে তার চমক ভাঙলো। আমি তারই দিকে অপলক তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে একটু যেন লজ্জিত হলো। সে ভাবটা কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—এবার পড়ি ?

—পড়ুন।

শেফালি শুরু করলো,—এর পরের অবস্থটা সহজেই অনুমান করা যায়। ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে আলোর শিখা, আর ওঁরা কজন বসে আছেন চুপচাপ! বহুক্ষণ ধরে কেউ কোন কথাই বলতে পারেন নি। অবশেষে লালাজীর মধ্যেই প্রথম বুঝি ফিরে এলো চেতনা, তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপরে আস্তে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন —কাগজখানা দেখি ?

হাতের খবরের কাগজটা নিঃশব্দে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন রাসবিহারী। লালাজী উলটে পালটে কাগজটা ভালো করে দেখলেন, তারপরে বললেন,—ছোট্ট একটা খবর, বিস্তৃত বিবরণ এতে কিছুই নেই দেখছি।

রাসবিহারী কিছু বললেন না। লালাজী উঠে দাঁড়ালেন, পিছনে হাত রেখে যেমন পায়চারী করা ওঁর স্বভাব, তেমন অল্প একটু পদচারণার পর বললেন,—ডিটেল্‌স্ জানা গেলে ভালো হতো।

সবাই মুখ তুলে তাকালেন। রাসবিহারী এতক্ষণে কথা বললেন। বললেন,—জানতেই হবে। এই ভাবে বসন্তকে হারিয়েছি, পিংলেকে হারিয়েছি, আর এখন, সেনাপতি নিজেই চলে গেলেন।

লালাজী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—তবু চলতে হবে। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের কথা মনে আছে ত ? একে একে চলে গেলে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, ভীম, তবু উনি থামেন নি, এগিয়ে চলেছেন। ভারতের বিধাতাপুরুষ ত পথ চলার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন, কী বলো ?

কথাগুলো [illegible], কিন্তু এমন [illegible] ভাবে উচ্চারণ করেছিলেন লালাজী, কে [illegible]। [illegible] এক [illegible] হয়েছিল [illegible] এই [illegible] ঘটনা প্রসঙ্গে পরে আমাদের কেশোরামজী বলেছিলেন, লালাজীর কথাতে আবার যেন মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল। বোসজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন যে যার পথে রওনা হলাম, তখন মনে হচ্ছিল, আমরা নিজেরাই যেন যুধিষ্ঠিরের মতো মহাপ্রস্থানের পথে পা ফেলে চলেছি, পিছন ফিরে আর কিছু দেখবার অবসর নেই।

কেশোরামজী সেদিনের কথায় আরও বলেছিলেন,—ডেরায় ফিরে লালাজী স্তব্ধ হয়েছিলেন বহুক্ষণ। যন্ত্রচালিতের মতো আমরা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেললাম, শোওয়ার সময় হলো, লালাজীর চোখে তবু ঘুম নেই। একসময় হঠাৎ তিনি মুখ খুললেন, বললেন,—দেখো কেশোরাম, আজকে হঠাৎ যার কথা বেশি করে মনে পড়ছে, তিনি আমার মা। আমার জন্ম মাতুলালয়ে জানো ত? ফিরোজপুর জেলার ধুড়িকে বলে এক অজ পাড়া-গাঁয়ে একটি ক্ষুদ্র মাটির কুটিরে আমার জন্ম। আমার মা গুলাপ দেবীর আমিই প্রথম সন্তান। আমার বাবা মুন্সী রাধাকিষণ ছিলেন লুধিয়ানা জেলার জাগরাও বলে ছোট্ট একটি শহরের লোক। যুধিষ্ঠিরের এই কাহিনী আমি প্রথম শুনি ছোট বেলায় আমার মার কাছ থেকে। আমার মা-ই আমার জীবনের প্রথম শিক্ষাদাত্রী। আচ্ছা কেশোরাম, যতীনবাবুর মা বেঁচে আছেন?

অত্যন্ত অতর্কিত এই প্রশ্নে কেশোরামজী উত্তর দিতে পারেন না। কতটুকু-ই বা তিনি জানতেন যতীনবাবু সম্পর্কে, যে তিনি উত্তর দেবেন?

লালাজী বললেন,—বাঙালী বিপ্লবীদের সব থেকে বড়ো জিনিস, তাদের চরিত্রবল। ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, ফাঁসীর দিন ফাঁসী কাঠে চড়বার আগে মানুষটির দেখা গেল ওজন বেড়ে গেছে—এ-রকম

ঘটনা আর কোথায়, কোন দেশে ঘটেছে? কেবল বাঙালী চরিত্রই এটা পারে, আর কেউ নয়।

আমার মনে আছে, কেশোরামজী যখন কথাটা আমাকে বলেছিলেন, তখন তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আমাকে বলেছিলেন,—বাঙালী বীর বিপ্লবীদের প্রতি লালাজীর শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। বলতেন এঁদের সাহস আর দেশপ্রেমের তুলনা হয় না এবং এই প্রসঙ্গেরই সূত্র ধরে যতীনবাবুর কথা আবার উঠে পড়েছিল। লালাজী অধৈর্য হয়ে বার বার একই কথা বলতে লাগলেন,—তাঁর মতো মানুষ কীভাবে মৃত্যুবরণ করলেন জানতে বড়ো কৌতূহল হচ্ছে।—

কেশোরামজী পরে আমাকে বলেছিলেন,—আমি পরদিনই যাই বোসজীর ডেরায়। পাশের ঘরে দাস বলে যে-ছেলেটি থাকতো, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—মিঃ টেগোর কোথায়, জানো?

সে বললে,—ভোরেই বেরিয়ে গেছেন।

দাসের তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে দুটি চোখে সামান্য ভ্রূকুটি। আমি একজন অচেনা, এর বেশি সে কিছু জানতো না। কিন্তু তার চোখে সংশয়ের ছায়া দেখেই বুঝলাম, আমাদের অন্য-কিছু বলে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। কথাটা চকিতের জন্য মনের মধ্যে ঢেউ খেলেই আবার মিলিয়ে গিয়েছিল। নইলে, সেদিন যদি সেখানে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আরও একটু কথাবার্তা বলে তার খোঁজখবর নিতাম, তাহলে পরবর্তী মাস দুই কালের মধ্যে যে আকস্মিক বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, তা থেকে হয়তো বাঁচা যেতো।

এই 'দাস' উপাধিধারী মানুষটির কথা পরে আসবে। [illegible] জেনেছিলাম, ছেলেটি বাঙালী নাম নিয়ে আত্মপরিচয় দিলেও আসলে সে ঠিক বাঙালী নয়, আসামবাসী। [illegible] ইচ্ছে করে কোন কুকীর্তি করেছিল [illegible] অসতর্ক উক্তি থেকেই পরবর্তী বিপদের সূত্রপাত হয়েছিল বলে কেশোরামজীর ধারণা। [illegible]

না, তার ঐ অসতর্ক কথাবার্তা থেকে কোন সত্যিকারের বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু পরের কথা পরে। ঐ ঘটনার পর আরও দশ দিন কেটে যায়, কিন্তু না পাওয়া গেল রাসবিহারীর সন্ধান, না পাওয়া গেল অবনীর সন্ধান। হেরম্ব লালাজী আর কেশোরাম,—এই তিনজন ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠেন ওঁদের খবরের জন্য, কিন্তু কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দিন দশেক কেটে যাবার পর এক সন্ধ্যায় অবনী এসে উপস্থিত। ।বপর্যস্ত, শ্রান্ত চেহারা। আসন গ্রহণ করবার পর লালাজী প্রশ্ন করলেন—কোথায় ছিলে তোমরা ?

অবনী একটু দম নিয়ে বললেন—আমি ছিলাম নানান্ জায়গায়। বোসদা বোধ হয় যথারীতি সাংহাইতে। বাঘের মুখে।

—বারে বারে যাচ্ছেনই বা কেন উনি ওখানে ?

অবনী অল্প একটু হাসলো, বলল,—হ্যাঁ, এবারেও ন্যারো এসকেপ। ৪২ নম্বর ইয়াংশিপু রোডের ঠিকানা আর বোধহয় সেফ নয়। সাংহাইতে নেলসেন বলে এক জার্মান থাকতেন ঐ ঠিকানায়। তবে বোসদা সাংহাইতেই যে বসে ছিলেন এমন মনে হয় না, জাভার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন কিনা কে জানে!

—উনি এখন কোথায় ?

অবনী বললে—বলা মুস্কিল। তবে টোকিওতে এখনো এসে পৌছাননি, তা বলতে পারি। যতীনদা চলে যাবার পর উনি যেন আরও মরীয়া হয়ে উঠেছেন। বাটাভিয়ায় দেশ থেকে আরও একজন বিপ্লবী এসেছেন বলে শুনেছি। হয়ত তারই সঙ্গে বোসদার যোগাযোগ হয়েছে, কে বলতে পারে!

বলতে বলতে আবার একটু থামলো অবনী। ততক্ষণে কফি আর বিস্কুট এসে গেছে। সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে অবনী বললে —ম্যাভেরিকের প্ল্যানটা বানচাল হয়ে গেলেও বোসদা চেষ্টা করছেন আরও একটি জাহাজ যাতে পাঠানো যায় ডাচ্‌দের সাহায্যে। এই

জাহাজ পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ করে সেলুলার জেল থেকে বন্দীদের মুক্ত করে আনবে।

—বলো কী!

অবনী বললে,—বিরাট প্ল্যানের এ একটা আংশিক সূচী মাত্র।

লালাজী প্রশ্ন করলেন,—যতীনবাবু সম্পর্কে আরও কিছু খবর জানতে পারলে?

অবনী বললে,—না। বোসদা এলে ডিটেল্‌স্ পাবেন আশা করি। লেট আস ওয়েট।

এর পরে কেটে গেল আরও পনেরো দিন। বোসজী এসে হাজির ওদের আস্তানায়, রাত তখন গভীর হয়েছে। গায়ে লম্বা ওভারকোট হাতে দস্তানা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি,—রাসবিহারী প্রবেশ করলেন। প্রথমেই বললেন,– অবনী, তোমার হোস্টেলেই আগে গিয়েছিলাম। তুমি নেই দেখে অনুমানে বুঝলাম, লালাজীদের কাছেই তুমি এসেছো হয়ত।

অবনী বললে,—নিজের আস্তানায় গিয়েছিলেন?

—না,—রাসবিহারী বললেন,—সোজা ইয়োকোহামা থেকে আসছি। ট্যাক্সি অবশ্যি ছেড়েছি অনেক দূরে। বুঝতেই ত পারছো কারণটা কী? সতর্ক থাকা ভালো, কী বলো?

লালাজী বললেন,—যতীনবাবু সম্পর্কে ডিটেল্‌স্ কিছু পেলে?

রাসবিহারী উপস্থিত সবার মুখেব দিকে একে একে তাকালেন, তারপর বললেন,—তা পেয়েছি।

বলে, একটু থেমে হাতের দস্তানা খুললেন। ওভারকোটটা আগেই টাঙিয়ে দিয়েছিলেন হ্যাঙারে। তারপর, একটু সুস্থ হয়ে বলতে শুরু করলেন,—ম্যাভেরিকের বৃত্তান্ত ত শুনেছো লালাজী। ঐ ঘটনার পরে, কলকাতায় বসে যতীন খবর পেলো, শ্যাম থেকে ওখানকার জার্মান কন্‌সাল একটি বোটে পাঁচ হাজার রাইফেল পাঠাচ্ছে। এই খবর নিয়ে যে গিয়েছিল যতীনের কাছে, সে হচ্ছে

ব্যাঙ্কের উকিল কুমুদ মুখার্জীর। শুধু রাইফেল নয়, সঙ্গে বেশ কিছু টাকা আসবারও কথা ছিল। যতীনরা ধরে নিয়েছিল যে ঐ জাহাজের ব্যবস্থাটা হয়েছে ম্যাভেরিকের পরিবর্তে। সে উৎসাহিত হয়ে কুমুদ মুখার্জীকে নির্দেশ দেয়, সে যেন বাটাভিয়া হয়ে ব্যাঙ্ককে ফিরে যায় এবং হেলফ্রিশকে খবর পাঠায়, আগেকার ব্যবস্থা যেন বদলানো না হয়। অস্ত্রবোঝাই এই জাহাজটি যেন হাতিয়া ও বালেশ্বরে মাল খালাস করে, কিম্বা পশ্চিমঘাট উপকূলে কারোয়ারের দক্ষিণে গোকর্নিতে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেয়।

রাসবিহারী এখানে একটু থামেন, তারপর বলতে থাকেন,—কিন্তু যে-ভাবেই হোক এই খবরটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের কথা জানা আছে। বালেশ্বরে তার শাখা ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়ামেও পুলিস হানা দেয়, এখবরও বোধ করি তোমাদের জানা। এখানে যতীন অবশ্য তখন ছিল না, দলবল নিয়ে সে থাকতো আরও দূরে, কাপ্তিপদায়। বালেশ্বরে থাকতো শৈলেশ্বর বসু আর গোপাল বলে একটা ছেলে।

রাসবিহারী কথা বলছিলেন, অবনী তারই মধ্য উঠে গিয়ে ওঁর জন্য কফির ব্যবস্থা করে এসেছিল। কফি আর খানকতক বিস্কুট এটা এইসময় এসে পড়ায় প্লেটের দিকে তাকিয়ে রাসবিহারী মৃদু একটু হাসলেন। অবনী বললে,—খিদে পেয়েছে নিশ্চয়? হোটেলে যাবো? দেখবো কিছু আছে কিনা?

রাসবিহারী ওর চোখের দিকে তাকালেন, বললেন,—হোটেলে এখন কিছু পাবে না—আমি জাহাজেই মোটামুটি খেয়ে নিয়েছি—ব্যস্ত হয়ো না—যা দিয়েছো তাই-ই যথেষ্ট।

বলে কফিতে একটু চুমুক দিয়ে আবার বলতে লাগলেন,—যতীন, যাদুগোপালবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে নরেন ভট্টাচার্যকে আবার বাটাভিয়া পাঠায়, সেকথা অবনী তোমাদের বোধ হয় আগেই বলেছে। এর কিছু পরে ভূপতি মজুমদারকেও পাঠানো হয়। ভূপতির সঙ্গে

আমার ছিল, কত্রী চক্রবর্তী। ত্রৈলোক্যের মনে আছে ত, অবনী? রাজনারায়ণ মিত্রের বৈঠকে একটি মেয়ে থাকতো?

অবনী বললে,—তা মনে আছে। এক গেরামেরই ত লোক ছিলাম।

রাসবিহারী অবনীর দিকে তাকালেন। কোমল কণ্ঠে বললেন, —আচ্ছা, অবনী, যতীনের সঙ্গে তোমার প্রথম কোথায় দেখা হয় বলো ত?

অবনী একটু চিন্তা করে বললে,—আমি টেক্সটাইল টেকনোলজি শেখবার জন্য তখন থাকতাম আমেদাবাদে, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতাম। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মামলায় প্রায় ছ'মাস জেল খেটে যেদিন মুক্তি পান বিপিনচন্দ্র পাল, সেদিন আমি কলকাতায়। ঐ সময়ে হাওড়া স্টেশনে দুটি দলে ঝগড়া লেগে তা মারাত্মক মারামারিতে পরিণত হচ্ছিল দেখে আমি তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ঝগড়া থেকে তাদের নিরস্ত করার ফলে যতীনদার দলের প্রভাস দেব আমাকে কাছে ডেকে নেন। তিনিই নিয়ে যান আমাকে যতীনদার কাছে। যতীনদার সঙ্গে সে-ই আমার প্রথম আলাপ।

অবনীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লালাজীর দিকে তাকালেন রাসবিহারী, বললেন,—এই অবনীও কম যায় না। ওর কীর্তিকাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয় লালাজী। জাপানে ত ওর এই দ্বিতীয় পদার্পণ।

লালাজী একটু অবাক হয়ে বললেন,—তাই নাকি? আমাকে ত আগে বলো নি, অবনী?

অবনী একটু লজ্জিত হয়ে বললে,—সে কিছু নয়।

রাসবিহারী বললেন,—সখারাম গণেশ দেউস্করের ও ছিল প্রতিবেশী এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র। সেই সূত্রেই ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে বিপিনচন্দ্র পালের, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের। এঁদের পরামর্শেই ও দেশী শিল্পের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। তাই না, অবনী?

অবনীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে,—হ্যাঁ ; সখাদা আর আমার মা। এদের প্রেরণাই আমাকে টেক্সটাইল টেক্‌নোলজি শিক্ষায় মনযোগী হতে উৎসাহিত করে।

লালাজী বললেন—জাপানে প্রথমে এসেছিলে কবে, কেমন করে ?

অবনি উত্তর দেয়—যতীনদার নির্দেশে আমি আমেদাবাদে পড়তে গিয়ে ওখানকার বাঙালী ছাত্রদের নিয়ে 'ইউনাইটেড বেঙ্গল হোম' গড়ে তুলেছিলাম। এই সংস্থার চেষ্টাতেই লর্ড মিণ্টোর গাড়িতে বোমা পড়েছিল, সে হচ্ছে ১৯০৯ সালের কথা। পুলিস খুব খুঁজেছিল, আমাদের কাউকে ধরতে পারেনি। আণ্ডেজ ফ্রেজারকে মারতে গিয়েছিল জিতেন রায়চৌধুরী, আমিও সঙ্গী ছিলাম তার। অনুশীলন সমিতির কাজে প্রায়ই আমি আমেদাবাদ থেকে কলকাতা যেতাম। এ-ঘটনা তখনকার। জিতেনকে পুলিস ধরে ফেলে, আমাকে পারেনি। আমি আমেদাবাদের শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় এসে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে সহকারী উইভিং মাস্টার হই। সুরেন করকে আপনাদের মনে আছে ? তিনি তখন জাপানে। আমেরিকা যাবার পথে জাপানে অবস্থান করছিলেন। যতীনদা স্থির করলেন আমাকে জাপানে পাঠাবেন সুরেনদার কাছে। সায়েন্টিফিক অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন যশোদাবাবু। তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন একটি বৃত্তির। এই বৃত্তিটি নিয়ে আমি জাপানে এসেছিলাম সেবার। সুরেনদা এখানে তখন ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলছিলেন। আমাকে সবার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন আমেরিকায়। আমি তাঁরই পথ অনুসরণ করে এখানে তৈরি করেছিলাম 'ট্রাভেলার্স অ্যাসোসিয়েশন'। কিন্তু তার অস্তিত্ব এখন আর নেই বললেই হয়।

অবনী থামতেই রাসবিহারী বললেন,—মহম্মদ বরকতুল্লা তখন জাপানে—টোকিওতে অধ্যাপনা করছিলেন। তারই চেষ্টায় অবনী চলে যায় জার্মানীতে। তাই না, অবনী ?

—হ্যাঁ,—অবনী বললে,—১৯১১ সালে—জুলাই মাসে। বার্লিন থেকে যাই লণ্ডনে। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে আসি ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে। বেঙ্গল মিলে কিছুদিন কাজ করার পর শ্রমিক-ধর্মঘট অরগ্যানাইজ করার ফলে চাকরি যায়। তারপরে যাই বৃন্দাবনে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের 'প্রেম মহাবিদ্যালয়'এর সহকারী অধ্যক্ষ হয়ে। কিন্তু এখানেও বনিবনা হলো না। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমাকে তাঁর এক সচিব নিযুক্ত করে স্থানীয় কৃষক-মজুরদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ দিলেন। এই কাজের সূত্রেই হরিদ্বারের কনখলের হাসপাতালে বিপ্লবী শিশির ঘোষকে শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখতে পাই। এখানেই আমার আলাপ হয় এই বোসদার সঙ্গে। তাই না, বোসদা?

রাসবিহারী তাঁর অভ্যাসমতো চোখ বন্ধ ক'রে বোধহয় স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন, মাথা নেড়ে বললেন,—হ্যাঁ।

তারপরে চোখ খুলে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন, বললেন,—শিশিরবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি তখন তোমাকে কলকাতায় পাঠাই। কলকাতায় গিয়ে কি একটা চাকরীও যেন তুমি যোগাড় করলে, তাই না?

অবনী বললে,—হ্যাঁ, মার্টিন কোম্পানীর আমতা লাইট রেলওয়েতে। ১৯১৪ সালের মার্চ মাস। খুব মনে আছে। আর মনে আছে যতীনদার কথা। হেস্টিংস স্ট্রীটের গগন রায়ের বাসায় গোপন পরামর্শ সভা বসে। তাতেই যতীনদা স্থির করেন যে আমাকে আবার জাপানে আসতে হবে এই বোসদারই কাছে। এই-ই-ত আমার দ্বিতীয়বার জাপান আসবার ইতিহাস। উত্তর প্রদেশের বিষ্ণু অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি সেজে জাহাজে উঠেছিলাম। অথচ, বিষ্ণু অ্যাণ্ড কোম্পানী বলে কোনো কোম্পানীর অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। এতও আইডিয়া খেলতো যতীনদার মাথায়!

ব'লে, অবনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মুখখানা নিচু।

রাসবিহারী তাঁর পূর্বকথার জের টেনে বলতে লাগলেন,—যতীনের কথা আজও শেষ হবার নয়। ভূপতি মজুমদারকে পাঠিয়েছিল যতীন, সে-কথা আগেই তোমাদের বলেছি। এই ভূপতি জাহাজেই ধরা পড়ে পেনাং-এর কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে। সেখান থেকে তাকে সিঙ্গাপুরে এনে আটকে রাখা হয়েছে।

—তারপর?

রাসবিহারী বললেন,—তার পরের কথা নয়, একটু আগের কথা বলা দরকার। যতীনের নির্দেশে জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাসে গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতি হয়েছিল। গার্ডেনরীচের ডাকাতিতে নরেন ভট্টাচার্যের ছিল নেতৃত্বের ভূমিকা। কিন্তু সে যাই হোক, এই ডাকাতির সূত্রেই পুলিস তখন ধরপাকড় শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে যতীন পাথুরেঘাটার বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিল। সঙ্গে ছিল চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, রাধাচরণ প্রামাণিক প্রভৃতি। পুলিস হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে। যতীনের পূর্ব পরিচিত নীরদ হালদার হঠাৎ ঐ বাড়িতে ঢুকে 'যতীনদা' 'যতীনদা' বলে ডাকতে ডাকতে সামনে এসে উপস্থিত হয়। কোনো সহকর্মী ওভাবে ডাকবে না, এবং আসল নাম ধরেও সম্বোধন করবে না, এই-ই ছিল তাঁর নির্দেশ। কিন্তু ওভাবে, বিনা কাজে, বিনা নির্দেশে, নীরদ এসে পড়ায় কারুরই বুঝতেই কষ্ট হয়নি যে, পুলিস তাকে চর করে যতীনের খোঁজে এখানে পাঠিয়েছে। যতীন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হুকুম দেয়—শুট হিম।

যতদূর শুনেছি, মাদারীপুরের রাধাচরণ প্রামাণিকই তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করে। এর দিনকয়েক পরে গুলির আঘাতে আহত নীরদ হাসপাতালে মারা যায়। কিন্তু যতীন সঙ্গীদের নিয়ে পাথুরেঘাটার আস্তানা ছেড়ে সরে পড়তে দেরি করেনি। নইলে পুলিস এসে ঠিক ধ'রে ফেলতো। কলকাতা থেকে যতীন এবার বাগনানে, বাগনান স্কুলের হেডমাস্টার অতুল সেনের বাড়িতে

জাহাজ থেকে যারা আসছিলেন। কিন্তু এখানে সুবিধে-মতো অস্ত্রের মাল পাওয়ায় চলে যায় বালেশ্বরে। বালেশ্বর থেকে কাপ্তিপদায়। কলকাতার পুলিস ৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামের সাইকেলের দোকানটি সার্চ করতে আসে। ৬ই সেপ্টেম্বর কাপ্তিপদার বাড়িটিও সার্চ করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কী করে সন্ধান পেলো পুলিস এই বালেশ্বরের ঠিকানার? যা শুনলাম, তা হচ্ছে এই যে, হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের নামে যে ড্রাফ্‌ট হেলফ্রিশের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল, সেই ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকার নোট নিয়ে আসা হয়। হাজার টাকার নোটে নম্বর থাকে, তাই আবার তা বদলে একশ টাকার নোট আনা হয়। একশ টাকার নোটেও যে নম্বর থাকে, সে-কথা এ-কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মীটির মনে হয় নি। কী দারুণ ভুল বলো ত? এই নোটের নম্বর থেকেই মনে হয় হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের সঙ্গে বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের যোগাযোগ ধরে ফেলে। এটা ধরতে না পারলে পুলিসের সাধ্য কি যে যতীনের মতো মহান নেতার কেশ স্পর্শ করে?

রাসবিহারী একটু থেমে আবার শুরু করলেন,—বালেশ্বরের গুরুত্ব কতখানি বুঝতে পারছো ত? প্ল্যান অনুযায়ী ওখানকার রেল সেতুটি উড়িয়ে দেবার ভার নিয়েছিল যতীন নিজে। দ্বিতীয়ত, বালেশ্বরের কাছের সমুদ্রতীরে চণ্ডীপুর বলে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামে ব্রিটিশ সেনাদের একটা আড্ডা ছিল এইজন্য যে, ওখানে তারা কামানের গোলা পরীক্ষা ক'রে দেখতো। প্ল্যান করা হয়েছিল, জার্মান জাহাজ এ-অঞ্চলেই আসবে, এবং গোরাদের ঐ ছাউনি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ১৯শে ফেব্রুয়ারির সেই সর্বাত্মক প্ল্যানের সবটাই বানচাল হয়ে গেল।

রাসবিহারী আবার একটু থামলেন, তারপর বললেন,—যতদূর খবর পেয়েছি গোয়েন্দা বিভাগের বড়ো কর্তা ডেনহ্যাম নিজে গিয়েছিল

বালেশ্বরে, সঙ্গে ছিল টেগার্ট। এখানে ওরা শৈলেশ্বর বোসকে গ্রেপ্তার করে। তার সাঙ্গপাঙ্গরাও অবশ্য ধরপাকড় থেকে রেহাই পায়নি। তাদের ওপর হামলা করেও পুলিশ একটা কথা বার করতে পারেনি। ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়ামে একটা কাগজের টুকরো পায় তারা, তাতে কাপ্তিপদার নাম ছিল। ডেনহ্যাম তার দলবল দিয়ে রাতারাতি কাপ্তিপদার ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছোয়। সঙ্গে ছিল বিরাট পুলিস-বাহিনী। এখানে মণি চৌধুরীর কথা একটু বলা দরকার। এই মণি চৌধুরীই যতীনকে কাপ্তিপদায় আশ্রয় দিয়েছিলেন বলা যায়। যতীনরা থাকতো একটি মুদিখানার দোকান ক'রে, সঙ্গে ছিল আশ্রম। যতীন গেরুয়া পরতো, গ্রামবাসীদের আপদে-বিপদে সাহায্য করতো, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতো। ওখানকার লোকে যতীনকে সাধুবাবা বলে ডাকতো। তারা ওর আসল পরিচয় জানবে কী করে? অবশ্য এসব খবর আমি আগেই জানতাম, অবনীও বোধহয় জানতে। তাই না?

অবনী মাথা নেড়ে সায় দিলো।

রাসবিহারী বসলেন,—যতীনের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতো মনোরঞ্জন সেন আর চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। ওর আরও দু'জন সঙ্গী নীরেন দাশগুপ্ত আর জ্যোতিষ পাল থাকতো আরও বারো মাইল দূরের এক আস্তানায়, তালডিহিতে। ওটাকে যতীন বলতো, সেকেণ্ড ক্যাম্প। এদিকে হয়েছে কী, ডেনহ্যামরা কাপ্তিপদায় গিয়েছিল হাতি চড়ে। হাতির গলায় ঘণ্টা শুনে একটি লোক ছুটে গিয়ে যতীনকে খবর দেয়। কাপ্তিপদা হচ্ছে জঙ্গলে একটা গ্রাম। যতীন লোকটির মুখে খবর পেয়ে একা একা চুপিচুপি দেখতে এলো, ডাকবাংলোতে যারা এসেছে তারা সত্যিই সাহেব কিনা। অদূরে, জঙ্গলে লুকিয়ে সে ঠিকই বুঝতে পারলো, শত্রুপক্ষ এসে উপস্থিত। ফিরে গিয়ে সবাইকে উঠিয়ে তখ্খুনি রওনা। মণিবাবুকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে তারা এগিয়ে গেল তালডিহির দিকে।

আবার এখানে একটু থামলেন রাসবিহারী, সবার মুখের দিকে একবার তাকালেন, বললেন—যতীন ইচ্ছে করলে তখ্‌খুনি পালাতে পারতো। কিন্তু নীরেন আর জ্যোতিষকে সঙ্গে নিতে হবে ত? তাদের ফেলে পালাবার মতো লোক যতীন নয়। পরদিন সকালে ডাকবাংলোয় সাজো-সাজো রব। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের মহকুমা-হাকিম অক্ষয় চাটুজ্যেকে ডেকে পাঠালো ডেনহ্যাম। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন স্থানীয় লোককে পাঠালো আশ্রমের দিকে, সেখানে বাবুরা সত্যি সত্যি আছে কিনা দেখে আসতে। সে এসে জানালো, কেউ নেই, একটা রোগী শুয়ে আছে মাত্র। ডেনহ্যাম মণিবাবুকেও ডেকে পাঠালো। মনিবাবুর উত্তর,—হ্যাঁ, কয়েকজন লোক এসেছিল বটে জঙ্গলে ঠিকেদারী করতে। তবে এখন যে তারা কোথায় তা আমি জানি না।

রাসবিহারী এবার অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—বীরপুরুষরা অক্ষয়বাবুকে সামনে এগিয়ে দিয়ে একে একে আশ্রমে ঢুকেছিলেন বলে খবর পেয়েছি। অর্থাৎ যদি গুলি-টুলি কেউ ছোঁড়ে, ত, সে অপঘাত অক্ষয় চাটুজ্যের ওপর দিয়েই যাক।

কিন্তু আশ্রমে তখন একটি শয্যাশায়ী রোগী ছাড়া কেউ ছিল না। সে স্থানীয় লোক; অসুখ হওয়াতে সাধুবাবার আশ্রমে এসেছিল, তার বেশি সে জানবে কী? হম্বিতম্বি ক'রে তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেল না। খানাতল্লাসী করে যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে একটি সুন্দরবন এলাকার ম্যাপ, আর নাকি যতীনের নিজের হাতে লেখা একখানা খাতা। তাতে খবর পাওয়ার মতো কিছু ছিল না। এছাড়া পেয়েছিল খবরের কাগজের একটা কাটিং। পেনাং-এর Strait Settlement Gazette-এর একটা টুকরো খবর ছিল তাতে। ম্যাভেরিক জাহাজের অবরুদ্ধ হবার খবর। এই খবরের সঙ্গে তিনটি নামও ছিল, ফন বোহেম, তারক দাস এবং—

বলে হেরম্ব গুপ্তের দিকে তাকিয়ে রাসবিহারী বললেন—আপনার

নামী আপনাদের তিনজনেরও নাকি থাকবার কথা ছিল ঐ জাহাজে।

হেরম্ব গুপ্ত অবাক হয়ে বললেন,—দারুণ ব্যাপার ত! কথা ত ছিল তা-ই। আমরা প্ল্যান বদল করলাম। তারক দাস আমেরিকাতেই রয়ে গেল, আমি এলাম ম্যানিলায়। কিন্তু খবরটা ওরা জানলো কী করে?

রাসবিহারী আবার একটু হাসলেন, বললেন,—আমরাও কি ওদের খবর কম জানি? ওদের গোয়েন্দা আছে আমাদের নেই? যতীনের এতো খবর আমি বলতে পারছি কোন্ সোর্স থেকে? আমাদেরও লোক ছড়িয়ে আছে নানা দিকে।

হেরম্ব মাথা নেড়ে বললেন,—সে ত বটেই। কিন্তু আপনি আরও বলুন যতীনবাবুর কথা।

—মহাভারতের কথা অমৃত সমান,—রাসবিহারী বললেন,—যতীনের কথা শত মুখে বলেও শেষ করা যাবে না। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিতে বসে রাতের অন্ধকারে গোপন মিটিং যেদিন হয়, সেদিন যতীন মুখ তুলে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—ফোর্ট উইলিয়াম দখল করতে হবে। পারবে? আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—আদেশ যখন দিয়েছো তখন পারতেই হবে। কিন্তু থাক সে কথা। নানান কার্যকারণে সে প্ল্যান বানচাল হয়ে যায়। হ্যাঁ যা বলছিলাম। পেনাং-কাগজের ঐ কাটিং যতীনের কাছে কাপ্তিপদায় পাঠিয়েছিল যাদুগোপাল মুখুজ্যে।

রাসবিহারী আবার একটু থামলেন, তারপরে বললেন,—যাই হোক সাহেবরা মণিবাবুর বাড়ির সামনে আর আশ্রমের দোরগোড়ায় পুলিস পাহারা রেখে বালেশ্বরে ফিরে গেল। মণিবাবু নিশ্চিন্ত হ'ল, যতীনরা ইতিমধ্যে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু তা কি হয়? রাত তখন গভীর, বাড়ির পিছনের ঘরের জানালায় মৃদু করাঘাত আর যতীনের চাপা গলার স্বর—মণিদা মণিদা!

মণিবাবু নাকি বাড়ির পিছনদিককার ঐ ঘরখানাতেই শুয়ে থাকতেন। গলার স্বরে তিনি আঁৎকে উঠলেন,—সর্বনাশ, সামনে যে পুলিশ পাহারা রয়েছে!

যতীন বেশি সময় নিলো না, সব খবর শুনলো আর মনিবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা আর একখানা বন্দুক নিয়ে সরে পড়লো। মণিবাবু বলে দিলেন,—তোমরা মেঘাবনি পাহাড়ের কোল ধরে ধরে চলে যাও, কোনো বিপদ হবে না।

শুনলাম, যতীন এ-কথায় নাকি রুখে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল,—পালাবো না—এবার সম্মুখ রণ। এবং সত্যিই তাই। যতীন সদলবলে চললো বালেশ্বরের দিকে। শত্রুবাহিনী সৌভাগ্যবশত তখন বালেশ্বরের মূল রাস্তা ছেড়ে অন্য দিকে সরে গেছে। তোমরা ভেবে দেখ লালাজী, যেখানে ওদের পাঁচজনের উল্টোদিকে হাঁটা দেওয়া দরকার ছিল, সেখানে ওরা বালেশ্বর স্টেশনে এসে টিকিট কেটে প্লাটফর্মে অপেক্ষামান ট্রেনটিতে উঠে বসলো। বসলো বটে, কিন্তু যতীন নিশ্চেষ্ট ছিল না। তার মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। মনে হলো, এত বড় লম্বা ট্রেন, কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা সেই অনুপাতে এতো কম কেন? বোধ হয় পুলিশের লোকে ট্রেনটা ভর্তি হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ইঙ্গিত। ওরা পাঁচজনে ট্রেন থেকে একে একে নেমে পড়লো। স্টেশনের বাইরে এসে টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর এগিয়ে চললো শহর ছেড়ে গ্রামের ধার দিয়ে দিয়ে। এইভাবে একটি গ্রাম পার হয়ে বুড়িবালাম নদীর ধারে পৌঁছয়। সে-গ্রামের নাম ছিল,—দাঁড়াও এক মিনিট।

বলে, রাসবিহারী পকেট থেকে একটি নোটবই বার করলেন, তার থেকে পাতা উল্টে একটা নাম পড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন,—গোবিন্দপুর। তারপর নোটবইখানা যথাস্থানে রেখে আবার শুরু করলেন,—ভাদ্রমাস, নদীর জল তখন কুল-ছাপানো। পার হওয়া সহজ নাকি? কিছুদূরে খালি একটা নৌকো দেখে মাঝিকে

ডাকাডাকি ক'রে তাকে অনেক বলে ক'য়ে নদী পার হতে হলো। এদিকে হয়েছে কী, সাহেবরা গ্রামবাসীদের মধ্যে রটিয়ে দিয়েছে এদিকে জার্মানরা ডাকাত নামিয়ে দিয়েছে, আর এই ডাকাতরা সব বাঙালীবাবু। ওদের ধরিয়ে দিলে দুশো টাকা করে মাথা-পিছু পুরস্কার। সেজন্য এদের পাঁচজনকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে একটি লোক সন্দেহ করে গ্রামে গিয়ে খবর দেয়। আর যাবে কোথায়? ডাকাত এসেছে—ডাকাত এসেছে বলে রব তুলে গ্রামের যত লোক সব এসে হাজির। তাদের দিকে ফাঁকা আওয়াজ ক'রে তাদের তাড়ালেও আবার তারা জড়ো হয়ে এসে ওদের অনুসরণ করতে লাগলো। এইভাবে জঙ্গল ধ'রে ধ'রে তারা আরেকটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়—মাথার ওপর ভাদ্রের সূর্য তখন খাঁ খাঁ করছে। এ গ্রামের দুজন লোক তাদের পথ আগলায়, তাদের জাপটে ধরতে যায়, সাবধান করেও কোন ফল হয়নি। মনোরঞ্জন বাধ্য হয়ে গুলি ছোঁড়ে। একজন মারা গিয়েছিল, আরেকজন আহত হয়েছিল গুরুতর রকম। বাকি লোকগুলো এর ফলে পালালো বটে, কিন্তু দূর থেকে জনকয়েক ওদের ঠিক অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলো; কিছু লোক চলে গেল বালেশ্বর-থানায় খবর দিতে। এর পরে আরেক গ্রামের এক ব্যক্তি স্বয়ং যতীনকে জাপটে ধরেছিল, কিন্তু প্রবল ঘুঁসি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিৎপাত। এই সব ঘটনা পর পর ঘটে যাওয়ায় আর কেউ সাহস করে ওদের ধরতে আসে নি বটে, কিন্তু পিছু নিতেও ছাড়েনি। 'আমরা ডাকাত নই'—এসব বলা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস করানো যায়নি। এই গ্রাম ছাড়াবার একটু পরেই চাষখন্দ গ্রামের কাছে পড়লো আরেকটি নদী। নদীতে ধারে কাছে কোনো নৌকো ছিল না, ওরা পাঁচজনে সাঁতরে নদী পার হয়েছিল। ভেবে দেখ, এভাবে না খেয়ে না দেয়ে দু-দুটো দিন ওরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা নদী পার হয়ে কিছুদূর এগিয়ে প্রকাণ্ড একটা উই-ঢিবির আড়ালে গিয়ে বসে পড়লো। স্থির হলো, আর হাঁটা নয়, এবার সম্মুখ যুদ্ধ।

শত্রুপক্ষও ওদিকে কম তৎপর ছিল না। ওদের নদী সাঁতরে পার হতে দেখে, কিছুদূরে আর একটি লোকও সাঁতরে এপারে আসে। লোকটা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় প'রে থাকলে কী হবে, আসলে ছিল ছদ্মবেশী কোনো পুলিশের লোক। ওদের অলক্ষ্যে কাছেই একটা গাছে চড়ে বসেছিল। সেই যে চণ্ডীপুরের কথা আগে বলেছি, যেখানে গোরাদের একটা ছাউনি ছিল? সেখানকার কর্তাসাহেবটি তার ফৌজ নিয়ে এগিয়ে আসছিল। এই ফৌজের সঙ্গে ছিল সশস্ত্র পুলিশের দল, সঙ্গে বিহার-পুলিসের কর্তাব্যক্তিরা। বুঝে দেখ, মাত্র পাঁচটি লোকের জন্য আয়োজনের বহর কী রাজকীয়! এতো করেও তারা টের পায়নি যতীনদের আসল আশ্রয়টি ঠিক কোথায়! শুনলাম, ঐ বেটা ছদ্মবেশী পুলিসের লোকটা গাছের ওপর থেকে, সরু ডালে জড়ানো কাপড়ের টুকরো নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে জানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং আর কী, যুদ্ধই শুরু হলো। শত্রুপক্ষ গুলি বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। ওরা পাঁচজনে কিন্তু চুপচাপ। যতীন অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতো ঠিক তখ্‌খুনি ফায়ার করবার অর্ডার দেয়নি। শত্রুপক্ষ মনে করলো, ওদের কাছে বুঝি দূর পাল্লার অস্ত্র নেই। তাই তারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগলো। ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে যতীন অর্ডার দিলো,—ফায়ার! তোমরা নিশ্চয় শুনেছো জার্মানদের তৈরি মশার পিস্তল দরকার হলে রাইফেলের মতো ব্যবহার করতে পারা যেতো। শত্রুপক্ষ এটা বুঝতে পারে নি, অতএব তাদের বাহিনী রীতিমত হতাহত হতে লাগলো। ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ে মাঠের আলগুলির আশ্রয় নিয়ে দুমদাম গুলি চালায় আর যতীনরা সময় বুঝে তার প্রত্যুত্তর দেয়। যা শুনলাম তাতে মনে হয়, ঘণ্টা তিনেক ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। যতীনদের টোটা গিয়েছিল ফুরিয়ে। সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল, তাতে ছিল টোটা। কিন্তু গ্রামের পথে পথে দু-দিন ধ'রে ওভাবে চলার সময় ব্যাগটার চাবি যে কখন পকেট থেকে পড়ে গেছে ওরা টের পায় নি। সেই ব্যাগ আর খোলা গেল না,

চামড়া দাঁতে কেটে ছেঁড়া যায় না, এমন শক্ত। ইতিমধ্যে হয়েছে কী, শত্রুবাহিনীর একটি লোক চুপিসাড়ে একটা গাছের ওপর চড়ে বসেছিল। সেখান থেকে গুলি চালালে চিত্তপ্রিয়র মাথায় এসে সোজা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তার দেহ। ওদিকে যতীন নিজেও আহত হয়েছিল। তার একটা হাতের বুড়ো আঙুলে গুলি লেগেছিল। এক হাতে তখনো সে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে টোটা নিঃশেষ, চামড়ার ব্যাগটা কাটা যাচ্ছে না। এমন সময় একটা গুলি এসে লাগলো যতীনের পেটে। জ্যোতিষও ভয়ানক আহত। যতীন,, জ্যোতিষ আর চিত্তপ্রিয়কে নিয়ে যখন মনোরঞ্জন আর নীরেন ব্যস্ত, তখন শত্রুবাহিনী চারদিক থেকে এসে ওদের ঘিরে ফেলে।

রাসবিহারী এখানে একটু থামলেন, মুখখানা তাঁর থমথম করছে। বললেন, কলকাতার একটা ইংরেজী কাগজ হাতে পড়েছিল, লিখেছে, নীরেন আর মনোরঞ্জন হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে! ঝুট—বিলকুল ঝুট! ওরা সেই ছেলে কিনা!

লালাজী প্রশ্ন করলেন,—তারপর ?

রাসবিহারী বললেন,—পরদিন ভোরবেলা হাসপাতালে যতীন মারা যায়। চিত্তপ্রিয় তো আগেই চলে গিয়েছিল। জ্যোতিষ, নীরেন আর মনোরঞ্জনকে পুলিশ ধরে নিয়ে বালেশ্বর জেলে রেখেছে। বিচারের একটা প্রহসন হচ্ছে বৈকি!

হেরম্ব গুপ্ত বললেন,—চিত্তপ্রিয়রা ত কাঁচাবয়সের ছেলে, কী বললেন ?

রাসবিহারী গম্ভীর, থমথমে মুখে বললেন,—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র পাল আর নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ওদের নাম কাগজে উঠেছে বইকি—দেখে এলাম। সিঙ্গাপুরের একটা কাগজে। কাগজটা আনতে পারিনি। বুঝতেই ত পারছো, কারণটা কী ? অকারণে সন্দেহ উদ্রেক করে লাভ নেই, তবে মনের পটে সব খবর এঁকে এনেছি। চিত্ত, মনোরঞ্জন আর নীরেন প্রায় সমবয়সী,

পূর্ববঙ্গের মাদারীপুর স্কুলের যখন ওরা ছাত্র তখন ফরিদপুর কন্সপিরেসি কেসে ওদের ধরেছিল পুলিস। মাস চারেক আটক থাকবার পর প্রমাণাভাবে ওরা মুক্তি পায়। আমি সে-খবর জানতাম, গতবছরের ঘটনা, মাসটা যতদূর মনে পড়ে, এপ্রিল। নীরেন-মনোরঞ্জন ছিল কী সম্পর্কের যেন দুটি ভাই। ভাইও বটে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। মাদারীপুর অঞ্চলে পূর্ণদাসের নেতৃত্বে যে দলটি গড়ে উঠেছিল, নীরেন-মনোরঞ্জন আর চিত্তপ্রিয় ছিল সেই দলের।

বলতে বলতে অবনীর দিকে তাকালেন রাসবিহারী, বললেন,—আচ্ছা অবনী, তুমি বোধহয় সঠিক বলতে পারবে, যতীনের নির্দেশে অতুল ঘোষ আর নরেন ভট্টাচার্য এই বছরেরই ফেব্রুয়ারিতে গার্ডেনরীচে যে ট্যাক্সি-ডাকাতি করে, তাতে চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন আর নীরেন ছিল না?

অবনী উত্তর দিলো,—হ্যাঁ—তা ছিল।

রাসবিহারী বললেন,—ঐটুকু ছেলে ওরা,—কিন্তু যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি, যতীনের যোগ্য লেফটেনাণ্ট। তাই কি মনে হয় না, লালাজী?

লালাজী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—সেইজন্যই দুঃখ হচ্ছে! দেশের সেরা মানুষগুলি যদি এইভাবে চলে যায়, তাহলে আর থাকবে কী—আমাদের?

—আবার আসবে,—রাসবিহারী বললেন,—এদের শক্তি কোথায়, তা ত জানো লালাজী,—গীতা। আত্মা অমর,—বিভিন্ন দেহ পরিগ্রহ করে এই আত্মাই ফিরে ফিরে আসে। এরাও আসবে।

রাত তখন নিশুতি, গভীর। কিন্তু শোবার কথা কারুর মনে নেই, সবাই চুপ-চাপ বসে রয়েছেন। সেই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বলে উঠলেন হেরম্ব গুপ্ত, বললেন,—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? যতীনবাবু কি বিবাহিত ছিলেন?

অবনী উত্তর দিলো, বললে,—হ্যাঁ যতীনদার এক মেয়ে, দুই ছেলে সবাই ছোট।

রাসবিহারী কি যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন,—আচ্ছা অবনী, যতদূর জানতাম, যতীন যখন বালেশ্বরে যায়, তখন চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ছাড়া তার সঙ্গে ছিল নলিনীকান্ত কর। সে গেল কোথায়?

অবনী বললে,—কুষ্টিয়ার নলিনী ত? হ্যাঁ, সে ছিল। কিন্তু কী একটা ব্যাপারে নলিনী চলে আসে কলকাতায়, আর তার বদলে পাঠানো হয় জ্যোতিষ পালকে।

রাসবিহারী মুখ নিচু করলেন, কী যেন ভাবলেন মুহূর্তকাল, তারপরে মুখ তুলে বললেন,—যতীন আমার থেকে বয়সে বড় ছিল, তবু আমাদের মধ্যে 'তুমি'-সম্পর্কই দাঁড়িয়েছিল। যতীনের অন্তিম এজাহার কী ছিল শুনবে? আমার সঙ্গীরা নিরপরাধ। তাদের ওপর যেন কোনো অবিচার করা না হয়। সব কিছুর জন্য দায়ী আমি, তারা নয়। কাগজে লিখেছে নাম সই করবার মতও অবস্থা ছিল না যতীনের, মুখে বলা স্টেটমেণ্ট্ পুলিশে লিখে নিয়েছিল, যতীন দিতে পেরেছিল শুধু টিপসই। আশ্চর্য এই বীরের মৃত্যু! অর্থাৎ এই যতীনকে বাঘে ছুঁয়েছে, সাপে কামড়েছে,—কিন্তু কিছুই তাকে কাবু করতে পারেনি। দেশের তরুণদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করবার জন্য এইভাবে তার বীরের মতো মৃত্যু বরণ করা দরকার ছিল।

রাত তখন গভীরতর হয়ে শেষের দিকে ঢ'লে পড়েছে। চিত্রার্পিতের মতো কয়েকটি মানুষ চুপচাপ বসে আছে। কারও যেন ওঠবার তাড়া নেই, ঘুমোবার প্রয়োজন নেই!

রাসবিহারী একসময় চিন্তার সমুদ্র থেকে হঠাৎ যেন মুখ তুললেন, বললেন,—জানো অবনী, আরও একটা খবর এনেছি। নরেন ভট্টাচার্য আর ফণী চক্রবর্তী গত ১৫ই আগষ্ট বাটাভিয়ার দিকে রওনা হয়ে এসেছিল। ওরা দুজন যে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চেপেছিল, সে খবরও পেয়েছি। বাটাভিয়ায় ওরা এসে পৌঁছেছিল ধরো আগষ্টের শেষাশেষি। নরেনের খবর আর জানা যায়নি, কিন্তু ফণী

চলে আসে সাংহাইতে। তার মানে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে সে বোধ হয় সাংহাইতে নামে। অবশ্য ছদ্মনামে, তার নাম ছিল মিষ্টার পেন। প্রফেসর বিনয় সরকার এখন সাংহাইতে আছেন, জানো ত? তাঁর সঙ্গে একই হোটেলে ছিল ফণী। খবর পেলাম পুলিশ তাকে ধরেছে। ধরে, জাহাজে করে রওনা হয়ে গেছে সিঙ্গাপুরের দিকে।

হেরম্ব গুপ্ত বললেন,—নরেন ভট্টাচার্যের খবর তাহলে--

—জানতে হবে।

ততক্ষণে কাচ-ঢাকা জানলার বাইরে রাত ফরসা হয়ে আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে রাসবিহারী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন, কেশোরামজীর কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিলেন, তারপরে ওভারকোট গায়ে দিয়ে ফেল্ট্ হ্যাটটা মাথায় চড়ালেন।

লালাজী অবাক হয়ে দেখছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—চললে নাকি?

—হ্যাঁ—রাসবিহারী বললেন,—অবনীও যাচ্ছে। অবনী, বি রেডি।

অবনী প্রস্তুত হতে লাগলো। এবং সেই অবসরে রাসবিহারী বললেন,—লালাজী, কিছুদিন হয়ত আবার দেখা হবে না।

—বাইরে কোথাও যাচ্ছো নাকি?

রাসবিহারী বললে,—হ্যাঁ, তা যাচ্ছি বটে। ভালো কথা, ভগবান সিং এসেছে যে!

—কই! কোথায়?

রাসবিহারী বলেন,— কোবেতে। আমরা আপাতত তার কাছেই যাচ্ছি। সেখান থেকে জাহাজে চড়বো।

—আবার সাংহাই?

রাসবিহারী হাসলেন, বললেন,—হ্যাঁ লালাজী, তোমার অনুমান ঠিক। ম্যাভেরিক আটকে আছে জাভায়। ম্যাভেরিকের প্ল্যান ভেস্তে গেল। কিন্তু আরেকবার চেষ্টা করতে হবে। দেখা যাক।

রাত ফর্সা হবার আগেই ওঁরা দুজন রওনা হয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, রাসবিহারীবাবুর এবারকার সাংহাই যাত্রা রীতিমত বিপদ-

সঙ্কুল ছিল। নেলসেন বলে যে জার্মান লোকটির ঠিকানায় সাংহাইতে গিয়ে তিনি উঠতেন, সে আর কেউই নয়, ঐ ম্যাভেরিকের ক্যাপ্টেন। নেলসেন ওর আসল নাম, ক্যাপ্টেন রূপে ওর নাম ছিল মিলার। জার্মান হলেও সুইডেনের অধিবাসী। পুলিস আঁচ পেয়েছে বুঝতে পেরে এবার রাসবিহারী নেলসেনের ঠিকানায় উঠলেন না, উঠলেন ভগবান সিং-এর ব্যবস্থা মতো অন্য এক জায়গায়। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জার্মান কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে ওঁরা সাক্ষাৎ করলেন। এরই ফলশ্রুতিতে আবার অস্ত্র-প্রেরণের ব্যবস্থা। সাংহাইতে নেলসেনের আরও একটা ঠিকানা ছিল, —১০৮ নম্বর চাওতুং রোড। এ-বাড়িতে আরও একজন বিপ্লবী বাস করতো, বাঙালী, অবিনাশ রায়। সে-ও এই অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে জড়িত ছিল। স্থির হয়েছিল, অবনী আর জাপান ফিরবে না, সে কলকাতা চলে যাবে। বুড়ী বালাম যুদ্ধের পর কলকাতার বিপ্লবীরা ধরপাকড় এড়াতে অধিকাংশই তখন চন্দননগরে আত্মগোপন করেছিল। একটা নোট বইতে সবকিছু নির্দেশ, যাদের সঙ্গে করতে হবে, তাদের নাম ধাম সব টুকে নিয়েছিল অবনী। অবিনাশ রায় অবনীকে চন্দননগরে গিয়ে মতিলাল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলে। অবিনাশ বলে,—আপনি মতিবাবুকে গিয়ে বলবেন যে, সব ঠিক আছে। এটা বললেই তিনি বুঝতে পারবেন সব। এইসঙ্গে আর একটা কথা। মতিবাবুকে বলবেন আমি যাতে নিরাপদে ভারতে ফিরে যেতে পারি তার কোনো উপায় তিনি যেন করে দেন।

অবনী বলে,—আচ্ছা।

ওদিকে রাসবিহারীর ব্যবস্থানুযায়ী সান ইয়াৎ সেনের দলের অনুগত ও বিশ্বস্ত দুজন চীনাকে ১২৯টি পিস্তল আর প্রচুর গুলি দেওয়া হয়। তক্তার বাণ্ডিলের মধ্যে ওগুলো লুকিয়ে তারা নিয়ে যাবে, কলকাতার শ্রমজীবী-সমবায় ভাণ্ডারের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে শেষ পর্যন্ত অর্পণ করবে।

এই সব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, অবনী ভারতের অভিমুখে যাত্রা করে সাংহাই থেকে, ভগবান সিংও চলে যান অন্যদিকে, রাসবিহারী ফিরে আসেন জাপানে, আর নরেন ভট্টাচার্য হেনরী মার্টিন ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় হেলফ্রিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকেন। মার্টিনের পরামর্শ মতোই অস্ত্রবোঝাই জাহাজ সুন্দরবনের রায়মঙ্গলের দিকে না গিয়ে পূর্ববঙ্গের হাতিয়ায় যাবে সাংহাই থেকে। আরেকটি জাহাজ যাবে বালেশ্বরে। এ-ছাড়া জার্মানদের আর একটি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবে আন্দামানে, আন্দামান থেকে বন্দীদের মুক্ত করে আনবে। ওদিকে কলকাতা থেকে যাদুগোপালবাবুরা একজন বিশ্বস্ত চীনাকে রওনা করে দিয়েছিলেন পেনাং-এ একটি জরুরী চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য। আগেই বলেছিলাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। ভোলানাথ ১৯১১-১২ সালে পেনাং-এ গিয়ে একটি ঘাঁটি গ'ড়ে আসেন। দুজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন এ-সব কাজে নিযুক্ত, একজন স্থানীয় ডাক্তার, অন্যজন ঠিকাদারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

রাসবিহারী টোকিওতে ফিরেছিলেন কয়েকদিনের মধ্যে। লালাজী কেশোরাম আর হেরম্ববাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন ওঁর। রাসবিহারী এবারও নিজের বাসায় সরাসরি না উঠে এখানে চলে এসেছিলেন। দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে আবার 'পি এন ঠাকুর' হয়ে তারপরে গেলেন নিজের আস্তানায়। দাস ছেলেটি পাশের ঘর থেকে উঁকি দিচ্ছিল, কাছে এসে বললে,—মিস্টার টেগোর, অবনীবাবুর খোঁজে একটি লোক এসেছিল। লোক মানে, একটি জাপানী ছাত্র। বহুদিন উনি ক্লাসে যাননি, শুনলাম।

মিঃ টেগোর বললেন,—অবনী বয়ন-শিল্পের ছাত্র, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্যই ত—

বাধা দিয়ে রাসবিহারী বললেন,—প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিতে কোবে-টোবে গেছে হয় ত, আমার সঙ্গে দেখা হয় না কিছুদিন যাবৎ। দেখা হলে বলবে, ভাল করে কাজ শেখা চাই এবং তাড়াতাড়ি। দেশে

ফিরে গিয়ে নিজেদের শিল্প নিজেদেরই গড়তে হবে। কবিগুরুর এতে ভয়ানক উৎসাহ। তুমি যেন কী শিখছো?

দাস বললে,—আমিও ত তা-ই শিখছি। তবে, আমি আছি অনেক পিছিয়ে। ওঁর মতো—

রাসবিহারী ওর পিঠ চাপড়ে বললেন,—তা হোক—ওকেও যা বললাম, তোমাকেও তাই বলছি। বি কুইক।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেলেন, দাসের ঠোঁটের কোণে জেগে উঠলো সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

দিন কতক পি-এন-ঠাকুর আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার নিয়ে এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করলেন। কিন্তু যতই ঘোরাঘুরি করুন, মন পড়ে আছে আসল খবরের ওপর। অবনীর কী হলো? এতদিনে তার সিঙ্গাপুরে অন্তত পৌঁছে যাবার কথা। সব ঠিকঠাক আছে কিনা, সে বিষয়ে খবর পাঠাবার কথা ছিল তার।

সংবাদ অবশ্য এলো ভগবান সিং-এর লোক মারফৎ, কিন্তু সেটা শুভ খবর নয়। রাসবিহারী লালাজীদের ওখানে গিয়ে খবরা-খবর সব দিতেন। সেদিন সন্ধ্যার পর পৌঁছে থমথমে গলায় যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো,—আমরা আবার ফেল করলাম। সাংহাইতেই চীনা দুজন ধরা পড়ে গেছে। কলকাতা থেকে পাঠানো চীনাটিও ধৃত হয়েছে সিঙ্গাপুরে। এবং সব থেকে বড়ো খবর, পেনাং-এ অবনী নিজেই ধরা পড়ে গেছে। তার পকেটের অমন জরুরী নোট-বইটিও সে সরাতে পারেনি, এমন অতর্কিতে জাহাজের মধ্যে তাকে ধরা হয়। এ-ছাড়া আরও একজন ধরা পড়ে।

—কে?

রাসবিহারী বললেন,—আমাদের কাশীর একজন বিশিষ্ট কর্মী—শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

বলেই ম্লান একটু হেসে হেরম্ববাবুর দিকে তাকালেন রাসবিহারী, বললেন,—শিবপ্রসাদের 'গুপ্ত' উপাধিটাই কাল হলো এক্ষেত্রে। ওরা

খুঁজছিল আসলে আপনাকে অর্থাৎ হেরম্ব গুপ্তকে। শিবপ্রসাদও আসছিল আমেরিকা থেকে। তাকে অবশ্য ধরা হয় সাংহাইতে। সাংহাই থেকে তাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে আরেকটি নাম পেয়েছি,—সুকুমার চ্যাটার্জী। একে চিনি না, বা, এর নাম জানি না। আপনি জানেন হেরম্ববাবু?

হেরম্ব বললেন,—হ্যাঁ—আমেরিকায় থাকতো—ছাত্র ছিল। তাকে আমরাই দলে টানি। ম্যানিলায় পাঠানো হয়েছিল তাকে। আমার আসার আগেই। কিন্তু আমি ম্যানিলায় এসে তার আর খোঁজ পাইনি, সে চলে গিয়েছিল।

রাসবিহারী গম্ভীর গলায় বললেন,—সে ধরা পড়েছে ব্যাঙ্ককে।

লালাজী মনোযোগ দিয়েই সব শুনছিলেন, বললেন,—এর পর কী হবে? আমি অবনীর কথাই বেশী করে ভাবছি। তার নোট-বই থেকে পুলিশ অনেক কিছু জানতে পারবে।

রাসবিহারী বললেন,—আমি অবশ্য সবাইকে সতর্ক করে দেবার জন্য লোক পাঠিয়েছি। তাছাড়া, ভগবান সিং সব জানে, সে-ও সংকেতে সাবধান-লিপি সব জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। বলবো কী, ভগবান সিং-এরও দলের একটি লোক—যোধ সিং—ধরা পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

হেরম্ব বললেন,—আর, সেই অস্ত্র-বাহী জাহাজগুলো?

রাসবিহারী বললেন.—নরেন ভট্চাযের খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। তার ব্যবস্থা মতো তিনটি জাহাজের যাবার কথা। সাংহাই-এর জার্মান কন্সালও সে প্রস্তাব আমাদের সামনেই মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, একটি জাহাজই গেছে আন্দামানের দিকে। কিন্তু, এ খবরও চাপা থাকেনি দেখা যাচ্ছে। ইংরেজদের ক্রুজার 'ক্রমওয়েল' আন্দামানের কাছেই জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এ খবর অবশ্য আজকের কাগজেই ছিল। ছোট্ট একটি খবর।

কেশোরাম চুপচাপ শুনতেন, কথা বলতেন কম। এবার মুখ

খুললেন। বললেন,—আমি দেখেছিলাম। ক্রমওয়েল একটি জার্মান-প্লটকে বানচাল করেছে, এমনিভাবে খবরটা ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ,—রাসবিহারী বললেন,—আমার মনে হয়, এই জাহাজের অবস্থা দেখেই আর দুটি জাহাজ আর ওরা পাঠায় নি।

লালাজী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন,—সবই গেল। এই দেখ না, অবনী ছিল আমাদের সঙ্গে,আজ সেও নেই।

রাসবিহারী বললেন,—দেখা যাক না—কী মামলা ওরা সাজায় অবনীর বিরুদ্ধে! সিঙ্গাপুরেই রাখে, না, দেশে নিয়ে যায়,—লেট আস সি।

লালাজী বললেন,—বোসজী, অবনীকে দেখে হঠাৎ মনে হয়, সে যেন তোমার আপন ভাই। চেহারায়ও কোথায় যেন একটা মিল আছে। তাই না, গুপ্ত?

হেরম্ব বললেন,—বিশেষ করে পিছন থেকে হঠাৎ দেখলে তা-ই মনে হয় বটে।

রাসবিহারী কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন, তারপরে বললেন,—নাঃ! হতোদ্যম হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। জাপানে আমাদের আসল কাজ এবার পুরোদমে শুরু করতে হবে। অবনী বলতে গেলে এখানকার পুরোনো লোক, সে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে গেছে,—ডাঃ সুমেই ওহ্‌কাওয়া। আমি তার সঙ্গে কালই যোগাযোগ করছি।

হেরম্ব বললেন,—হ্যাঁ—একটা কিছু করা দরকার।

লালাজীও অনুরূপ মত প্রকাশ করলেন। ডাঃ শিওজাওয়া এর মধ্যে বার কতক লালাজীর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। কিমুরাও এসেছেন কয়েকবার। লালাজী এদের কথা তুলেই বললেন,—জাপানে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা দরকার। আমার মনে হয়, এরই জন্য আমাদের এখন এক-যোগে কাজ করতে হবে।

কেশোরাম উৎসুক মন নিয়ে সব-কিছু শুনতো আগ্রহভরে। তার দিকে তাকিয়ে লালাজী বললেন,—এখানকার কাগজেও কবির খবর মাঝে মাঝে বেরোয়। দিন কয়েক আগে কী একটা খবর তুমি আমাকে কাগজে দেখাচ্ছিলে, কেশোরাম?

কেশোরাম বললে,—কবির দুই ইংরেজ সহচর—সি·এফ এণ্ড্রুজ আর পিয়ার্সন ফিজি দ্বীপপুঞ্জে এসেছেন ওখানকার ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য। তাঁদের সঙ্গে কাগজের স্থানীয় প্রতিনিধির একটি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। তাতে এণ্ড্রুজ বলেছেন—কবিও বাইরে বেরুবার জন্য ব্যাকুল। আমরা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি শুনে তিনি কলকাতায় আমাকে লিখেছিলেন,—"I can hardly control my wings!"

লালাজী বললেন,—হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু বেরিয়ে পড়ছেন না কেন?

রাসবিহারী বললেন,—নানান্ কমিট্‌মেণ্টস্। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখবেন!

কেশোরাম মুখ তুললেন, বললেন,—ঐ কাগজেই পড়লাম, কবি গিয়েছিলেন কাশ্মীরে, সেখান থেকে ফিরে এসেছেন কলকাতায়।

রাসবিহারী বললেন,—এবার হয়তো আসার তোড়জোড় করবেন। কিন্তু তার আগে আমাদের কাজ আরম্ভ করে দেওয়া চাই।

বলতে বলতে হেরম্ব গুপ্তের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন,—যাঁকে আমরা কাছে পেয়েছি হেরম্ববাবু, তাঁকে কেন্দ্র করেই কাজ শুরু করা যাক। আমি লালাজীর কথাই বলছি। আপনি এখানকার আজাবু-অঞ্চলটি ঘুরে দেখেছেন হেরম্ববাবু?

হেরম্ববাবু বললেন,—হ্যাঁ, ওখানকার 'কোগাও-চো'-তে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান ক্লাব'-এ গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে এসেছি।

—গুড—রাসবিহারী বললেন,—এখানকার ভারতীয়দের নিয়ে

একটা সভা করলে কেমন হয়? তাতে আমরা বাছা বাছা জাপানীদের ডাকবো। তাতে লালাজী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা সকলকে বুঝিয়ে বলবেন। কী বলো, লালাজী?

লালাজী বললেন,—আমি রাজী আছি।

হেরম্ব বললেন—ওঁর কোন বিপদ হবে না ত?

লালাজী বললেন,—আমি যে এখানে, অর্থাৎ এই টোকিওতে আছি, এ-কথা জাপানের উর্দ্ধমহলে অনেকেই যে জানেন, সে খবর শিওজাওয়ার কাছ থেকেই শুনেছি। কাগজওয়ালারাও জানে, কিন্তু প্রভাবশালীদের চেষ্টায় তারা মুখ বুজে আছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা না পেছনে লাগে, এই হচ্ছে তাদের ভয়।

হেরম্ব বললেন,—সভা হলে ত কাগজগুলো আর চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না!

লালাজী বললেন,—তা হোক—আর আঁধারে মুখ গুঁজে থাকতে ভালো লাগছে না। কিছু একটা করা দরকার।

হেরম্ব বললেন,—তাছাড়া, রাসবিহারীবাবুর কথাটাও ধরুন। টের পেলে মুসকিল। ব্রিটিশ ওঁকে ফাঁসিতে তৎক্ষণাৎ লট্‌কে দেবে।

রাসবিহারী হাসলেন, বললেন,—রাসবিহারীকে পাবে কোথায়? আমি ত পি-এন-ঠাকুর। আমার আসল পরিচয় এখানে দু-একজন বন্ধু ছাড়া কেউ জানে না। বরং ভয় আপনার হেরম্ববাবু, আপনাকে জেলে ঢোকাবার জন্য ওরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। শিবপ্রসাদকে আপনি ভেবে ওরা কী কাণ্ডটাই না করলো, ভেবে দেখুন।

হেরম্ব বললে,—আমার খবরই বা কটা লোকে জানে এখানে? ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টরা জেনেছে অবশ্য। এখন ভাবছি, ওদের কাছে নিজের নামটা না বললেই পারতাম। কিন্তু তা হোক—নো রিস্‌ক্—নো গেন—সভার ব্যবস্থা করা যাক।

সত্যি কথা বলতে কী, সভার আয়োজনে হেরম্ব নিজেই

মেতেছিলেন বেশি। মানুষটি কাজের। একটা-কিছু কাজ না পেলে স্থির থাকতে পারেন না। অবশ্য, একার চেষ্টায় এ-সব হয় না, বিশেষ করে বিদেশে। রাসবিহারী নিজেও কম সচেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনি কাজ করছিলেন সতর্কভাবে—অন্তরালে থেকে। তাঁর 'পি-এন-ঠাকুর'-এর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দিলে চলে না। এ-ছাড়া, লালাজীর চেষ্টাও ছিল। চেষ্টা ছিল কেশোরামের। কেশোরামও এক টেক্‌নিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্র পরিচয়ে ঘোরাঘুরি করতো, সে ছিল সন্দেহের অতীত। এ-ব্যাপারে আরেকটি মানুষ খুব সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি ডাঃ সুমেই ওহ্‌কাওয়া। তাঁর কাছ থেকে রাসবিহারী জানতে পারলেন, আগামী ২৭এ নভেম্বর সম্রাট তাইশো-র সিংহাসনারোহনের উৎসব পালিত হচ্ছে। জাতীয় উৎসবের মতো। রাসবিহারী বললেন,—এইদিনেই আসুন আমরা সভাটা করি। স্থানীয় প্রথামতো এটা হোক একটা ভোজসভা সম্রাটের সম্মানে, প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে।

ঠিক আছে।

রাসবিহারী বললেন,—এটা একটা ভালো জেস্‌চার হবে না? সম্রাটকে সম্মান দেখানোও হবে, নিজেদের কথাও বলা হবে।

—ঠিক কথা।

দ্রুত সভার আয়োজন চলতে লাগলো। সভাপতিত্ব করবেন লাজপৎ রায়। উপস্থিত থাকবেন জাপানের প্রধান রাজনীতিকেরা, বুদ্ধিজীবীরা, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও সম্পাদকেরা। পি-এন-ঠাকুর বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু কিছু বলবেন না।

এসব চলছে একদিকে, অন্যদিকে রাসবিহারীর মন উন্মুখ হয়ে আছে অবনীর খবরের জন্য। কোনো এক সুত্রে, লোক মারফৎ খবর পৌছল বটে। অবনীর বিচার এখনো হয়নি, তাকে সিঙ্গাপুরে ফোর্ট ক্যানিংয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে। স্বীকারোক্তি আদায় করার

জন্য অমানুষিক অত্যাচার চলেছে তাঁর ওপর। কিন্তু কোন কথা আদায় করতে পারেনি ইংরেজ। অবনীর ছিল একটি মাত্রই উত্তর, "আমার কিছুই বলবার নেই।" ঐ ফোর্ট ক্যানিংয়ে বন্দী ছিলেন শিবপ্রসাদ গুপ্তও। কিন্তু তাঁকে মুক্ত করার সবিশেষ চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে তাঁর বন্ধু সাংহাইয়ের অধ্যাপক বিনয় সরকার ত খুবই সক্রিয় রয়েছেন। জানা যায়, ব্রিটিশ কন্সাল জেনারেল শিবপ্রসাদ সম্পর্কে বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। বিনয়বাবু নাকি বলেছিলেন,—কাকে ধরতে কাকে ধরেছেন আপনারা? নাম করা কাপড়ের কারবারী, ব্রিটিশ গুড্‌সের বিগ্‌ এজেন্ট। মতের দিক থেকে মডারেট, দারুন ব্রিটিশ-ভক্ত। ইনি কাশীর এক মস্ত বড়ো জমিদারও বটেন, রাজা মতিচাঁদের ভাইপো।

লালাজীকে এক ফাঁকে খবরগুলো জানালেন রাসবিহারী, বললেন,—শিবপ্রসাদকে ওরা আটকে রাখতে পারবে না। কী প্রমাণ করবে ওর বিরুদ্ধে? কি চার্জ আনবে? এ তো শুধু সন্দেহবশে ধরা বই ত নয়।

লালাজী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

রাসবিহারী বললেন,—সেটা সত্যি। তবে জায়গাটা সিঙ্গাপুর। বিনা চার্জে কিছু ওকে করলে একটা আন্তর্জাতিক গোলমাল দেখা দিতে পারে। কাগজওয়ালারা কি ছেড়ে দেবে? তারা একটু-আধটু খবর পেলেই ফলাও করে ছাপে। এ সবের নিউজ-ভ্যালু কি কম?

কেশোরাম এবং হেরম্বও তখন ওঁদের কাছে ছিলেন। হেরম্ব সবটা শুনে বললেন,—বিনয় সরকারের বিবৃতিও ব্রিটিশ এককথায় উড়িয়ে দিতে পারে না!

রাসবিহারী বললেন,—পারে না-ই ত! তার ওপরে আরেকটা কাণ্ড হয়েছে। শিবপ্রসাদের নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল দেশ থেকে। [illegible]রেছিলেন জানেন? স্বয়ং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

ব্রিটিশ কন্সাল আবার বিনয় সরকারকে ডেকে পাঠায়, বলে,—এই মালব্য আবার কে? বিনয়বাবু অবাক হয়ে বলেন,—মালব্যজীকে চেনো না! ব্রিটিশ-ফ্রেণ্ড, মডারেট-ইণ্ডিয়ার গভর্নর জেনারেলের পরিষদের মাননীয় সদস্য—গভর্নর জেনারেলের বিশেষ বন্ধু!

—তারপর?

রাসবিহারী বললেন,—এরপর কী আর আটকে রাখা যায়? এতদিনে শিবপ্রসাদ ছাড়া পেয়ে গেছে বোধহয়।

—আর, অবনী?

—ভূপতি, অবনী, ফণী,—ওদের কোনো খবর এখন পাইনি। বলে, রাসবিহারী লালাজীর মুখের দিকে তাকালেন, মন্তব্য করলেন,—শোনা গেল, ধরা পড়ার সময় শিবপ্রসাদের কাছে নাকি প্রচুর অর্থ ছিল। এরও ব্যাখ্যা বিনয় সরকার কন্সাল-জেনারেলকে দিয়েছিলেন,—এঁরা রক্ষণশীল ধরণের বিত্তশালী মানুষ,—ব্যাঙ্কে বড়ো একটা কিছু রাখেন না—সোনা-টোনা কিনে কাছে রাখাই এঁদের অভ্যাস—কয়েক লক্ষ টাকা যদি পেয়ে থাকো এর কাছ থেকে, তাতেও আমি অবাক হবো না। ব্যবসা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ ঘোরা,—টাকাপয়সার দরকার সব সময়ই হতে পারে এঁদের!

যাই হোক, উক্ত ২৭এ নভেম্বর দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো। অবনীদের খবর তখনো কিছু পাননি রাসবিহারী। হেরম্ব প্রচুর পরিশ্রম করে সভার ব্যবস্থা করলেন, কেশোরামও ছিলেন তাঁর সঙ্গে—ভারতীয় ছাত্রদলকে নিয়ে। ইউনো পার্কের সেইকেন হোটেলে এই ভোজসভাটি যথানির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হোটেলের সমস্ত দালানটা জাপানী পতাকা আর ছবিতে চমৎকার করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। উদ্বোধন হয় জাপানের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। সুধীবৃন্দের সেই সভায় সেদিন লালা লাজপৎ রায় ইংরেজীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের দুর্দশা ও জাতীয় অভ্যুত্থান, এবং তার ওপর ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচার—এসব কথা

বলতে বলতে লালাজী নিজেই আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। শ্রোতাদেরও মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় অসাধারণ। প্রত্যেক স্থানীয় বক্তাই ব্রিটিশ-দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন। লালাজীর এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার কোনো অনুলিপি রাখা হয়নি। তবে কেশোরামজী পরে আমাকে বলেছিলেন, এই বক্তৃতার বিষয়বস্তুর কিয়দংশ। লালাজী পরে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' বইতে ভূমিকা স্বরূপ লিখেছিলেন, যদিও ঐ বক্তৃতার সেই প্রমত্ত আবেগ লেখার মধ্যে ধরা পড়েনি। পরদিন-কাগজে কাগজে ফলাও ক'রে এই সভা ও লালাজীর বক্তৃতার রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। জাপান থেকে প্রকাশিত আমেরিকানদের কাগজ 'জাপান অ্যাডভার্টাইজার'-এ কাগজের সম্পাদক হিউ বিয়াস স্বয়ং একটি সম্পাদকীয় লিখে লালাজীকে বক্তা হিসাবে ইংরেজ বাগ্মীপ্রবর লয়েড জর্জের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

এটা যে দারুণ সাফল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের ভাগ্যাকাশে নেমে এলো কালো ছায়া। ব্রিটিশ দূতাবাস চুপ করে বসেছিল না, সভার খবর সবই তাদের কানে গিয়েছিল। ইংরেজের সঙ্গে জাপান তখন ছিল মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। এবং বিশেষ ক'রে তাদের বৈদেশিক দপ্তরের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের চাপ ছিল প্রচণ্ডরকম। বস্তুতঃ, ঐ সভা চলাকালেই দণ্ডাজ্ঞা জাপানের প্রধানমন্ত্রী চাপে পড়ে সই করেছেন। সেই আদেশের বলেই রাসবিহারীকে সভার মধ্যে গিয়ে ধরা যেতো। কিন্তু হাজার হোক সম্রাটের সম্মানে আয়োজিত এই সভা, এখানে গিয়ে ব্যাঘাত জন্মানো ঠিক নয়। পরদিন রাসবিহারীর আস্তানায় গিয়ে পুলিশ হানা দেয়। একদল তাঁকে, আর অন্যদল হেরম্ব গুপ্তকে ধ'রে সোজা থানায় নিয়ে যায়। এখানে বলা হয়, এই নোটিস পাবার পাঁচদিনের মধ্যেই তাঁদের দুজনকে জাপান ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাসবিহারী সবিস্ময়ে দেখলেন, নোটিসের ওপরে রয়েছে হেরম্ববাবুর সঙ্গে তাঁর নিজের আসল নাম।

ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলেন, তাঁর আসল নামটি এভাবে

কে প্রকাশ করে দিলো? কাগজে পর্যন্ত অভ্যাগতদের নামের তালিকায় তাঁর নাম ছিল,—পি-এন-ঠাকুর। তাহলে, কে করলো এই বিশ্বাসঘাতকতা?

ওঁরা ফিরে এলেন। খোঁজ নিলেন পরদিন, আগামী পাঁচদিনের মধ্যে কোন্ কোন্ জাহাজ ছাড়ছে। জানা গেল, পাঁচদিনের মধ্যে মাত্র তু টি জাহাজ ছাড়ছে জাপান থেকে। একটি যাচ্ছে ব্লাডিভোস্টক, আরেকটি যাচ্ছে সাংহাই। ব্লাডিভোস্টকের জাহাজে চড়ে রাশিয়ায় গেলে রাশিয়ান জারের সরকার তাঁদের ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে। আর, সাংহাইয়ের জাহাজে উঠে সাংহাই নামলে ত আর কথাই নেই। একস্ট্রা টেরিটোরিয়াল অধিকারের ভিত্তিতে সাংহাইতে আছে ইংরেজদের নিজেদের ফোর্ট, পুলিস আর সেনাবাহিনী। অর্থাৎ, সময় ও সুযোগ বুঝেই ব্রিটিশ এই ফাঁদ পেতে রেখেছে।

রাসবিহারীর মাথার ওপর খড়্গ ঝুলছিল। ইংরেজদের হাতে পড়লেই—ফাঁসী। অথচ, এড়াবারও আর উপায় নেই। পি-এন-ঠাকুর যে স্বয়ং রাসবিহারী এটা ইংরেজ জেনে ফেলেছে। জেনে ফেলে খবরটা যে তারা সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে, এ-বিষয়ে ভুল নেই। আবার জাপানে যে থেকে যাবেন, তারও উপায় নেই। পাঁচদিন সময় পার হয়ে গেলে জাপানী পুলিসই তাঁদের ধ'রে ইংরেজদের হাতে সঁপে দেবে। অর্থাৎ যে দিকেই যাওয়া যাক না কেন, ফাঁসীর দড়ি এড়ানো অসম্ভব!

হেরম্ব গুপ্ত দেখে শুনে হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর যা হয় হোক, কিন্তু রাসবিহারীবাবু? তিনি যে পি-এন-ঠাকুর নন, রাসবিহারী বসু,—এ খবরটা ফাঁস করলো কে? কে সেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক?

বলা বাহুল্য, সেই বিশ্বাসঘাতকের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় নি। অবশ্য রাসবিহারী নিজে এ-বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন না, তিনি নির্বিকার। বরং ক্ষুব্ধ ছিলেন লালা লাজপৎ রায়, ক্ষুব্ধ ছিলেন হেরম্ব গুপ্ত। পি-এন-ঠাকুরের খবর জানতেন কিমুরা, কিন্তু তিনি

যে-ভাবে ওঁদের তখন সাহায্য করছিলেন তাতে তার প্রতি সন্দেহ আদৌ আসে না। এই কিমুরা-ই ওঁদের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। ডাঃ ওহ্-কাওয়া লালাজী আর কেশোরামকে তাঁর জানা একটা ক্ষুদ্র হোটেলে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। আর রাসবিহারী? ছায়ার মতো এঁর আর হেরম্ববাবুর পিছনে ঘুরছে জাপানী গোয়েন্দা, এঁরা পালাবেন কোথায়? এ-এক অসহনীয় অবস্থা। বিশেষ ক'রে হেরম্ব গুপ্ত, ক্রোধে, ক্ষোভে বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বিশ্বাসঘাতকটিকে পেলে বোধ হয় তিনি ছিঁড়ে খান।

এইভাবে সেই দুঃসহ পাঁচটি দিনের একটি দিন কেটে গেছে। পরদিন রাত্রে ঝড় জল মাথায় নিয়ে স্পাইদের চোখে ধুলো দিয়ে কেশোরাম এসে হাজির। কেশোরাম টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্র হিসাবে পরিচিত, তার ব্যাঙ্কে জমা টাকাও আছে। এই টাকা রাসবিহারীই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। কিছু টাকা কেশোরাম ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, কিছু নিজের কাছে। এই টাকা আবার রাসবিহারী পেয়েছিলেন ভাই ভগবান সিং-এর কাছ থেকে। কেশোরাম এসে বললেন রাসবিহারীকে—টাকা এনেছি, আপনার নিশ্চয়ই দরকারে লাগবে?

রাসবিহারী মুখ তুলে তাকালেন, বললেন,—না। তুমি বরং লালাজীকে ও-টাকা দাও, তাঁর এখন দরকারে লাগতে পারে।

কেশোরাম অবাক হয়ে রাসবিহারীর দিকে তাকালো। তারপরে বললে, তা অবিশ্যি ঠিক। তাঁকে বাইরে যেতেই হবে। আপনি কী ক'রে জানলেন?

রাসবিহারী মৃদু হেসে বললেন,—অনুমান।

কেশোরাম চেয়ারে ভালো ক'রে বসে পড়লো। বললে,—অনুমান আপনার ঠিক।

ডঃ শিওজাওয়া কাল নিপ্পন ক্লাবে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেন

লালাজীকে। সেখানেই তিনি লালাজীকে বললেন, যতশীঘ্র সম্ভব জাপান ছেড়ে যান। কেননা ব্রিটিশ আপনাকেও বহিষ্কার করবার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি খুব গোপন সূত্রে এই খবর পেয়েছি।

রাসবিহারী বললেন, লালাজীকে গিয়ে বলো, পারলে কালই তিনি যেন রওনা হন। জাপান সরকারের লিখিত আদেশ বেরোবার আগেই এটা দরকার।

কেশোরাম বললে,—আমি বলবো। কিন্তু আপনাদের জন্যই ওঁর মাথাব্যথা বেশি। কারণ, ওঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের নির্দিষ্ট কোনো চার্জ নেই, যেমন আছে আপনাদের ওপর।

বলে, অল্প একটু হেসে কেশোরাম বললে,—আপনার মাথার দাম লাখ টাকা, ধরতে পারলে যে ফাঁসী দেবে, এ-তে সন্দেহ নেই। লাহোর কন্সপিরেসি কেস ইত্যাদি বহু চার্জ। কিন্তু হেরম্ববাবুর বিরুদ্ধে যে কি—বাধা দিয়ে হেরম্ব বললেন,—আমার মাথাটাও নিরাপদ নয়। চার্জ কি কম? ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্র, এটাই ফাঁসী দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বলতে-বলতেই একটু হেসে উঠলেন। কেশোরাম বললে,—ডঃ শিওজাওয়া ওয়াশেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনই শুধু নন, তিনি জাপান বা নিপ্পন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধু। খবরাখবরও কম রাখেন না। তিনিই লালাজীকে কাল বলেছেন, পি-এন-ঠাকুর যে রাসবিহারী বসু, এ-কথা ইংরেজদের কাছে ফাঁস ক'রে দেবার মূলে কে।

কে? যেন গর্জন করে উঠলেন হেরম্ব গুপ্ত।

কেশোরাম বললে,—ঐ 'দাস' বলে ছেলেটি। দাস বলে পরিচয় দিলেও সে ঠিক বাঙালী নয়,—ওর বাড়ি আসামে।

হেরম্ব উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—বিশ্বাসঘাতকটাকে শেষ করে দিতে হবে।

রাসবিহারী হাত তুলে শান্ত কণ্ঠে বললেন,—থাক। এখন ও-সব করলে চলবে না, উত্তেজিত হলেও চলবে না। হয়ত-বা সে উচ্ছ্বাসের

মাথায় বলে ফেলেছে, ঠিক ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যও হয়ত তার ছিল না।

—তা না থাকলেও, এটা একটা জঘন্য অপরাধ,—হেরম্ব বললেন, —একে ক্ষমা করা চলে না।

রাসবিহারী বললেন,—পরে ভাববেন, এখন থাক। এবং শুধু তা-ই নয়, আমরা যে বুঝতে পেরেছি, এটা তাকে এখন জানতেও দেবেন না। আশে পাশেই সে আছে, সতর্ক হয়ে যাবে।

—এ-ডেরার খবরও সে জানে নাকি?

—না, কিন্তু জানতে কতক্ষণ?—রাসবিহারী বললেন,—ইংরেজ গোয়েন্দারা তাকে এখনো কাজে লাগাতে পারে। বলতে বোধহয় ভুলে গেছি। ডঃ ওহ্ কাওয়া এঁদের দুজনকেও অন্য এক জায়গায় রাতারাতি পাচার ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ-ও একটা রেস্টুরেন্টের ওপরতলা।

তখন ঝড়জল সমানে চলছিল। কেশোরাম জানালার পর্দাটা একটু সরিয়ে সে-দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার ফিরে এলো তার চেয়ারে। হেরম্ববাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—নিচে থেকে কিছু কফি-টফি জোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।

দরজা দিয়ে তিনি অপসৃত হতেই কেশোরাম বললে,—হেরম্বজীও ত লালাজীর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেন।

—না,—রাসবিহারী মৃদু হেসে বললেন,—লালাজী আর হেরম্ব-বাবুর অপরাধ এক ধরনের নয়। লালাজীকে ধরলে বড়োজোর জেলে কিছুদিন আটকে রাখবে। কিন্তু হেরম্বর অবস্থা আমার মতো। আমেরিকা থেকে যায় বার্লিনে। বার্লিন-কমিটির একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি হয়ে ওয়াশিংটনে আসে। অস্ত্রশস্ত্র কিনে ভারতের বিপ্লবীদের কাছে পাঠানোর ষড়যন্ত্র,—এ কী কম কথা ইংরেজদের চোখে! এখানে এসেও অস্ত্রশস্ত্র কেনবার চেষ্টায় ছিল! ওর খবর আমরাই বা কতটুকু রেখেছিলাম, কেশোরাম! আমাদের থেকেও বেশি খবর রাখে ইংরেজের

গোয়েন্দারা! নইলে, আমার সঙ্গে ওকেও পাঁচদিনের মেয়াদে দেশ ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেয় জাপান সরকার?

ইতিমধ্যে কফি-টফি নিয়ে ফিরে আসেন হেরম্ব গুপ্ত। হঠাৎ তিনজনে চুপচাপ হয়ে গেছেন। ঝড়জল তখনো সমানে চলছে। এমন সময় দরজায় আবার সাংকেতিক টোকা। রাসবিহারী চট্ ক'রে উঠে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে এসে ঢুকলেন ওহকাওয়া, ভিজে ওভারকোটটা ছেড়ে এক তাড়া খবরের কাগজ বার করলেন,—তোমরা নিশ্চয়ই দেখনি আজকের কাগজ?

—না। সুযোগ পেলাম কই,—হেরম্ব গুপ্ত বললেন,—নিচে, রেস্টুরেণ্টে একখানা কাগজ নেয়। কিন্তু সেটাও জাপানী ভাষায় লেখা। বুঝব কী করে?

—তাছাড়া,—রাসবিহারী বললেন,—নিচে আমাদের নামাও ঠিক নয়, হাজার হোক, ওটা রেস্টুরেণ্ট বই ত নয়, হরেক লোকের মেলা!

ওহ্‌কাওয়া বললেন, আপনাদের দুজনকে নিয়েই আজ সারা জাপান—বিশেষ করে—টোকিও, মুখর। প্রায় প্রত্যেকটি কাগজ সম্পাদকীয় লিখেছে আমাদের বৈদেশিক দপ্তরকে নিন্দা করে। ইংরেজদের চাপে পড়ে দুজন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়কে ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে দেওয়া কখনই চলবে না।

হেরম্ব বললেন,—তবে কি আশার আলো দেখা যাচ্ছে?

ওহ্‌কাওয়া বললেন, দেখুন না কী হয়? কিন্তু আমি আর বসবো না। বলে, কেশোরামের দিকে ফিরলেন। একটু হেসে বললেন,—মিস্টার সাবরওয়াল, আপনিও এখানে থাকবেন না! কাল ভোরবেলা আপনি চলে যাবেন কিয়োতোতে। ওখানকার ওটানি ইউনিভার্সিটিতে আপনি এবার থেকে কাজ করবেন, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

—ধন্যবাদ।

ওহ্‌কাওয়া বললেন,—আজ রাত্রিটা এখানেই থাকুন। ভোরে একটা গাড়ি আসবে। তাতে ক'রে চলে যাবেন।

—কিন্তু, লালাজী!

ওহ্‌কাওয়া বললেন,—লালাজী এখন তোয়ামার বাড়িতে সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে আলাপ করছেন। তাঁরও জাহাজ ছাড়ছে কাল। এখান থেকে তিনি যাবেন কোবে। কোবে থেকে সাংহাই। সাংহাই থেকে সম্ভব হলে দেশে ফিরবেন।

ডঃ ওহ্‌কাওয়া আর দাঁড়ালেন না। ঝড়ের বেগে এসেছিলেন, ঝড়ের বেগেই চলে গেলেন।

হেরম্ব বললেম, তারপর?

রাসবিহারী অচঞ্চল। তিনি অল্প একটু হেসে বললেন,—হেরম্ববাবু, আদৌ অস্থির হবেন না। মনটা একেবারে স্থির ও শান্ত ক'রে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করুন। একটা কথা ভেবে দেখেছেন কী? আমাদের বিপ্লবী নেতারা সবাই ই যোগীপুরুষ? এমনকি, অনেকেই সন্ন্যাসী গুরুর মন্ত্রশিষ্য। বাঘা যতীন ছিলেন ভোলাগিরির শিষ্য। অরবিন্দ নিজে যোগীপুরুষ তার ওপর মহর্ষি লেলের কাছ থেকে যোগশিক্ষা করেছিলেন। এই যোগ কিসের জন্য? বিপদে মনটাকে একেবারে স্থির রাখবার জন্য। কোনো ঢেউ নয়—কিছু নয় —একেবারে স্থির। দেখবেন, তখন ভগবানের নির্দেশ আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

হেরম্ব গুপ্ত একটু অবাক হয়েই রাসবিহারীর দিকে তাকিয়ে-ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত তিনি কোনো কথাই বলতে পারেননি। আমি কেশোরামজীর কাছ থেকে পরে এ-সব কথার বর্ণনা শুনেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেরম্ববাবু বলেছিলেন,—ঠিক আছে যা হবার হোক, আর ভাববো না। তার একটা কৌতূহল জাগছে। এই যে সমস্ত সংবাদপত্রে হৈ-চৈ উঠলো, এর পিছনে কে আছেন? কে আছেন আমাদের সেই পরম বন্ধু, যিনি এতখানি প্রভাবশালী?

রাসবিহারীর শান্ত উত্তর,—তোয়ামা।

পরদিন। ভোরে গাড়ি এসে যথারীতি দরজায় দাঁড়ালো, কেশোরাম চলে গেলেন। দিন গড়িয়ে চললো। ডঃ শিওজাওয়ার দেখা মিললো বিকেলে। বললেন,—লাজপৎ রায় কোবেতে জাহাজে উঠে পড়েছেন। এবার আপনাদের একটা ব্যবস্থা হলেই হয়। এখানে অর্থাৎ এই ঘরে যে আপনারা নিরাপদ, তা'ঠিক মনে করবেন না। আমি চা খাওয়ার অছিলায় রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চট্ ক'রে ভিতরের দরজা দিয়ে ওপরে চলে এসেছি। আপনারা যে আবেদন জানিয়েছেন নিপ্পনবাসীদের, তা-ও ছাপা হয়েছে আজ, কোনো কোনো কাগজে। এই দেখুন।

হেরম্ব ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু জাপানী তিনি বুঝবেন কী ক'রে? ডঃ শিওজাওয়া বললেন,—এই যে আপনারা বলছেন,—'নিজের দেশকে ভালবাসা কি অপরাধ? আমরা এই জাপান দেশের স্বাধীন নাগরিকদের মতোই স্বদেশ-ভক্ত, আমরা মুক্তির যুদ্ধ করে যাচ্ছি স্বদেশেরই মুক্তির জন্য, আমরা ত কোনো অন্যায় করিনি?'—এ-খুবই মর্মস্পর্শী হয়েছে।

—এতে কি কোনো কাজ হবে মনে করেন? হেরম্ব গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, টলবে কি সরকারের বৈদেশিক দপ্তর?

—বলা শক্ত।

শিওজাওয়া এর পর বেশিক্ষণ বসেন নি। তোয়ামা যে তাঁদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, এ-কথা জানিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

কিন্তু নিপ্পন সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের আসন টলেনি। তাঁদের নির্দেশে পুলিসের বড়োকর্তা ঘোষণা করলেন,—'১৯১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর ইয়োকোহামা থেকে যে জাহাজ সাংহাই যাচ্ছে, তাতে জোর ক'রে তুলে দেওয়া হবে ঐ ভারতীয় দুজনকে।'

ভারতীয় দুজন কিন্তু নিশ্চল—নির্বিকার। রাসবিহারী জাপানী কাগজগুলি সামনে রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়বার চেষ্টা করেন শুধু।

কিন্তু সরকারী আসন না টললেও মানবতার আসন টলে ওঠে। কাগজে সবাই পড়েছেন ভারতীয় দু'জন স্বদেশপ্রেমিকের ভাগ্যের কথা, অনেকেরই মন হয়ত দুলে উঠেছে সমবেদনায়, কিন্তু কার্যকালে মানুষ অগ্রসর হতে পারে কতটুকু?

তবু অঘটন ঘটে। এক অদৃশ্য প্রবল টান কোনো কোনো হৃদয়ে অকস্মাৎ জেগে ওঠে। এখানেও তার অভাব হলো না, একটা সাধারণ দম্পতির হৃদয়ে জেগে উঠলো সেই টান। টোকিওর সিঞ্জিকু স্টেশনের কাছে 'নাকামুরায়া' বলে একটি রুটির দোকান ছিল। দোকানের মালিকের নাম আইজো সোমা। খবরের কাগজে ওঁদের কথা পড়া অবধি খুবই বিচলত বোধ করছিলেন। ওঁদের দোকানে সবসময়ই ক্রেতাদের যাতায়াত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দোকানে বসেন। ব'সে, ক্রেতাদের জিনিসপত্র দেন, কথাবার্তাও বলেন। রীতিমত চল্‌তি দোকান, নিয়মিত ক্রেতাদের সঙ্গে একধরণের ঘনিষ্ঠতাও জন্মে গেছে। সাধারণ মানুষ থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গও এই দোকানে আসা-যাওয়া করেন। এমনি একজন ক্রেতা ছিলেন 'নিরোকু' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক নাকামুরা। সেদিন ১লা ডিসেম্বর। নাকামুরা কাছে আসতেই সোমা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,—ভারতীয় ছেলেদুটির কী হলো বলতে পারেন?

নাকামুরা তার কাগজে এঁদের স্বপক্ষে জোরালো ভাষাতেই সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সুতরাং ওঁদের ওপর যে তাঁর আন্তরিক সমবেদনা ছিল এ-কথা বুঝে নিতে সোমার দেরি হয়নি। তাই এঁকেই উনি নিচু গলায় ওঁদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

নাকামুরার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, কিছুই হলো না। ওদের যেতেই হবে।

—খুবই দুঃখের ব্যাপার, তাই না? যাত্রার মানে নিশ্চিত মৃত্যু। নাকামুরা বললেন,-তা ত বটেই, বিশেষ করে—বোসের পক্ষে ত এ কথা সহজেই খাটে। ইংরেজদের প্রতি বৈদেশিক মন্ত্রীর এই দাস-

সুলভ মনোভাব আমাদের সবার পক্ষে সমূহ লজ্জার বিষয়। তোয়ামা ওঁদের বাঁচাবার খুব চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

সোমা তখন চারিদিক তাকিয়ে নিয়ে ওকে চুপিচুপি বললেন,—দেখুন, এক কাজ করলে হয় না? দোকানের পিছনে আমাদের বাড়ির ভিতরে একটা ভাঙ্গাচোরা কারখানা পড়ে আছে, আমরা কেউই তা ব্যবহার করি না, ভাঙা জিনিস পত্রে ঠাসা। সেখানে ওঁদের দুজনকে লুকিয়ে রাখলে হয় না? আমি সামান্য রুটিওয়ালা, আমাকে কেউই সন্দেহ করবে না। কী বলেন, আপনি?

নাকামুরার ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হলো, বললেন,—আচ্ছা ভেবে দেখি।

বলে, নাকামুরা চিন্তিত ভঙ্গিতে দোকান ত্যাগ করলেন। একটু পরে কী একটা দরকারী কাজে সোমাও বার হয়ে গেলেন। অদূরে বসে সোমার স্ত্রী—মিসেস কোকো সোমা আড়চোখে ওঁদের লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু খদ্দেরদের জিনিসপত্র দিতে ব্যস্ত থাকায় ওঁদের কথা বার্তা অনুধাবন করতে পারেন নি।

ওদিকে, নাকামুরা দোকান থেকে বেরিয়ে ছুটলেন তাঁর এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে। এই বন্ধুটির যোগাযোগ ছিল তোয়ামার সঙ্গে। নাকামুরা বন্ধুটিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন তোয়ামার বাড়ি। তোয়ামা সব শুনে তখুনিই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললেন। বললেন,—তোমরা বোধ হয় জানো না বোস কোথায় আছে। এই নাও ঠিকানা। দেখা করে তাদের তৈরি হতে বলো। আর সোমাকেও গিয়ে বলো, ওদের নিয়ে যেন এখানে চলে আসে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, যার-তার গাড়ি হলে চলবে না। আমার বাড়ির সামনে পুলিস আছে দাঁড়িয়ে, খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।

এই ব্যাপারের কয়েক ঘণ্টা পরে। খুব ব্যস্ত হয়ে নাকামুরা ঐ রুটির দোকানে এসে হাজির হলেন, সোমা এখনো তাঁর কাজকর্ম সেরে ফিরে আসেন নি। নাকামুরা শ্রীমতী সোমাকে একান্তে ডেকে সব কথা বললেন। শ্রীমতী প্রথমটায় আঁৎকে উঠলেও পরে ব্যাপারটা

বুঝে স্বামীর মতেই মত দিলেন। কিন্তু কোথায় সোমা? যতো জানা যায়গা আছে, যেখানে যেখানে তাঁর যাওয়া সম্ভব সব জায়গাতেই শ্রীমতী একে ওকে ফোন করতে লাগলেন, কিন্তু কোনো উদ্দেশ নেই।

ওদিকে হয়েছে কী, সোমা তাঁর কাজে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একসময় একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে কিছু খেয়ে নিচ্ছিলেন। খেতে-খেতে তাঁর হঠাৎ মনে পড়লো সকালে নাকামুরার কাছে তিনি কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যদি নাকামুরা এসে তাঁর খোঁজ করতে থাকেন! এই ভেবে, আধ-খাওয়া অবস্থাতেই তিনি দোকানে ফোন করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে আসতে শ্রীমতী যেন অকুলে কুল পেলেন।—বললেন,- শীগ্গির এসো, নাকামুরা এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

—এখুনি আসছি।

ভদ্রলোক খাওয়া দাওয়া ফেলে রেখে ছুটে এলেন দোকানে।

তারপরের ঘটনা খুবই নাটকীয়। নাকামুরা ও তাঁর সাংবাদিক বন্ধু হঠাৎ উঠলেন, এসে হাজির হলেন রাসবিহারীদের ডেরায়। নিজেদের পরিচয় দিয়েই বললেন শীগ্গির প্রস্তুত হোন। এবং তার একটু পরেই একটা গাড়ি এসে থামলো ওদের দরজায়। এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, এক জাপানী ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত ওপরে উঠলেন, আর বোস এবং গুপ্তকে নিয়ে গাড়িতে উঠে তৎক্ষণাৎ গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

তোয়ামার বিরাট বাগানঘেরা বাড়িখানা ছিল তখনকার টৌকিওর একেবারে মধ্যস্থলে, অধ্যাপক টেরাও-র বাড়ির পাশে। বাগানের একটা দিক পার হয়ে তাঁরা তোয়ামার বাড়িতে ঢোকেন। বাড়ির সামনে ছিল পুলিসের গাড়ি। খবর পেয়ে পুলিসের একজন কর্তাব্যক্তি পর্যন্ত হাজির হয়েছিলেন। তাঁরা জানেন, রাত্রিটিরই অপেক্ষামাত্র। রাত্রি ভোর হলেই ২রা ডিসেম্বর। ওদের ধরে নিয়ে জোর করে জাহাজে পুরতে পারলেই তাদের কর্তব্য শেষ।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। জাপানী প্রথা অনুসারে

সবাই দরজার বাহিরে জুতো খুলে রেখে ভিতরে ঢুকেছিলেন। পুলিসের নজর ছিল সেই জুতোর ওপর। ওরা একসময় বেরিয়ে এসে ঐ জুতো পরলেই, তখন ওদের পিছু ধাওয়া করলেই চলবে।

কিন্তু তাদের অনুমান সবই ব্যর্থ হয়েছিল। সোমা বাইরের দরজা দিয়ে যথারীতি জুতো পরে বেরিয়ে গেলেন, আর ওরা বার হলেন পিছনের দরজা দিয়ে, এবং তা-ও পাশের বাড়ির পিছনের বাগান পার হয়ে। পায়ে অন্য জুতো, পোষাকও অন্যরকম। খুব লম্বা একটা ওভারকোট পরেছিলেন গুপ্ত। আর বোস পরেছিলেন তোয়ামার টুপি আর কিমানো। তারপরে বাগানের পিছনে রাখা ছিল সন্তর্পণে একটা গাড়ি, তখন টোকিওর মধ্যে সব থেকে বেগবান গাড়ি যে-কয়টি ছিল এটি তার মধ্যে একটি। ঘণ্টায় আশী মাইল চলবার ক্ষমতা রাখে। এ-ও তোয়ামারই ব্যবস্থা। সোমা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে পিছনে ওদের সেই গাড়িটার মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন।

রাত তখন বাড়ছে। তোয়ামার বাড়ির জানালাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেল। ওদিকে পুলিশের গাড়িগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বিকেল থেকে। সেই সঙ্গে যে ভাড়া গাড়ীতে করে বোসকে আনা হয়েছিল, সেই গাড়িটাও সমানে অপেক্ষা করছে। পুলিসের কর্তা আর থাকতে না পেরে বাগানের ফটক পেরিয়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে খোঁজখবর শুরু করলেন।

—কোথায় সেই ভারতীয়রা ?

বাড়ির এক চাকর উত্তর দিলে,—তারা ত অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে! ঘণ্টা কয়েক হয়ে গেল। কী সর্বনাশ!

আতঙ্কিত পুলিস-কর্তা তার লোকজন নিয়ে মুহূর্তে সেই বিশাল বাগানওয়ালা বাড়িটাকে ঘিরে ফেললেন। তখনো দরজার কাছে তাদের দু-জোড়া জুতো পড়ে রয়েছে। সন্দেহাকুল মন, কিন্তু সর্বজনমান্য তোয়ামার বাড়ির ভিতরে ঢুকবার সাহস তাদের ছিল না।

তোয়ামা তাঁর পড়ার ঘরে বসে সবই টের পেলেন। তাঁর একটু দয়াও হলো। যে ভাড়া গাড়িখানা ওঁদের দুজনকে নিয়ে এসেছিল, তার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। পুলিশ-কর্তাকে ডেকে বোধ হয় কিছু বললেনও। বাড়ি সার্চ করে দেখতে পারো তোমরা, তারা চলে গেছে। এবং কোথায় গেছে জানি না। হয়ত জাহাজই ধরবে। দেশে ফেরবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

ওদিকে সেই দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়িখানি মালিকের কাছে ফিরে গেলে তিনি ড্রাইভারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। এই মালিকের নাম হচ্ছে ডঃ সুজিয়ামা। স্বভাবতই এ-ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। অবশ্য তাঁকেও তোয়ামা জানান নি যে ভারতীয় দুইজন কোথায় যাবেন শেষ পর্যন্ত। ড্রাইভার মাত্র নির্দেশ পালন করতে গেছে। সে-ও অতশত জানতো না। সে শুধু জানতো টুকুডাকে, যিনি রাসবিহারীদের সঙ্গে নিয়ে তোয়ামার বাড়ি গিয়েছিলেন। সোমাকেও জানতো না ড্রাইভার। সুজিয়ামার প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো, —আমি টুকুডা ও তাঁর তিন বন্ধুকে নিয়ে সিঞ্চকু স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে ওঁরা কিছু জিনিস-টিনিস কিনে আবার মোটরে এসে বসেন। ওখান থেকে ওঁদের নিয়ে যায় ইয়াটুয়া। ওখানে টুকুডা ছাড়া সবাই নেমে যান। আমি টুকুডাকে তাঁর বাড়িতে রেখে এসেছি। টুকুডা বললেন যে তাঁর বন্ধুরা পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরবেন।

সুজিয়ামা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন ড্রাইভারের বর্ণনা শুনে। যাক্, কোনো বিপদ-আপদ তাহলে ঘটে নি!

ওদিকে সোমার রুটির দোকানে তখন রাত নটা বাজছে। দোকানের দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল, যদিও ভিতরে খদ্দেরদের সংখ্যা তখনো কম নয়। শ্রীমতী সোমা তাদের বিদায় করতে ব্যস্ত, এমন সময় সোমা, টুকুডা ও ওঁরা দুজন প্রবেশ করলেন। জাপানী ছদ্মবেশ, হঠাৎ দেখে ভারতীয় বলে চেনবারও উপায় নেই।

কেউ অবশ্য সন্দেহও করে নি। সুজিয়ামার গাড়িটা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে টুকুডা এবং আমাদের দোকানের তিনজন কর্মচারী বেরিয়ে গিয়ে এবার গাড়িতে উঠলেন। সুজিয়ামার ড্রাইভার বুঝতে পারলো না, সে ভাবলো, আগের তিনজনই উঠেছেন টুকুডার সঙ্গে। ওদের তিনজনকে ইয়াটুয়ায় নামিয়ে দিয়ে সে টুকুডাকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসে।

পরদিন কাগজে কাগজে বার হলো রাসবিহারীদের অন্তর্ধানের সংবাদ। পুলিস মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। তারা পাগলের মতো সারা শহর তোলপাড় করে বেড়াতে লাগলো ওদের সন্ধানে। যাদের ওপর বহিষ্কারের আদেশ আছে তাদের ধরতে পারলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে আর কোনো বাধা নেই। এমন কি বহিষ্কারপ্রাপ্তদের আশ্রয় দেওয়াও আইনতঃ অপরাধ। এই নিদারুণ ঝুঁকি নিয়েই শ্রীসোমা ওঁদের দুজনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ধরা পড়বার আশঙ্কা রয়েছে প্রতি দিন। প্রতি মুহূর্তে। যদিও ওদের দুজনকে সেই পরিত্যক্ত কারখানার পিছনের অংশে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তবু আশ্রয়দাতার স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছিল কম নয়। বিশেষ করে শ্রীমতী সোমার ওপর। কারণ গৃহকর্ত্রী হিসেবে অথিতিদের খাওয়া-দাওয়া, দেখাশোনা করার দায়িত্ব তারই ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তাঁদের একটি মেয়ে, একটি ছেলে এবং শ্রীমতী সোমার কোলে একটি শিশুসন্তান।

সকাল বেলায় অনেক চিন্তাভাবনার পর সোমা তাঁর বাড়ির চাকরবাকরদের ডাকলেন। তারা বহুদিনের লোক এবং বিশ্বস্ত। সোমা বললেন, —কাগজে তোমরা যে দুজন ভারতীয়ের কথা পড়েছো আমরা তাদের আশ্রয় দিতে চাই। খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। কিন্তু এ-ছাড়া আর কী উপায় আছে? আমরা যেমন জাপানকে ভালবাসি, তারাও তেমনি ভারতকে ভালবাসে এবং ভালবাসার অপরাধে দুটি তরুণের প্রাণ বলি হবে? আমি তা সইতে পারছি না, মনে হয় তোমরাও পারবে না। এবার বলো, তোমাদের মতামত কী?

এখানে আমার, অর্থাৎ শ্রীসঞ্জয়ের কথা আবার আসছে। শেফালী খাতা থেকে এবার যা প'ড়ে শোনালো, তাতে জানা গেল চাকর-বাকররা সম্মতি দিতে দ্বিধা করেনি। ঠিক যেন আমার নিজের ব্যাপার। সলিল-ডাক্তারের কথায় নিতাই জবাব দিয়েছিল, 'কাক কোকিলে টের পাবে না বাবু।'

রাসবিহারীর বেলাতেও ঐরকম জবাব পাওয়া গিয়েছিল। তারা শুধু 'কাক-কোকিলে টের পাবে না' এমন কথাই বলেনি। বলেছিল, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো এ-ব্যাপারে, আমরা ওদের রক্ষা করবো যত বিপদই আসুক না কেন। যদি হামলা হয়, আমরা তাদের ঠেকাবো, সেই সুযোগে আপনি ওদের অন্য কোথাও পাচার করে দিতে পারবেন।

এইসব ঘটনার কথা বহু পরে শ্রীমতী কোকো সোমা স্মৃতি-চারণ হিসাবে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,—আমার দুজন চাকরাণী ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে দিয়েছিলাম ওদের দেখা-শোনা করবার ভার।

তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়, তাদের পরিবারে লোকজন ছিল অনেক। কী তাঁদের দোকানে, কী বাড়িতে, লোকজন-বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়ারও বিরাম ছিল না। এই অভ্যাগতদের মধ্যে বিদেশীও থাকতো। সেজন্য বিদেশীদের উপযোগী খাবার কিছু কিনতে গেলেও কারুর কোনো সন্দেহ হবার কথা নয়। শ্রীমতী সোমা লিখেছেন,

এতো লোকজন দেখে বোস বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, আমাদের পরিবার খুবই বড়ো, কারণ, আমাদের চাকর বাকর থেকে শুরু করে কেরাণীদেরও আমরা আমাদের পরিবারের অন্তর্গত বলে গণ্য করতাম। আমার আনন্দ এইখানে যে, এরা সবাই ওদের দুজনকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত হ'য়ে কাজ করে গেছে। কিন্তু হলে হবে কী? তিনি লিখে গেছেন, ওরা নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিতে আছে। ওরা জাপানী জানে না, কথা কইবে কার সঙ্গে? একমাত্র আমিই যা একটু আধটু ইংরেজী বলতে পারতাম। কিন্তু আমি যে ওদের কাছে একটুক্ষণ বসবো, তার জো আছে? আমি দোকানে না থাকলেই অমনি 'মাদাম কোক্কো কোথায়' 'মাদাম কোক্কো কোথায়' বলে চেনা খদ্দেররা সোরগোল করবে। আর বলবে, 'ওকে দেখি না কেন?' আবার কেউ বা মন্তব্য করবেন, 'মাঝে মাঝে হুট্‌হাট্‌ করে কোথায় উঠে যান! ভেবে দেখলাম, এ সব তো ভাল কথা নয়। এ-থেকে ঘোরতর সন্দেহ দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তাই আর উঠেটুঠে যেতাম না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম চেয়ারে। মাঝে মাঝে ইংরেজীতে চিরকুট লিখে ওদের দুজনের কাছে পাঠাতাম, কী করছো? আজ রাতে কী খেতে ইচ্ছে করছে, ইত্যাদি। কিন্তু এতেও বিপদ ছিল। এক গাদা খদ্দেরের ভিড়ের মাঝে যদি ইংরেজীতে চিরকুট লিখে চাকর বাকরদের হাতে দিই, তাহলে তারা প্রশ্ন করতে পারে, 'কী ব্যাপার? বিদেশী ভাষায় ও-সব কী লিখছেন?' এবং একজন কৌতূহলী হয়ে করলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেটা যে পল্লবিত হয়ে কী রূপ নেবে, কে জানে! তাই এটাও সব সময় করা যেতো না। অথচ মনটা ছট্‌ফট্‌ করতো। বেচারারা বাস্তবিকই খুব কষ্টে আছে! ওদের খোঁজখবর সব সময় না নিতে পারলে আমারই বা মনটা টেকে কী ক'রে? কিন্তু নেবোই বা কখন এবং কী করে? ঝি-টা যায় খাবার-দাবার দিয়ে আসে। কিন্তু মাকে না পেলে কি ছেলের মন টেকে? বাস্তবিকই আমি যেন মনে মনে ওদের মা হয়ে গেছি!

মা ছাড়া আর কী বলা যায়? কাগজে কাগজে ভারতীয় যুবক দুটির তিরোভাব নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা বেরুতে লাগলো, পুলিশ তাদের খোঁজে আরও বেশি তৎপর হয়ে পড়লো,—এবং এসব খবর ওঁর স্নায়ুর ওপর কম চাপ দেয় নি। বহিষ্কৃতদের ঘরে স্থান দেওয়া অপরাধ। ধরা পড়লে ওঁরা স্বামী স্ত্রীরা তো আছেনই, ছোট মেয়েরাও পার পাবে না। ওদের তিনটি সন্তান। বড়োটি মেয়ে, বয়স প্রায় কুড়ি বছর। ছাত্রী। তার পরেরটি ছেলে, টিকোকো। প্রায় উনিশ বছর বয়স। আর ছোটটি কোলের শিশু, দুগ্ধপোষ্য মাত্র।

এই অবস্থায় যতো কাগজে পড়েন ওই সব খবর, আর শোনেন নানারকম গুজব আর গোয়েন্দাদের উপদ্রবের কাহিনী, ততই ভিতরে-ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে থাকেন তিনি। কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলার নয়, শুধু মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করা! ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে জেগে ওঠেন মাঝে মাঝে। মনে হয়, ওই বুঝি দরজার ধাক্কা পড়লো, ওই বুঝি পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করলো! ওই বুঝি যুবক দুটিকে বেঁধে নিয়ে গেল! ওই বুঝি স্বামী বা পুত্র কন্যার ওপর পুলিশি অত্যাচার শুরু হলো! ওর এমনো ভয় হতো, যে, হয়ত পুলিশ তার দুগ্ধপোষ্য শিশু-পুত্রটিকেও রেহাই দেবে না! নিঃশব্দে এই আতঙ্ক মনে-মনে বহন করতে করতে তাঁর শরীর যে ক্রমে ভেঙে পড়ছে, সেদিকে খেয়াল করতে পারেন নি মিসেস সোমা।

ওদিকে, প্রত্যেক দিন খবর বেরুতে লাগলো, বড়ো বড়ো নামজাদা জ্ঞানী গুণী মানুষদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সন্দেহের বশে, অথবা আটকে রাখছে। ব্রিটিশ দূতাবাস ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওপর, ওদের দুজনের গা ঢাকা দেওয়া নিয়ে তাদের ওপর দোষারোপ করছে। এ সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব-ছড়ানোর অন্ত নেই। রোজ রোজ নতুন নতুন গুজব শোনা যেতে লাগলো।

মিসেস সোমা লিখছেন,—একদিন ওয়াশেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

অধ্যাপক আমাদের দোকানে এসেছিলেন। আমার স্বামীকে কাছে ডেকে চুপিচুপি বললেন,—'কোথায় বোস আর তার বন্ধুকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, আমি তা জানিনা ভেবেছেন? খুব জানি।'

স্বামী ভিতরে ভিতরে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কথাটা শুনে। কিন্তু মনের ভাব যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রেখে তিনি বলে উঠলেন,—কোথায়?

অধ্যাপক গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেন,—'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে। হুঁ-হুঁ মশাই, এ কী আর জানতে বাকি থাকে?

আমার স্বামী ভিতরে ভিতরে আশ্বস্ত হলেন। বুকের ভিতরের ধুক্‌ধুকুনিটা থামলো।

কিন্তু গুজব কি একটা? দিনে দিনে বিচিত্র সব গুজবের উদ্ভব হতে লাগলো। শ্রীমতী সোমা লিখে গেছেন,—ওরা দুজন আমাদের এখানে আশ্রয় নেবার দিন পনেরোর মধ্যেই আমার দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট সন্তানটি মারা যায়। আমারই অবহেলা ছিল, আমি তাকে ভালো করে দেখতে পারতাম না। তার ওপর স্নায়ুর ওপর এমন দুশ্চিন্তার চাপ পড়ছিল যে, আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। মায়ের বুকের দুধ ছাড়া ওইটুকু বাচ্চা আর খাবে কী? সেই দুধ আমি ওকে ঠিক মতো দিতে পারিনি।

কোলের শিশু হারিয়ে প্রচণ্ড শোক পেলেও শ্রীমতী সোমা অতিথিদের দেখাশোনার ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য দেখাননি। মুখ বুজে সব সহ্য করছেন, কাজেরও কোন কামাই দেন নি।

কিন্তু ওঁদের দুজনের মনের অবস্থা তখন কেমন? প্রচণ্ড দুঃখ পেলেও কিছু করার নেই। রাসবিহারী স্থির হয়ে রইলেন, চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন বাস করা,—তাঁকে অস্থির করে তুলতে পারেনি। কিন্তু হেরম্ববাবু এটা সহ্য করতে পারলেন না। শিশু-মৃত্যুও একটা কারণ, তার ওপর চুপচাপ একটা ঘরের মধ্যে বন্দীর মতো বাস

করা,—এ কি দীর্ঘদিনের জন্য সম্ভব ? হেরম্ববাবু বললেন, আমি এভাবে থাকতে পারবো না ! আমি চললুম !

শান্ত গলায় রাসবিহারী বললেন, - স্থির হোন।

—কী করে স্থির হবো ! বাড়িতে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আর—

আরও গম্ভীর হয়ে যায় রাসবিহারীর মুখ, বলেন,—অথচ, যাদের ক্ষতি হলো, তাঁদেরকে দেখে বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই যে, কতো বড়ো শোক তাঁরা পেয়েছেন।

হেরম্ববাবু বললেন,—কিন্তু আমি আর পারছি না ! আমি যেন বন্দী ! আমাকে পালাতেই হবে !

রাসবিহারী উঠে এসে ওর হাত ধরলেন, বললেন,—শান্ত হয়ে বসুন। আপনার মতো মানুষ এমন চঞ্চল হবেন, এ যে ভাবতেই পারি না ! কেরালার তরুণ সিংহ চম্পকরমণ পিল্লাই বার্লিনে ১৯১৪-র অক্টোবরে যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টি তৈরি করেছে, আপনি তার সভ্য ! এ হৃদয়-দৌর্বল্য আপনার থাকলে কী চলে ? হেরম্ববাবু আসনে এসে বসলেন বটে, কিন্তু স্থির হতে পারছিলেন না। বললেন, হ্যাঁ, লালা হরদয়াল, তারকনাথ দাস, বরকৎউল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমিও ওর সভ্য বটে। আর সেজন্যই ত আমার এই ছটফটানি !

—আপনাদের সংস্থা ত জার্মাণ জেনারেল ষ্টাফের সঙ্গে যুক্ত, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—আমেরিকায় কি আপনাকে ওরাই পাঠিয়েছিল ?

—হ্যাঁ, হেরম্ব বললেন, জার্মাণীর ফরেন সেক্রেটারি জিমারম্যান ওয়াশিংটনের জার্মাণ দূত কাউন্ট ফন্ বার্নস্টোর্ফকে জানিয়েছিল আমার কথা। জানিয়েছিল, আমি শীগ্গিরই আমেরিকা যাচ্ছি ভারতের জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করার জন্য। শুধু অস্ত্রই নয়, আমার ওপর নির্দেশ ছিল ভারতে উপযুক্ত লোকজনও পাঠাতে হবে ! কিন্তু বলুন দেখি,

এখানে বসে বসে আমি কী করছি ! এ-রকম ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবার মতো মন আমার নয় ! আমি পালিয়ে সান্-ইয়াৎ সেনের কাছে যাবো। ওঁর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আমেরিকায় যার কাছে দেওয়া আছে, তিনি হচ্ছেন সানফ্রান্সিসকোর জেম্‌স ডেট্রিক। ওঁর সঙ্গে দেখা করে আমি আলাপ জমাই সবার আগে। ওঁর মাধ্যমে সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা ছিল, যাতে চীন কিম্বা জাপান থেকে অস্ত্র পেতে উনি সাহায্য করেন। কিন্তু জার্মাণরা এ-প্রস্তাব পছন্দ করেনি। তাই আমি আমেরিকার আর একজন জার্মাণ ক্যাপ্টেন ফন প্যাপেনের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর সাহায্য নিয়ে সরাসরি এই জাপানে চলে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে—

—সান-ইয়াৎ সেন নিজেই রয়েছেন নির্বাসনে। তবু যতটা তিনি করছেন, তার তুলনা হয় না !

হেরম্ব বললেন,—সে-কথা ঠিক, কিন্তু আমার কাজ যে বেশিদূর এগোয় নি ?

রাসবিহারী বললেন, এগোবে। অধৈর্য হবেন না।

হেরম্ববাবু মাথা নিচু করে চুপচাপ ভাবতে লাগলেন।

ওঁর মনটাকে শান্ত করবার জন্যই রাসবিহারী পুরাণো কথার অবতারণা করলেন। বললেন,—আপনাদের বাড়ি ছিল কোথায়, হেরম্ববাবু ?

হেরম্ববাবু মুখ তুলে তাকালেন, বললেন,—যশোরে। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নর নাম শুনেছেন ? আমি তাঁরই ছেলে।

রাসবিহারী আর কিছু বললেন না।

বাড়ির পিছনে একটা গুদাম-ঘরের মতো ছিল। তারই ভিতরে জিনিসপত্রের আড়ালে দিনরাত থাকা। দরজা খুললেই সারি সারি বাক্স আর টিন। তারই পাশ কাটিয়ে ভিতরে যাবার পথ। সেখানে দুটি খাট। অন্যদিকে টিনের বাক্সের আড়াল দিয়ে খাবার টেবিল বসানো হয়েছে। তার খানিকটা দূরে সংলগ্ন বাথরুম প্রভৃতি।

খাবার টেবিল যেখানে বসানো হয়েছে, সেখানে একটি জানালা আছে। কিন্তু সেটি খোলা বারণ। কারণ, জানালার বাইরেই ছোট গলি। গলির ওপারে অন্য লোকের বাড়ি-ঘর-দোর। তারা জানে এ-ঘরটা গুদাম ঘর। ওখানে জানালায় পর্দা দিলে, বা জানালা খুলে রাখলে তাদের সন্দেহ হবার সম্ভাবনা। এই জানালাটা মাঝে মাঝে খুলে হেরম্ববাবু রাস্তার দিকে তাকাতেন। জানালায় কোন শিক ছিল না, অনায়াসে এখান দিয়ে নেমে গলিতে গিয়ে পড়া যায়। নেমে একবার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি? কথাটা একবার বলেও ছিলেন রাসবিহারীকে। তিনি বললেন,—না-না-এখন অমন ঝুঁকি নিতে যাবেন না। ভুলে যাবেন না, আমরা এখানে তোয়ামা এবং সান-ইয়াৎ সেনের মতো বন্ধু পেয়েছি। তাঁরা আমাদের জন্য ঠিকই ভেবে চলেছেন। মুক্তির উপায় পেলে তাঁরাই আমাদের জানাবেন, আমরা বৃথা ছট্‌ফট্‌ করে কী করবো?

হেরম্ব গুপ্ত একটু অধৈর্য হয়েই বলে উঠলেন, কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে এভাবে চুপচাপ থাকাই বা যায় কী করে? রাসবিহারী সব সময়ই একটা খাতা আর একখানা চটি বই, আর একটা পেন্‌সিল নিয়ে প'ড়ে আছেন। অল্প একটু হেসে বললেন, আমার মতো এই কাজটা শিখে ফেলুন না? জাপানী ভাষা শেখা? কঠিন নয়। চেষ্টা করে দেখুন না!

হেরম্ব গুপ্ত বিরক্ত হয়েই বললেন,—দূর মশাই, জাপানী শিখে করবোটা কী! এখানে কি চিরকাল থাকবো? এখানে যে জন্য এসেছিলুম, তার তো বিশেষ কিছুই হলো না! এখন যে কোনো ভাবেই হোক, আমেরিকায় পাড়ি না জমালে চলছে না!

ওরা কথা বলছিলেন, এমন সময় ফুটফুটে সেই মেয়েটি এলো। না, চাকরানী নয়, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী সোমার মেয়ে। অতি নম্র, মৃদু স্বভাবের মেয়ে। বয়স বড়ো জোর বছর কুড়ি। ওদের জন্য চা জলখাবার নিয়ে খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখলো। তারপর আবার বাইরে গেল, চাকরানীকে সঙ্গে নিয়ে ফুলদানীর ফুল গুছিয়ে ফেললো।

এরই সাহায্যে জাপানী শিখছিলেন রাসবিহারী। আগে আগে মিসেস সোমা আসতেন। বাচ্চাটা মারা যাবার পর তিনি আর আসতে পারেন না। অনেক রাত্রি হলে শ্রীযুক্ত সোমা আসেন খোঁজখবর নিতে। কিন্তু মা আসা বন্ধ করার পর মেয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। রাসবিহারী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন জাপানী ভাষায়,—তোমার মা কেমন আছেন ?

সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওঁর দিকে। থমথমে মুখ। বললে,—একটু ভালো। শুয়ে আছেন। উঠতে পারছেন না।

রাসবিহারী বললেন,—তাঁকে উঠতে দিও না। আমাদের জন্য যেন ব্যস্ত হয়ে না উঠেন।

মেয়েটি একটু অবাকই হচ্ছিল। ভদ্রলোক এ-কয়দিনে তাদের ভাষা বেশ বলতে পারছেন তো! মেয়েটি এখনো ছাত্রী, ছেলেমানুষ। কথাটা সে বলেই ফেললো,—আমাদের ভাষা শিখে ফেলেছেন!

খাতা আর বই খানার দিকে তাকিয়ে রাসবিহারী একটু হাসলেন, বললেন,— কই আর শিখলুম! এই বইখানা মোটামুটি শেষ হয়েছে। আরও একখানা দিতে পারো ?

— নিশ্চয়ই দেবো।

রাসবিহারী বললেন,—এই যে কথা বলছি তোমার সঙ্গে, ঠিক বলছি ? ভুল হলে শুধরে দিও কিন্তু।

—না-না-ভুল হচ্ছে না,—মেয়েটি বললে,—বলতে বলতে আরও দুরস্ত হবে।

—ধন্যবাদ মিস সোমা,—রাসবিহারী বললেন,—তোমার মাকে আর বাবাকে আমার নমস্কার জানিও। তাঁদের যে কী অসুবিধায় ফেলেছি, তা আমরাই জানি।

—না-না-অসুবিধা কিসের! বরং এভাবে—এ-ঘরে আপনাদের থাকতে কতো কষ্টই না জানি হচ্ছে।

রাসবিহারী বললেন,—আমরা স্বর্গে বাস করছি। কিন্তু আমাদের

জন্য তোমার ছোট্ট ভাইটি চলে গেল, এ দুঃখ আমার কখনোই যাবে না।

ভাইয়ের কথায় মেয়েটির চোখ ছলছল করে এলো, সে কোনো কথা না বলে, মুখ নিচু করলো। রাসবিহারী বললেন, আচ্ছা মিস সোমা, তোমার নামটা কী, তা এখনো জানলুম না।

মেয়েটি চোখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, বললে,—আমার নাম তোসিকো।

এইখানে বলে রাখা ভালো, এ-সব কথা শেফালীর দাদু নিজের কানে শোনেন নি, বা এসব ছবি নিজের চোখে দেখেন নি। যতটুকু জেনেছেন বা শুনেছেন, তা নানান সূত্রে। বিশেষ করে কেশোরাম সবরওয়ালই ছিলেন তাঁর সব থেকে বড়ো সূত্র। লালা লাজপৎ রায় চলে যাবার পর সবরওয়াল কিয়োটোতে থাকতেন। ওটানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে যেন পড়াশুনা করছেন, কিন্তু রাসবিহারীর সঙ্গে গোপনে সংযোগও রাখতেন। অবশ্য ঠিক এই কয়মাস সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারেন নি, রাখা সম্ভবও হয়নি। এই কয়মাস অর্থে সাড়ে চার মাস, যার কথা আমরা একটু পরেই বলতে যাচ্ছি।

তোসিকো চলে যাবার পর হেরম্ব গুপ্ত রাসবিহারীকে বললেন,—আপনার মশাই ভাষা শেখবার একটা প্রতিভাই আছে। জাপানী ত দেখলুম বেশ বলতে শিখেছেন!

—কিছু না—কিছু না—রাসবিহারী বললেন,—মেয়েটি খুব নম্র, আর জাপানী সুলভ আদব-কায়দা ভালোই রপ্ত করেছে, তাই মুখের ওপর হেসে ওঠেনি। কিন্তু ওর চোখের হাসি লুকোবে কোথায়? আমার বলাটা নিশ্চয়ই ঠিক হচ্ছিল না। এটা ঠিক করতে হবে। জাপানী বলবে একেবারে জাপানীদের মতো, তবেই না ভাষা শিক্ষা!

হেরম্ব টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে বললেন, - কিন্তু করবেন কী অমন করে ভাষা শিখে? চিরকাল এখানে থাকবেন নাকি?

—যদি থাকতে হয়! দেশে ফেরবার কি ভরসা রাখেন?

—না, তা হয়ত রাখি না,—হেরম্ব গম্ভীর হয়ে বললেন,—কিন্তু এখানে থাকাও চলবে না। চলুন, আমরা তুজনেই আমেরিকায় পাড়ি জমাই।

রাসবিহারী চোখ তুলে তাকালেন। কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়। বললেন,—না, আমি আমেরিকায় গিয়ে ভীড় বাড়াবো না। আমি এখানেই থাকবো। এখান থেকেই দেশের কাজ করে যাবো।

হেরম্ব গুপ্ত ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। তিনি নিজেও বিপ্লবী। বিপ্লবীদের এই দৃঢ়তার সঙ্গে খুবই পরিচিত তিনি। তাই সহজেই বুঝতে পারলেন, এ সংকল্প থেকে রাসবিহারীকে আর টলানো যাবে না।

হেরম্ব গুপ্ত অগত্যা এ নিয়ে আর আলোচনা করলেন না। কিন্তু চুপচাপ কাঁহাতক বসে থাকা যায়। ইংরেজী কাগজপত্তরও ভিতরে পাঠানো যায় না বেশি, যদি কারও সন্দেহের উদ্রেক হয়? কারণ, এরা জাপানী সংবাদপত্রই রাখতেন, ইংরেজী রাখতেন না। তখন যদি ইংরেজী রাখতে শুরু করেন, তাহলে সন্দেহ হতে পারে। ঐ কখনো সখনো মিঃ সোমা বাইরে বেরুলেন, তখন একখানা ইংরেজী কাগজ কিনে পকেটে ফেলে রাখলেন, রাত্রে এসে চুপিচুপি দিয়ে গেলেন ওদের হাতে। কিন্তু জাপানী সংবাদপত্র নিয়ে এ মাথা ব্যথা নেই। সেগুলো আসে, হেরম্ব তার কিছুই বোঝে না, রাসবিহারীই শুধু তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

ও-প্রসঙ্গ না উঠলেও রাসবিহারী হেরম্বর গতিবিধির দিকে স্বভাবতই চোখ রেখেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, ভদ্রলোক হঠাৎ না কিছু করে বসেন! কারণ, তিনি ধরা পড়লে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসবে। তাঁদের তুজনের ত বটেই, সপরিবারে গৃহস্বামীরও। কথাটা তিনি প্রকারান্তরে হেরম্ববাবুকে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ হলো না। একদিন ভোর বেলা উঠে রাসবিহারীবাবু দেখলেন, হেরম্ববাবু নেই। পাশের খাবারের টেবিলের পাশের জানালাটার

পাল্লা একটু খোলা। সেটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটুখানি দেখে নিয়ে রাসবিহারী জানালাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না, কী ঘটেছে। হেরম্ববাবু নিশ্চয়ই চলে গেছেন কালরাত্রে, গরাদবিহীন জানালা দিয়ে গ'লে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? কত দূরে? যদি ধরা প'ড়ে যান? এখুনি একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

খানিকক্ষণ পরে কী একটা কাজে চাকরানীটি যখন ঘরে এলো, তখন তাকে বললেন,—মিস্ তোসিকোকে একটু ডেকে দিতে পারো?

তিনি জানতেন, মিসেস সোমা অসুস্থ হয়ে বিছানা নিয়েছেন, তাকে এ-সব নিয়ে বিরক্ত করা উচিত নয়। তার ওপর তিনি যদি শোনেন হেরম্ব চলে গেছেন, তাহলে তিনি আরও উদ্বিগ্ন হবেন, তার স্বাস্থ্যের পক্ষে যা হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

একটু পরেই তোসিকো এসে ঢুকলো। তাঁকে বললেন,—তোমার বাবা কোথায়? স্টোরে কী?

তোসিকো বললে. না, ঘরেই আছেন। তৈরি হচ্ছেন।

—তাঁকে একটু দরকার। একবার আসবেন কী?

পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তোসিকো চলে গেল। কথাটা ওকেই বলবেন বলে প্রথমে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু পরে ভাবলেন, ঐটুকু মেয়ে, কথাটা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে। তোসিকো অবশ্য বাবাকে গিয়ে কী বলেছিল কে জানে, ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। তারপরে আসল কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—উত্তেজিত না হয়ে, ধীর মাথায় কথাটা আমাদের চিন্তা করতে হবে,—রাসবিহারী কোনরকমে জাপানী-ইংরেজী মিশিয়ে কথাগুলো ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

শ্রীসোমা বললেন,—আমি তোয়ামাকে খবর পাঠাচ্ছি। এ-ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই। বলে, আর দাঁড়ালেন না, চিন্তিত ভঙ্গিমায় প্রস্থান করলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার একবার এলেন মিঃ সোমা। বললেন,—টোয়ামার কাছে খবর গেছে।

—কী করে পাঠালেন ?

—আমি নিজেই গেলাম।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। খুব কষ্ট দিচ্ছি। বিব্রতও করছি।

সোমা চোখ তুলে বললেন,—তুমি কী করবে ? তোমার দোষ কী ? কিন্তু গুপ্ত ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছে। দেখা যাক কী হয় !

মানুষটি খুব অল্প কথার মানুষ। বলেই আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন। স্টোরে তিনি একা, মিসেস সোমা নেই সুতরাং কাজের চাপও প্রচণ্ড।

সারাটা দিন কেটে গেল। কোনো খবর নেই গুপ্তের। পরদিন সকালে মিঃ সোমা এলেন, বললেন, তোয়ামার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে না।

—আশা করি পুলিশের হাতে পড়েনি !

—বোধহয় না। তাহলে খবরের কাগজগুলি ছেপে দিতো।

চলে গেলেন। কিন্তু পরদিনও কোন খবর নেই। এমনি করে চার-চারটে দিন কেটে যাবার পর ঐ তোয়ামার কাছ থেকেই সংকেতবার্তা এলো মিঃ সোমার কাছে। যার অর্থ হলো, পাওয়া গেছে। চিন্তা করো না।

পরে আস্তে আস্তে আরও খবর পাওয়া গেল। সেই রাত্রে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশিদূর যেতে পারেন নি হেরম্ববাবু। কয়েকখানা বাড়ির পরেই এক খ্রীস্টান পাদ্রীর বাড়ি। কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে সন্দেহ করে টপ করে ঢুকে পড়েন পাদ্রীর বাড়ির মধ্যে। সেখানে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে মিঃ ওহকাওয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। ওহকাওয়া তখন নিখিল এশিয়া সমিতির সভাপতি। ওহকাওয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে তোয়ামার কাছে চলে যান নিজেই। বলেন হেরম্ববাবুর কথা। তোয়ামা ওঁকে অনুরোধ করলেন,—আপনি মহাপ্রাণ, ওকে রক্ষা করবেন।

—কথা দিলাম।

এবং এইভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করেও ওহ্‌কাওয়া ওঁকে লুকিয়ে রেখে ওঁর জীবন রক্ষা করলেন। এবং শুধু তা-ই নয় পরে ওঁরই চেষ্টায় হেরম্ব গুপ্ত আমেরিকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ওদিকে রাসবিহারী সারা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। উক্ত ঘটনার পর কয়েক মাস কেটে গেছে, হেরম্ব আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ যা ঘটলো, তাতে জাপান সরকারের মনোভাব শেষ পর্যন্ত বদলে গেল।

ছোট্ট একখানা জাপানী জাহাজ হংকং যাচ্ছিল। তাতে ছয়জন ভারতীয় যাত্রী ছিল, যারা নিতান্ত নিরীহ, নেহাৎ-ই রুজি-রোজগারের জন্য তারা রওনা হয়েছিল হংকং-এর পথে। কিন্তু ব্রিটিশ তখন পলাতক বিপ্লবীদের খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে! একটা ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ জলপথে ঐ জাপানী জাহাজটাকে আক্রমণ করে। তারপর ঐ ছয়জন নিরীহ যাত্রীদের ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা যখন খবরের কাগজের মাধ্যমে জাপানের মানুষ জানতে পারলো, তখন ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়লো তারা। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কাগজে তারই খবর, তারই টিকা-টিপ্পনী বেরুতে লাগলো। এইরকম সম্মিলিত চাপের ফলে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁদের নীতি পরিবর্তন করলো। এবং বিপ্লবীদের ওপর যে নির্বাসন-দণ্ড অর্পিত হয়েছিল, তা প্রায় সাড়ে চার মাস পরে জাপানী পররাষ্ট্র-দপ্তর প্রত্যাহার করে নিলেন। এ-বিষয়ে মিসেস সোমা লিখেছেন,—এতদিনে রাসবিহারী মুক্তি পেলো। ১৯১৬ সালের এপ্রিলের এক সকালবেলায় সে তার নির্জন বাস থেকে বেরিয়ে এলো। সে এবার অন্যত্র গিয়ে থাকবে, ভালো মতো, ভালো জায়গায়। আমরা কি তার যত্নআত্তি করতে পেরেছি? গুদামঘরে সে বন্দীর মতো থেকেছে, না জানি কতো কষ্ট পেয়েছে! আমার মনে আছে, সেদিন চলে যাবার আগে দোতলায় উঠে আমার ঘরে সে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের

সামুরাইরা শুভ কাজ-টাজ করার সময় এক ধরনের কিমোনো পরিধান করে। রাসবিহারীর জন্য আমরা ওইরকম একটি কিমোনো তৈরি করে রেখেছিলাম। সে সেটা প'রে আমার ঘরে এসেছিল। ছল ছল চোখে আমাকে কী বলেছিল, জানেন? বলেছিল,—মা, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি নিজের পেটের সন্তানকে হারিয়েছেন! আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো ভাষা আমার নেই!

আমার বুকের ভিতরটা যে তখন কী রকম করছিল, সে আর কী বলবো! রাসবিহারী আমাকে 'মা' বলে ডেকেছে! আমি কথা বলতে পারিনি। ওর 'মা' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে জল এসে পড়ে। কিছু বলতে পারিনি। ওর হাতে হাত রেখে শুধু চোখের জলই ফেলতে লাগলাম। তার চোখও শুকনো ছিল না। সে চলে গেল, আমি তাকে বিদায় জানাতে নীচে পর্যন্ত নামতে পারলাম না। আমার শরীর তখন আমার বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে।

শুরু হলো রাসবিহারীর আর এক জীবন। বিপদে আপদে ভরসা ঐ তোয়ামা। সুতরাং তাঁরই কাছে আগে গেলেন তিনি। কিন্তু নির্বাসন-দণ্ড উঠে গেলেও রাসবিহারী বিপদের হাত থেকে রেহাই পাননি। ব্রিটিশ দূতাবাস গোয়েন্দা নিযুক্ত করে তাঁর পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে। যেখানেই যান, গোয়েন্দা ঠিক পিছু নেয়। তোয়ামা ওঁকে অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু তোয়ামার ওপর গোয়েন্দাদের দৃষ্টি সর্বক্ষণ রয়েছে। কে যায়, কে আসে, সব তারা দেখছে। এ অবস্থায় ওঁর সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখাও কঠিন। এই রকম অবস্থায় ব্রিটিশ দূতাবাস মোটা টাকা দিয়ে গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করলো। ওঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই তাঁদের মতে সমীচীন। একথা জানতে পেরে তোয়ামাও খুব চিন্তিত হলেন। রাসবিহারী অবশ্য ছদ্মবেশ ধারণে পটু, কিন্তু তবুও ওঁর সঙ্গে একজন রক্ষী সব সময় থাকা প্রয়োজন। এমনও হয়েছে, মিঃ সোমা নিজে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেখানে যাবার, সেখানে নিয়ে গেছেন। একজন লিখে গেছেন,—

'এর পর ন'বছরের মধ্যে সতেরো বার রাসবিহারীকে বাসস্থান বদ্‌লাতে হয়েছিল।'

কিন্তু মিঃ সোমার কথাটাও ভাববার। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর অদ্ভুত মায়া পড়ে গিয়েছিল রাসবিহারীর ওপর। যে-ভাবে পিছনে গুণ্ডা লেগেছে, ওকে না সুবিধা মতো পেয়ে শেষ করে ফেলে, এই দুর্ভাবনাই ওঁদের হতো বেশি। রাসবিহারীর সঙ্গে মিঃ সোমাও ছদ্মবেশ ধরে পাশে পাশে ঘুরতেন। কিন্তু এ-রকম ঘোরাঘুরিও তো বিপজ্জনক! তার ওপর রাসবিহারী যখন শুনলেন, বিশ্বকবি আসছেন. তখন, আর তাঁকে ঠেকায় কে? কিমুরার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বললেন,—কবির সঙ্গে দেখা করবো।

কিমুরা বললেন,—সর্বনাশ! চারদিকে লোকজন থাকবে, পুলিশের বড়োকর্তারা থাকবে, যদি ধরা পড়ে যান? বিশেষ করে ব্রিটিশের চর বা গুণ্ডারা আপনি যেতে পারেন ভেবে ওর আশে-পাশে নিশ্চয়ই থাকবে। তখন?

রাসবিহারী ভেবে দেখলেন, কথাটা ঠিক। তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। ছোট্ট একটি কাগজে বাংলায় লিখলেন, আমি এখানে আছি। ভালই আছি। লিখে নিজের নামটা পুরো সই করলেন। তারপর দিলেন কিমুরার হাতে। বললেন আপনি তো দো-ভাষীর কাজ করবেন? এটি সুযোগমতো ওর হাতে গুঁজে দেবেন।

কিমুরা কাগজের টুক্‌রোটা নিয়ে সযত্নে পকেটে রাখলেন, বললেন—ঠিক আছে। কিন্তু দোহাই আপনার, কখনই দেখা নেবার ঝুঁকি নেবেন না।

—ঠিক আছে,—বলে মাথা নেড়ে রাসবিহারী বিষণ্ণ মুখে প্রস্থান করলেন।

রবীন্দ্রনাথ কোবে-বন্দরে এসে ভিড়লেন ২৯ মে তারিখে তোসামারু জাহাজে। শিল্পী টাইক্কান, কাওয়াগুবি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট জাপানী তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভারতবাসীও অনেকে

ছিলেন। আর ছিল সাধারণ বেশে পুলিশের লোক ইত্যাদি। কিমুরা রাসবিহারীর লেখা কাগজটা এখানেই কবির হাতে তুলে দিতে ভরসা পেলেন না।

কোবে থেকে রবীন্দ্রনাথ যান ওসাকায়, সেখান থেকে টোকিওতে। এখানে শিল্পী টাইক্কানের বাড়িতে ছিলেন। টোকিওতে অভাবনীয় সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন কবি। এবং টাইকানের বাড়িতেই কিমুরা তার হাতে রাসবিহারীর চিঠিটা তুলে দেন।

ওটা পড়ে কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিমুরার চোখের দিকে তাকালেন তিনি, মুখে কিছু বললেন না। কিমুরা সতর্কতা অবলম্বন করবার জন্য বললেন,—কাগজটা আমায় দিন।

ওটা ফিরিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রাখলেন কিমুরা। নিচু গলায় বাংলায় বললেন, দেখা করবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু আমরাই ঠেকিয়ে রেখেছি। আপনার চারপাশে লোক, যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারেন।

কবি এবারও কিছু বললেন না। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

কবি জাপানে ছিলেন তিন মাস। তাঁকে নিয়ে অভ্যর্থনার ঘটা ইত্যাদি একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল রাসবিহারীর পক্ষে। গুপ্তচরের দল, রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ঘুরতো। তারা জানে রাসবিহারী আসবেই একদিন না একদিন। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। রাসবিহারী পরে বলেছিলেন,—একটি জনসভায় দূর থেকে তাঁকে একটি বারের জন্য না দেখে পারিনি, কিন্তু কাছে যাইনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে গিয়েছিলেন পিয়ারসন সাহেব। এই পিয়ারসনের সঙ্গে টোকিওতেই হঠাৎ আলাপ হয়ে যায় পল রিসার নামে এক ফরাসী ভাবুকের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে পিয়ারসন এতো মুগ্ধ হন, যে তাঁকে নিয়ে এসে কবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এই পল রিশার এবং তাঁর স্ত্রী মীরা রিশার পরে এক সময় ছিলেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে, 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদনা

করতেন। তারপর রিশার চলে যান, শ্রীমতী মীরা থেকে যান। এই 'মীরা' শ্রীমা নামে কালক্রমে খ্যাতনামা হয়েছিলেন।

কিন্তু এদের কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছি। আবার আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯১৬তে। রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে গেলেন আমেরিকায়, আর ওদিকে নরেন ভট্টাচার্য, যিনি পরে এম-এন- রায় নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি পালিয়ে চলে আসেন বাটাভিয়া অঞ্চল থেকে গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জাপানে, একেবারে টোকিওতে। এবং কী ভাবে যে খবরাখবর করতে করতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে ফেললেন, সে-ও এক ইতিহাস।

কিন্তু তার আগে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য। যিনি পরে এম-এন-রায় নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্ম্মানরা ইংরেজদের ঘায়েল করবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্য যে এগিয়ে এসেছিলেন সন্দেহ নেই। আমেরিকার গদর পার্টি, আর জার্মানীর বার্লিন কমিটি একযোগে কাজ করতে থাকে। আমেরিকার সান্‌ফ্রানসিস্কোর গদর দলের কেন্দ্র ছিল ব্যাঙ্ককে। এই কেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়েছিল মূলতঃ শিখদের উপর। আর অপর কেন্দ্রটি ছিল বাটাভিয়ায়, এদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বাংলার বিপ্লবীদের। বলা কর্তব্য, সাংহাইয়ের জার্ম্মাণ কন্‌সাল জেনারেলের ওপর ভার ছিল এই দুই কেন্দ্রের। ইনি কাজ করতেন আমেরিকার ওয়াশিংটনের জার্মাণ দূতাবাসের নির্দেশে। আবার এই দূতাবাসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন জার্ম্মাণীর বার্লিন কর্তৃপক্ষ। যাই হোক, জার্ম্মাণরা যে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে প্রস্তুত, এই সংবাদ নিয়ে অনেকেই সে সময় ভারতে এসেছিল। তার মধ্যে বাঘা যতীনের সঙ্গে যার সংযোগ ছিল, সেই জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী অন্যতম। এবং এই লাহিড়ী মহাশয়ের কথামতোই যতীন মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে বাটাভিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তখন তাঁর ছদ্মনাম ছিল মিঃ

মার্টিন। মার্টিন বাটাভিয়ায় জার্মাণ দূত থিওডোর হেলফেরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে পারেন যে, ম্যাভেরিক জাহাজ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ক্যালিফোর্ণিয়ার সানপেড্রো বন্দর থেকে। যাবে করাচী।

—সে কী !—মার্টিন (অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ) সবিস্ময়ে বললেন,—এ ব্যবস্থা কে করতে বললো, করাচীতে আমাদের লোকজন নেই, সুন্দর-বনের রায়মঙ্গলে জাহাজ পাঠাও, করাচীতে নয়।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, ম্যাভেরিক এলো না। জুন শেষ হয়ে গেল, ম্যাভেরিকের তখনো উদ্দেশ নেই। ৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক থেকে কুমুদবাবু বলে একজন এসে পৌঁছলেন। তিনি জানালেন, শ্যামের জার্মাণ দূত বহু রাইফেল পাঠাচ্ছে একটি জাহাজে করে।

বিপ্লবীরা খবরটা শুনে মনে করলেন, জাহাজটা বুঝি ম্যাভেরিকের বদলে আসছে। তাই, যাতে করে জাহাজটা পরিকল্পনা মতো ঠিক জায়গায় আসে, সে-কথা হেলফেরিককে জানাবার জন্য ঐ কুমুদাবুকেই আবার ফিরে পাঠানো হল বাটাভিয়ায়। কিন্তু ঐ জুলাই মাসেই ব্রিটিশ সরকার সব জানতে পেরে সতর্ক হয়ে যায়। কলকাতায় হরি কুমার চক্রবর্তীর তত্বাবধানে যে ভুয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি খুলেছিলেন হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স নামে, ৭ই আগষ্ট সেটিকে সার্চ করা হলো। সাংহাই থেকে জার্মাণ দূতের পাঠানো কিছু টাকা পুলিশ আটক করতেও সমর্থ হয়েছিল। ঐ হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সেরই একটি শাখা ছিল বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামে, শৈলেশ্বর বসু ও তার সঙ্গে ওখানে থাকতো একটি তরুণ, তার নাম, গোপাল। আরেকজন বিপ্লবী তখন বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন বোম্বাই অঞ্চলে। তাঁর নাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ সব জানতে পেরেছে বুঝে তিনি হেলফেরিককে জাভার ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তারপরে স্বয়ং হেলফেরিকের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য মিঃ মার্টিন (নরেন্দ্রনাথ)

আবার রওনা হয়ে গেলেন বাটাভিয়ায়। কিন্তু তাঁর খবর বেশ কিছুদিন না পাওয়ায় বাঘা যতীন ভূপতি মজুমদারকে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ফণী চক্রবর্তী। এঁরা দুজনে সিঙ্গাপুরে জাহাজের মধ্যেই গ্রেপ্তার হন, যে-কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে বালেশ্বর অঞ্চলে বাঘা যতীনের মরণপণ সংগ্রামের কথা। তাঁর মৃত্যু হয় ঐ ১৯১৫ সালেরই ৯ই সেপ্টেম্বর। ওদিকে মার্টিন বা নরেন্দ্রনাথের তখনো কোনো সংবাদ নেই। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গোয়াতে গিয়ে ২৭শে ডিসেম্বর মার্টিনের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠালেন,—'কেমন আছো? খবর নেই কেন? খুবই চিন্তিত।' আর তার নীচে লিখলেন নিজের ছদ্মনাম,—B, Chatterton.

অথচ এই টেলিগ্রামই হলো কাল। এই টেলিগ্রামের সূত্র ধরেই পুলিশ সন্ধান চালিয়ে আর একজন বাঙালী যুবকসহ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। এই ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় পুণা জেলে সপ্তাহ দুই-তিন মাত্র ছিলেন। এই জেলেই তিনি আত্মহত্যা করেন। তারিখ হচ্ছে, ২৭ জানুয়ারি, ১৯১৬।

কিন্তু যা বলছিলাম। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৮৮৭-র ২২শে মার্চ, মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার ক্ষেপুত গ্রামের ক্ষেপুতেশ্বরী দেবীর পুরোহিত বংশে। ভৈরবানন্দ ভট্টাচার্যের পুত্র দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ক্ষেপুত ছেড়ে কলকাতা থেকে প্রায় তিরিশ মাইল উত্তর পূর্বে ২৪-পরগণার আড়বেলিয়া গ্রামে বসবাস করতে আসেন। ঐ গ্রামের বিকাশিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে লাগলেন তিনি। এই আড়বেলিয়াতেই পিতা দীনবন্ধু ও মাতা বসন্তকুমারীর চতুর্থ সন্তানরূপে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কলকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে কোদালিয়া গ্রামে ছিল নরেন্দ্রনাথের মামার বাড়ি। নরেনের যখন ১১ বছর বয়স, তখন তাঁকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন দীনবন্ধু। কোদালিয়ার উত্তরের গ্রাম হরিনাভি। এই হরিনাভির অ্যাংলো-সান্সক্রিট স্কুলে ভর্তি হলেন

নরেন্দ্রনাথ। এর পরের বছর দীনবন্ধুও আড়বেলিয়ার স্কুলের কাজ ছেড়ে এই কোদালিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে নরেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন ১৯০১ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি-মিত্র তখন কলকাতায় ঋষি বঙ্কিমের আদর্শে 'অনুশীলন সমিতি' গড়েছেন। নরেন্দ্রনাথও তখন বঙ্কিমের আদর্শ মানব শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবার জন্য রামদাস বাবাজীর কাছে যেতেন। শুধু তা-ই নয়, দৈহিক ও মানসিক শক্তিলাভ করবার জন্য শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

হরিণাভি গ্রামে তখনকার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ ছেলেদের নিয়ে মিছিল করে সভায় যেতে চাইলে হেডমাস্টার তাতে বাধা দেন। আর সে বাধা না মানার জন্য তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন।

নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি, তা হলো এই যে, ১৯০৫-এ তাঁর পিতার মৃত্যু হল। ১৯০৬ সালে জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পাশ করে যাদবপুরের বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন। রসায়ন পড়ার ঝোঁক। রসায়ন পড়লে বোমা তৈরীর ফর্‌মুলা জানতে পারা যাবে, এই তাঁর আন্দাজ।

দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী নরেন্দ্রনাথ নেতা বাঘা যতীনের নির্দ্দেশে বাংলার প্রথম স্বদেশী ডাকাতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কলকাতা থেকে বারো মাইল দূরে চিংড়িপোতা রেল ষ্টেশন লুঠ করার ব্যাপারে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। অবশ্য ধরাও পড়েছিলেন। ধরা পড়েছিলেন মিষ্টির হাঁড়ি হাতে কুটুমবাড়ি গমনেচ্ছু রেলযাত্রীরূপে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে মুক্তি পান। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাগজ 'সন্ধ্যা' আর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর' আগুন ছড়াচ্ছিল'। পুলিশের চোখ এড়াতে নরেন্দ্রনাথকে এই সময় গৃহও ত্যাগ করতে হয়, পড়াও ছাড়তে হয়। আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল তাঁকে!

এরপর ১৯০৮ সালে মুজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা ও মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের ট্রেনের নীচে বোমা ফেলার ঘটনা। তারপরে কলকাতার মুরারিপুকুর বাগানে বোমা তৈরির কারখানা থেকে বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি ধৃত। শ্রীঅরবিন্দও বাদ গেলেন না। আলিপুর বোমার মামলা। ১৯০৮—৯ সালে পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড়। দেখতে দেখতে সব যেন ঠাণ্ডা, পুলিশও নিশ্চিন্ত। এই সুযোগে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে আবার ভাঙা বিপ্লবীদলকে গড়ে তোলার চেষ্টা। কিন্তু এসব কথা পরে আসবে। এখন নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা যতটুকু জানি তা বলার চেষ্টা করি।

১৯১০ সালে পুলিশ আবার সচকিত। বাছা বাছা পঞ্চাশজনকে নিয়ে হাওড়ায় ব্রিটিশরাজ-উচ্ছেদের মামলা। আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্রও একজন। ২০ মাস জেল। তারমধ্যে ৯ মাস নির্জন সেলে বাস। এই নির্জন সেলের প্রায় অন্ধকার কুঠরীতে তিন মাস থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, সেজন্য জেল-কোডে তিন মাসের বেশী কাউকে আট্‌কে রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় এ নিয়ম মানতেন না। তাই নরেন্দ্রকে ন'মাস আটকে রাখা হয়েছিল। অন্য লোক হলে পাগল হয়ে যেতো সন্দেহ নেই। কিন্তু নরেন্দ্রের মতো সেদিনকার বিপ্লবীরা যোগাভ্যাস করতেন। তিনিও সেইভাবে এই ন-মাস কাটিয়ে দেন, মস্তিষ্কবিকৃতির কোনো লক্ষণই ছিল না। কিন্তু এ-বিষয়ে বিস্তৃত কিছু বলবার দরকার নেই, ২০ মাস পরে সংশ্লিষ্ট হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয়। যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে বিচারক সকলকেই মুক্তি দিয়েছিলেন। তখন ১৯১২ সাল। নরেন্দ্রের বয়স পঁচিশ। জেল থেকে বেরিয়ে কিছুদিন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে কাটালেন। দেখে শুনে পুলিশের ধারণা হলো, বুঝি বা উনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। কিন্তু তা নয়, 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে ওর যোগাযাগ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের যে ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল, তিনি ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালে দু-দুবার

ওসব জায়গা ঘুরে এসেছিলেন। এইরকম যখন পারিস্থিতি, তখন একদিন তাঁর কলকাতার বাসায় হঠাৎ চার্লস টেগার্ট সাহেব এসে উপস্থিত। টেগার্ট ঘর খানাতল্লাশী করলেন, কিন্তু নরেন্দ্রের সামনেই টেবিলের ওপর একটি পিস্তল যে একটা ওল্টানো বই ঢাকা-দেওয়া অবস্থায় পড়ে ছিল, সেটা অমন কুশলী ও সদা সতর্ক টেগার্ট সাহেবও ভাবতে পারেন নি।

এর পরে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হচ্ছে উত্তর ভারতে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে ঘোরাঘুরি, আর তারপরে পাটনাতে কিছুকালের জন্য অবস্থান। পাটনাতে আসল কাজ ছিল বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা, কিন্তু বাইরে ছিল একটা প্রেসের কম্পোজিটারের চাকরি।

আসলে এই বিপ্লবীটির জীবনও কম রোমাঞ্চময় নয়। নানান সূত্র থেকে আমি যা জানতে পেরেছিলাম, তা এখানে বলে যাই। ওঁদের নেতা বাঘা যতীন এক সময় বলেছিলেন, সাত দিনের মধ্যে ১৫ হাজার টাকা চাই! পারবে জোগাড় করে দিতে?

নরেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ডাকাতি করে। এই ডাকাতিই গার্ডেনরীচ-ডাকাতি নামে পরিচিত হয়েছিল। এরপর ছিল বেলেঘাটার ডাকাতি। দুই ডাকাতি থেকে চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল বলে শোনা যায়। তখনকার দিনে বাঙালীর ছেলেরা যে এটা করতে পারে, পুলিশ প্রথমে তা বিশ্বাসই করতে চায়নি।

কিন্তু যা বলছিলাম। ম্যাভেরিক জাহাজের কথা বলা হয়েছে; সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় আরেকটা প্ল্যান করা হয়। উত্তর সুমাত্রার বন্দরে যে সব জাহাজ অন্তরীণ অবস্থায় ছিল সেগুলি সাধারণ বাণিজ্য জাহাজ হলেও জার্মাণরা যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা ভেবেই গোপন অস্ত্রে সজ্জিত করে রেখেছিল। যারা ছিল খালাসী, তারাও ছিল আসলে খালাসীর ছদ্মবেশে সৈনিক। প্ল্যান হয়েছিল অন্তরীণ-শিবির থেকে হঠাৎ বিদ্রোহ করে জার্মাণ-খালাসীরা ওইসব জাহাজে গিয়ে চড়ে

বসবে। তার আগে খালাসীরা জাহাজ ছেড়ে দেবার অবস্থায় তৈরী হয়ে থাকবে। ওরা গিয়ে পড়লে জাহাজ চলতে থাকবে পুরোদমে। একদল আক্রমণ করবে আন্দামান, তারপরে রেঙ্গুন, তারপরে কলকাতা। অন্য দল যাবে হাতিয়ায়। তৃতীয় দল যাবে বালেশ্বরে, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

নরেন্দ্রনাথ তখন স্থলপথে অস্ত্র আনা যায় কিনা, সে-চেষ্টার জন্য আমেরিকা যাবার নাম করে বাটাভিয়া ত্যাগ করলেন। ফিলিপাইনের মধ্য দিয়ে জাপানের দিকে রওনা হলেন সে-উদ্দেশ্যে। ভারত ত্যাগ করার সময় তাঁর নাম ছিল হেনরি মার্টিন। আর জাভা থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত গিয়েছিলেন 'হরি সিং'-এই ছদ্মনামে। ফিলিপাইনের পর জাপানের পথে নাম বদল করে হলেন মিঃ হোয়াইট্। এই নামেই জাপানের নাগাসাকি শহরে অবতরণ করেছিলেন তিনি। জাপানী গোয়েন্দা অবশ্য মিঃ হোয়াইটের পিছু নিতে ছাড়েনি। তবু পুলিশের চোখ এড়িয়ে টোকিওতে শেষ পর্যন্ত রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন। এবং তাঁরই চেষ্টায় সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ। সেই সময় অর্থাৎ ১৯১৫-র শেষের দিকে ভারত-বর্মা সীমান্তে অবস্থিত চীনের ইউনান ও জেচুয়ান প্রদেশে ওঁরই প্ররোচনায় রাজতন্ত্রী ইউয়ান সিকাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছিল। সান ইয়াৎ সেনকে নরেন্দ্র বললেন, কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিতে পারেন ওখান থেকে? সীমান্ত পার হয়ে যাতে তা' ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে এসে পৌঁছায়।

সান ইয়াৎ সেন বললেন,—টাকা দিন। মোটা টাকা। যে-টাকায় ইউয়ান সিকাইয়ের সমর্থকদের কিনতে পারা যাবে এবং যার বদলে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। চীনের জার্মাণ রাজদূতের কাছে বলে দেখুন, ডলার আদায় করা যায় কিনা।

এই ধরনের আরও কথাবার্তা। ঠিক হলো, নরেন্দ্র পিকিংয়ে যাবেন। গিয়ে জার্মাণ রাজদূতকে এই প্রস্তাব দেবেন। রাজদূত রাজী

হলে সান ইয়াৎ-সেন তাঁর লোক ইউনানে পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবেন। টাকাটা কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেনের হাতে দিতে হবে, সাংহাইতে।

কিন্তু আগেই বলেছি বোধহয়, রাসবিহারীর সঙ্গে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎকারের ঘটনা পুলিশের চোখ এড়িয়ে যায় নি। আর সদা-সতর্ক রাসবিহারীও সেটা টের পেয়ে গোপনে নরেন্দ্রের কাছে খবর পাঠালেন,—যেমন আছেন ঠিক তেমনিভাবে জাপান ত্যাগ করুন এখ্‌খুনি। এরা আপনাকে সাংহাইতে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবার ফিকির করেছে।

নরেন অন্য কোথাও তৎক্ষণাৎ না গিয়ে, ভেবেচিন্তে, পরদিন টোকিওর সব থেকে বড়ো যে দোকান, তাতে ঢুকে পড়লেন! জাপানী আদবকায়দা অনুযায়ী সবাই দরজায় জুতো ছেড়ে কাপড়ের জুতো পরে ভিতরে ঢোকে, পাছে জুতোর ধুলোয় দামি ম্যাটিং নষ্ট হয়ে যায়। নরেন্দ্র ওইভাবে ভিতরে গিয়ে আর ওই দরজায় এলেন না, নতুন জুতো কিনে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুলিশের চোখে এইভাবে ধুলো দিয়ে সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলেন। সেখান থেকে জাহাজ ঘাটা। কোরিয়ার জাহাজ ধরে সিউল। সিউল থেকে আবার জাহাজে চড়ে চীনের দাইরেন বন্দরে অবতরণ করে ট্রেন ধরে মুক্‌ডেন হয়ে একেবারে পিকিং।

কিন্তু পুলিশও নিষ্ক্রিয় ছিল না। মিঃ হোয়াইটের গতিবিধি তারা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। সেই হিসাবে পিকিংয়ের পুলিশ-প্রধান মিঃ হোয়াইটকে এসে ধরে ফেললেন। অবশ্য মিঃ হোয়াইটই যে নরেন্দ্রনাথ, সে-কথা কেউ তখন জানতে পারে নি। তাহলেও সন্দেহ যখন হয়েছে, তখন সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত হাজতবাস।

পরের দিন মিঃ হোয়াইট-রূপী নরেন্দ্রকে কনসাল জেনারেলের কোর্টে হাজির হতে হলো। বৃদ্ধ কনসাল প্রশ্ন করলেন, - জাপানে গিয়েছিলেন কেন? রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করাই বা কী জন্য?

হোয়াইট ভালোমানুষের মতো উত্তর দিলেন,—দেখুন আমি ছাত্র, ইংলণ্ডে গিয়ে পড়াশুনা করার ইচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য সেটি কিছুতেই হচ্ছে না। তাই, কী আর করি, জাপানে চলে এলাম পড়াশুনা করবো বলে। এখানে আসায় তো কোনো বাধা ছিল না? কিন্তু জাপানী ভাষা জানি না, তাই রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা করে ওর সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম। অবশ্য এখন দেখ্‌ছি সেটা ভুল হয়েছিল। জাপানী পুলিশ পিছু নিয়েছিল। আমি তাতে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি জাপান ত্যাগ করে দেশে ফিরে আসতে চাইলাম। কিন্তু এতদূর এসে চীন দেখবো না? তাই ভাবলাম, এলাম যখন, চীনের দুটো-একটা শহর দেখে যাই। এই হলো ব্যাপার। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি!

বৃদ্ধ তখন পুলিশ-প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলেন,—জাপান থেকে এর সম্বন্ধে আর কোনো খবর পেয়েছে?

পুলিশ-প্রধান উত্তর দিলেন,—তা পাইনি বটে, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে বলে আশা করছি।

বৃদ্ধ বললেন, কিন্তু তা বলে এঁকে তুমি অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রাখতে পারো না! বলে, বৃদ্ধ রায় দিলেন,—পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে আসামীকে আপাতত দেওয়া মুক্তি হলো। কোর্টের বাইরে এসে পুলিশ-সাহেব রেগে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললে,—দি ওল্ড ফুল! তারপরে নরেন্দ্রকে বললে,—কোথায় যাবে, এখন?

এখন?—নরেন্দ্র গম্ভীর গলার উত্তর দিলে,—ভালো একটা হোটেলে।

পুলিশের কর্তা মুচকি একটু হেসে বললেন,—একটি আছে ভালো হোটেল, কিন্তু সেটি ব্রিটিশ এলাকায়।

নরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,—সেটাই ত আমার পক্ষে ভালো, কারণ, আমি ব্রিটিশেরই প্রজা।

এবং নির্দ্বিধায় উঠলেন গিয়ে উক্ত হোটেলে, যার নাম অ্যাস্টোরিয়া

হোটেল। হোটেলে বসে শহরের একটা ম্যাপ জোগাড় করে ভালো করে দেখে নিতে লাগলেন কোথায় কী আছে। বিকেল হয়ে গেলে একটা রিক্সা চড়ে বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেড়াতে চললেন চীন এলাকার মধ্য দিয়ে। একটু দূরেই ছোট একটা নদী, তার ওপারে জার্মাণ এলাকা। তখনকার চীন ও তার রাজধানীতে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিদের জন্য extra territorial right অর্থাৎ যাকে বলে 'সংরক্ষিত এলাকা' তা-ই ছিল। তারা যার যার এলাকায় নিজেদের আইন কানুন মোতাবেক চলতো, সেখানে চীনের কর্তৃত্ব চলতো না।

যাই হোক, নরেন্দ্র রিক্সায় করে এগিয়ে চলতে চলতেই লক্ষ্য করলেন, তাঁর পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে ; দুটি রিক্সাতে চারজন গোয়েন্দা তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। নরেন্দ্র বেশ খানিকক্ষণ রিক্সা করে ঘুরলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নরেন্দ্র সুবিধামতো ওই ছোট্ট নদীটার ধারে একটা বড়ো দোকানে ঢুকে আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দিতে লাগলেন জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে। গোয়েন্দা চারজন অগত্যা আর কী করে, দোকানটার ঠিক বিপরীত দিকে একটা চায়ের দোকান ছিল, তাতে ঢুকে গেল চা-টা খাবার জন্য। আর ঠিক সেই সুযোগে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নরেন্দ্র চট করে একটা গলির ভিতর ঢুকে গেলেন। কাছেই নদী, খেয়া নৌকোও পারে ছিল। সেই খেয়ায় চড়ে দেখতে দেখতেই তিনি ওপারে চলে গেলেন, জার্মাণ এলাকায়। এবং পরদিন সকালেই দেখা করলেন জার্মাণ রাজদূতের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি সব আলোচনাই হয়েছিল। সান ইয়াৎ সেনের কথামতো অর্থ-মঞ্জুরের প্রার্থনাও তাকে জানালেন নরেন্দ্রনাথ। জার্মাণ দূত শুনে বললেন,—কিন্তু তোমাদের মৌখিক চুক্তিতে যে গলদ রয়েছে। সান ইয়াৎ সেন রইলেন জাপানে, আর যাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র, তিনি রইলেন ইউনানে,—কী গ্যারান্টি আছে যে, জাপানে বসে তিনি টাকা পেলে ইউনানের ব্যক্তিটি সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দেবে?

নরেন্দ্রকে ভাবিয়ে তুললো কথাটা। প্রস্তাবের গলদও তার চোখে পড়লো। কিন্তু তবু তিনি হতাশ হলেন না। করলেন আরও একটা দুঃসাহসিক কাজ। চীনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চললেন ইউনান প্রদেশের সেই নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, পদে পদে চরম বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা করলেন। দেখা করে, সব ঠিকঠাক করে আবার ফিরে এলেন পিকিংয়ে। ইতিমধ্যে একটা সুবিধাও হয়ে যায়। চীনা রাজসিংহাসনের দাবীদার ইউয়ান সিকাই হঠাৎ মারা যায়। ফলে জয় হয় বিপ্লবীদেরই। ফলে, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার পথ নরেন্দ্রর পক্ষে সুগম হয়ে ওঠে। তিনি এবার পাকা কাজ করে নিলেন প্রথমে। হ্যাঙ্কাওয়ের জার্মাণ দূতের সামনেই লিখিত চুক্তি করলেন ইউনান প্রদেশের নেতার প্রতিনিধির সঙ্গে। চুক্তি মতো অস্ত্রশস্ত্র যাবে ভারত সীমান্তে, সদিয়ার পাহাড়ী পথের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু এতদূর এগিয়েও শেষ পর্যন্ত সব জিনিসটা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। জার্মাণ কন্‌সাল জেনারেল পিছিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, এতো বড়ো ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। আপনি বরং বার্লিন চলে যান। সেখানে গিয়ে স্বয়ং সম্রাট ও তার জেনারেল স্টাফের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করুন।

অবশ্য জার্মাণ রাজদূত কন হিনৎসে নরেন্দ্রকে আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা যে করে দিয়েছিলেন, এ-কথা মানতেই হয়। আমেরিকায় গিয়ে জার্মাণ রাজদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওখান থেকে বার্লিন চলে যাওয়াই সুবিধা জনক এবং তা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমেরিকা যাওয়াই কি তখন সহজ ছিল ? নরেন্দ্রর আইন মোতাবেক পাশপোর্ট কোথায় ? তার ওপরে আমেরিকার ইমিগ্রেশন আইন যা হয়েছে, তাতে করে এশিয়াবাসীদের পক্ষে সেখানে যাওয়া আর সহজসাধ্য ছিল না। তাই ব্যবস্থা হলো, নরেন্দ্র একটা আমেরিকান বাণিজ্য-জাহাজে লুকিয়ে থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পার হবেন। সাংহাই যদিও প্রচণ্ড বিপদশঙ্কুল তার পক্ষে, তবু উপায় নেই, সেখানে তাকে যেতেই হবে।

অতএব ব্যবস্থা মতো পিকিং থেকে রেলে উঠে প্রথম গেলেন হ্যাঙ্কাও। ইয়াংসি নদীতে একটা স্টীমার ধরে পৌঁছলেন নান্‌কিং। তারপরে নানকিং ও পুকাও-র মাঝামাঝি নদীর ওপরেই একটা জার্মাণ গানবোটে গিয়ে উঠলেন। এই বোটেই দেখা হয়ে গেল গদর পার্টির সেই ভাই ভগবান সিংয়ের সঙ্গে। তিনিও আমেরিকা যাবার চেষ্টা করছিলেন তখন। বর্মায় ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যেই তখন ও-অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন ভাই ভগবান সিং। দুই বিপ্লবীতে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ চীনদেশের ঐ নদীর বুকে, ঠিক যেমনভাবে ভগবান সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল রাসবিহারী বসুর, সাংহাইতে।

কিন্তু সে যাই হোক, যতদিন না তাদের নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্য সাংহাই থেকে লোক আসছে, ততদিন ঐ গানবোটেই কাটাতে হলো। শেষ পর্যন্ত একদিন রাত্রিবেলা, অন্ধকারে আত্মগোপন করে চুপিচুপি সাংহাইয়ের জাহাজে উঠে পড়লেন দুজনে। জাহাজটা ছাড়বো ছাড়বো করছে, এমন সময় ব্রিটিশ পুলিশ এলো খানাতল্লাসী করতে। তখন আর কী করা যায়? জাহাজের পাটাতনের স্ক্রু খুলে পাটাতন ফাঁক করে ওঁদের দুজনকে জাহাজের এক ট্যাঙ্কের মধ্যে ভরে দিয়ে আবার স্ক্রু এঁটে দেওয়া হলো। কয়েক ঘণ্টা এভাবে ঠায় বসে ওঁদের সময় কাটাতে হলো। কথা নয়, বার্তা নয়, একেবারে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। এই ভাবে জাহাজ যখন সমুদ্রে গিয়ে পড়লো, তখন তাদের আবার অনুরূপ ভাবে স্ক্রু খুলে বার করে আনা হলো। কিন্তু কিছু পরে আবার তাদের ট্যাঙ্কের মধ্যে গিয়ে বন্দী হতে হলো। একটা টহলদারী ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ওঁদের জাহাজটাকে থামিয়ে দিয়েছে, আর একবার খানাতল্লাসি করবে। ওঁরা দুজনে ট্যাঙ্কের মধ্যে বসে মাথার ওপরকার পাটাতনে বুটের আঘাত শুনতে পাচ্ছিলেন। তারা গালাগালি দিচ্ছিল। বলছিল,—এই জাহাজেই তারা যাচ্ছে, আমি খবর পেয়েছি। কিন্তু কোথায় কর্পূরের মতো উবে গেল দুজনে?

খালাসীদের আলাদা আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে জেরা করেও তারা কোনো হদিশ বার করতে পারলো না। তারপরে আবার বিড়বিড় করতে করতে শেষ পর্যন্ত নেমে গেল জাহাজ থেকে। জাহাজ আবার চললো, ওরা দুজনেও মুক্তি পেলেন। এমনি করে করে জাহাজ এসে লাগলো জাপানের কোবে বন্দরে। নরেন্দ্র এখানে তার পরিকল্পনা আবার বদ্‌লালেন, এমন কি ভাই ভগবান সিংকেও তা জানতে দিলেন না। চুপি চুপি কোবেতে নেমে পড়লেন। ট্রেনে করে সোজা চলে গেলেন টোকিওতে। চীন থেকে আসার সময় জার্মাণ দূত একটা ফ্রেঞ্চ-ইণ্ডিয়ান পাশপোর্ট দিয়েছিল নরেন্দ্রকে। পণ্ডিচেরীর অধিবাসী জনৈক সি-মার্টিনকে এই পাশপোর্ট দিয়েছিল ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্যারিসে গিয়ে ধর্মশাস্ত্র পড়বার জন্য। কিন্তু এই পাশপোর্ট নিয়ে চলতে গেলে আমেরিকান ভিসার প্রয়োজন। সেটা পাওয়া যাবে কী করে? সেজন্যই নরেন্দ্র তার প্ল্যান বদলে নিয়েছিলেন। পুরো খৃষ্টান-পাদ্রীর ছদ্মবেশে, একটি সোনার ক্রশ কিনে কোর্টের ল্যাপেলে ঝুলিয়ে সোজা হাজির হলেন গিয়ে আমেরিকার দূতাবাসে।

—কী চাই?

নরেন্দ্র বললেন,—প্যারিসে যেতে চাই থিয়োলজি পড়তে। আগামী সেসনেই ভর্তি না হলে চলবে না। অথচ সময় বেশি হাতে নেই। সেজন্য আমেরিকার মধ্য দিয়ে আটলান্টিক পার হয়ে প্যারিস যাবার ভিসা চাই। দয়া করে ব্যবস্থা করে দেবেন?

ওঁর কথাবার্তায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই। জনৈক আমেরিকান যুবতী ভিসা ইত্যাদি করিয়ে আনলেন তৎপর হয়ে। নরেন্দ্র আবার একটা দোকানে ঢুকে মরক্কো চামড়ার বাঁধাই একখানা খুব দামী আর সুদৃশ্য বাইবেল কিনলেন। ফাদার মার্টিনের ছদ্মবেশ সম্পূর্ণাঙ্গ হলো। তারপরে প্রথম শ্রেণীর একখানা টিকিট কিনলেন জাহাজের। দু-দিন পরেই একখানা জাপানী জাহাজ ছাড়ছে, আমেরিকা যাবে। কিন্তু রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া যায় কী করে? কোনো এক

সূত্র ধরে গেলেন তার ডেরায়। কিন্তু সে-ডেরা আবার পাল্‌টেছেন রাসবিহারী। অতি গোপনে তোয়ামার সঙ্গে লোক মারফৎ যোগাযোগ করে খবর আনলেন নতুন ডেরার। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করবার জন্য তখুনি গেলেন না, গেলেন মধ্য রাত্রে। রাসবিহারী বেশে-বাসে হাবে-ভাবে একেবারে জাপানী বনে বসে আছেন। দুজনের মধ্যে ভবিষ্যতের প্ল্যান নিয়ে অনেক কথা হলো। হবার পর বিদায় নিলেন নরেন্দ্রনাথ। যথাসময়ে ইয়োকোহামাতে গিয়ে জাহাজে চড়লেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে গিয়ে যখন নামলেন, তখন গ্রীষ্মকাল, ১৯১৬ সাল।

এই প্রসঙ্গেই রাসবিহারীর কথায় আসা যেতো, কারণ, পুরোনো কথা শেষ করে আমরা রাসবিহারী সম্পর্কে যে সময়ের কথা বলছিলাম, সে-সময়ে এসে পড়েছি। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে নরেন্দ্রর কথা খানিকটা বলা দরকার। নরেন্দ্র আমেরিকায় পা দিয়ে দেখলেন, জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্বপক্ষে ওখানকার জনমত প্রবল হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন কাগজ খুলে দেখলেন, তার আমেরিকা-আগমন পুলিশের মনোযোগ এড়িয়ে যায়নি। ফাদার মার্টিন যে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, এটা না জানলেও তিনি যে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমেরিকা চলে এসেছেন এ খবর তারা যে-করেই হোক পেয়ে গেছে। কাগজে-কাগজে তাই ফলাও খবর : Mysterious Alien reaches America. Famous Brahmin Revolutionary or Dangerous German Spy.

এই খবর যখন তাঁর চোখে পড়লো, তখন তিনি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠলেন। গেলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-শহর পালো আল্টোতে। এখানে তখন থাকতেন ওঁদের সহযোগী বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁকে খুঁজে বার করে নিজের পরিচয় দিলেন। বসলেন গিয়ে কোনো নিভৃতে।

ধনগোপালবাবু বললেন,—শীগ্‌গির নাম বদলান।

কী নাম নেওয়া যায়, কী নাম নেওয়া যায়,—ভাবতে ভাবতে ধনগোপালই বার করলেন একটি নাম, মানবেন্দ্র নাথ রায়, অর্থাৎ এম–এন-রায়। এই নামেই পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর আসল নাম 'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য' চাপা পড়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির অতল তলে।

এম-এন রায় এই স্ট্যানফোর্ডেই রইলেন দুই মাস। এর মধ্যে একজন বিদুষী মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁর নাম, এভ্‌লিন ট্রেন্ট। উভয়ে উভয়ের সঙ্গে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এবং বিবাহও হয়। এখান থেকে সস্ত্রীক মানবেন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে জার্মাণী যাবেন, এই ছিল ইচ্ছা।

কিন্তু এম-এন রায়ের কথা পরে আরও বলা যাবে, এখন আমরা জাপানের কথাই বলি। জাপান এবং রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসু এক জায়গায় বসে থাকার লোক ছিলেন না, নানান্ ছদ্মবেশে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতেন। অবশ্য গোয়েন্দাদের চোখ এড়াবার জন্যও এটা দরকার ছিল। কারণ, সারাক্ষণ ঘরে বন্দী থাকলেও লোকের চোখে পড়ে এবং নানান্ কথাবার্তা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, রাসবিহারীর সঙ্গে কাঁহাতক দেহরক্ষী রাখা যায়? মনীষী তোয়ামা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাঙালী এই বিপ্লবীটির প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। কী করা যায় তা নিয়ে মিঃ আইজো সোমার সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু কোনো সুরাহা হলো না। মিসেস কোক্কো সোমা তখনো শয্যাগত। অথচ এভাবে ত দিন চলতে পারে না। বিদেশে, অর্থাৎ পবিত্র নিপ্পন-দেশে কি ঐ ভারতীয় যুবক আততায়ীর হাতে বেঘোরে প্রাণ দেবে? এই সব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা ঝলক দিয়ে উঠলো তোয়ামার। তিনি আবার ডেকে পাঠালেন মিঃ আইজো সোমাকে। বললেন,—একটা পথ আছে, ছেলেটাকে রক্ষা করা যায়। আর তাহলে ছেলেটির পক্ষে জাপানী-নাগরিকত্ব লাভেরও সুবিধা হয়। তাতে করে তাকে রক্ষা করার নৈতিক

দায়িত্ব এসে পড়বে খোদ জাপান সরকারের ওপর। আমি সাবরওয়ালের কাছ থেকে এই ঘটনার যা বিবরণ শুনেছিলাম, সেই মতো বলে যাচ্ছি। প্রস্তাবটা শুনে মিঃ সোমা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তিনি অভিজাত সামুরাই পরিবারের মানুষ, তিনি কী করে নিজের মেয়েকে বিদেশীর হাতে তুলে দেবেন? অর্থাৎ তোয়ামা প্রস্তাব করেছেন, কুমারী তোসিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে দেওয়া হোক, তাহলে সব রক্ষা পায়। কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে সামুরাই বংশের মেয়ের বিয়ে কল্পনা করা যায় না। সারা জাপান জুড়ে 'ছি-ছি' পড়ে যাবে, তাঁরা সমাজে প্রকৃত পক্ষে 'একঘরে' হয়ে পড়বেন। আর তাছাড়া তোসিকো বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ে, সে কি রাজী হবে? রাজী হবে কী তোসিকোর মা, সোমা নিজে তোয়ামাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর নির্দেশ ছিল তাঁর কাছে বেদবাক্যস্বরূপ। তাই, কোনো প্রতিবাদ না করে বাড়ি ফিরে এলেন, স্ত্রীর শয্যার পাশে বসে তাকে ধীরে ধীরে বললেন সব কথা।

মিসেস্ সোমা চমকে উঠলেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করে উঠলো। কোনক্রমে বললেন, বলছ কী! এ কী কখনো সম্ভব? আমার ওই একটি মাত্র মেয়ে। আর অমন আদরের মেয়ে! বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল।

মিঃ সোমা আর কথা না বাড়িয়ে, স্ত্রীকে শান্ত করে চলে গেলেন। কিন্তু কথাটা তোলপাড় করে বেড়াতে লাগলো শ্রীমতী সোমার মনের মধ্যে। একদিকে পরম শ্রদ্ধেয় তোয়ামার আদেশ, অন্যদিকে মেয়েকে বিসর্জন দেওয়া! তিনি এখন কী করবেন? ভেবে ভেবে অবশেষে মন স্থির করলেন। রাসবিহারীর মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কানে ঝংকার দিয়ে উঠলো তার মুখের 'মা ডাক'! সে যে আমাকে মা বলে ডেকেছে!'—বলতে-বলতে আবার দুটি চোখ ভরে উঠলো জলে। এ-কিন্তু দুঃখের অশ্রু নয়, এ অশ্রু অবারিত স্নেহের যে স্নেহ দেশ কাল মানে না। পাত্র-অপাত্র বিচার করে না!

চোখের জল মুছে তিনি স্বামীকে ডেকে আনালেন। বললেন,—রাসবিহারীকে একবার আমার কাছে হাজির করতে পারো ?

—খুব পারি। রাত্রেই সে আসবে।

এলোও তাই। একেবারে তার খাটের পাশে এসে মোড়া টেনে বসলো। সেই ব্যাকুল-করা কণ্ঠস্বর,—আমায় ডেকেছেন মা ?

ওর মাথায় হাত রেখে চুলের ওপর একটু বিলি কাটলেন, বললেন,—আচ্ছা রাসবিহারী, একটা কথা বলবে ?

—কী মা ?

—তোমার বিয়ে হয়েছিল ?

চমকে উঠলেন রাসবিহারী,—এ কথা কেন মা ?

অল্প একটু হাসলেন শ্রীমতী সোমা, বললেন,—ভারতীয়রা শুনেছি খুব অল্প বয়সে বিয়ে করে, সেজন্যই কথাটা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

রাসবিহারী মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন। তাঁর এই সময়কার মনোভাবের কথা একবার তিনি কেশোরাম সবরওয়ালকে বলেছিলেন। বলেছিলেন,—সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে আমার বাবা, আর বিমাতার মুখ ভেসে উঠেছিল। খুব ছোটবেলায়ই আমার নিজের মা মারা যায়, আমি ঠাকুমার কাছে মানুষ। কিন্তু পরে যাকে মা বলে জেনেছিলাম, তিনি আমার বিমাতা। কিন্তু বিমাতা হলেও নিজের মায়ের থেকে কোনো অংশে কম নন। কত বার বিয়ের কথা তুলেছিলেন, আমিই কান দিই নি। কিন্তু হৃদয়দৌর্বল্য আমাদের সাজে না, তাই আমার জাপানী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলাম,—না মা, না।

শ্রীমতী সোমা তখন আর রাসবিহারীকে কিছু বললেন না। রাসবিহারী চলে যাবার পর মেয়েকে কাছে ডাকলেন। বছর কুড়ি তখন বয়স। অভিজাত-বংশীয়া এই রূপসী তরুণী তখনো বিদ্যালয়ের ছাত্রী। কিন্তু উপায় নেই তোয়ামার প্রস্তাব ওকে জানাতেই হবে।

রাসবিহারীকে রক্ষা করবার আর দ্বিতীয় পথ কোথায়? মা ধীরে ধীরে মেয়েকে সব বললেন। বললেন,—আমি জানি এ-বিয়ে নয়, আত্মবিসর্জন। সমাজ, সংসার, সবাই তোমার দিক থেকে মুখ ফেরাবে। তুমি কচি মেয়ে, রাসবিহারীর সঙ্গে তোমার বয়সের তফাৎ-ও কম নয়। কিন্তু সব জেনেশুনেই আমরা তোয়ামার এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছি। ওকে রক্ষা করতে হলে আর কোন পথ নেই।

তোসিকো এ অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপরে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকালো, বললো,—আমাকে একটু ভাববার সময় দাও মা, আমি ভেবে দেখবো!

সেইদিন থেকে, শ্রীমতী সোমা লিখে গেছেন,—'মেয়ে যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লো। মুখের হাসি আর চঞ্চলতা কোথায় মিলিয়ে গেল, দিনরাত সে যেন ভেবেই চলেছে। এবং এ-ভাবে, একদিন-দুদিন নয়, পুরো একটা মাস কেটে গেল। ওদিকে তোয়ামা খবর পাঠিয়েছেন, —কী হলো তোমাদের? কী ঠিক করলে? তাঁকেও তো একটা কিছু উত্তর দিতে হবে? কিন্তু জোর করে তো কিছু করা যায় না! মেয়ের মত না হলে আমরাই বা কী করতে পারি?'

কিন্তু আর দেরী হয়নি। তোসিকোই এসে মাকে একদিন বললো, মাগো, আমি মন স্থির করেছি। ওরই হাতে আমাকে তুলে দাও। সারা জীবন দিয়ে আমি ওঁকে রক্ষা করে চলবো।

ওর মা ওকে পরীক্ষা করবার জন্য নানান কথা উল্‌টে পাল্‌টে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কিন্তু মেয়ের সঙ্কল্প তখন স্থির।

যাই হোক, মেয়ের মন জানবার পর মা আবার ডেকে পাঠালেন রাসবিহারীকে। বললেন বিবাহের কথা। বললেন তোয়ামার নির্দেশের কথা।

রাসবিহারী, বলা বাহুল্য কিছুক্ষণ সময় নিলেন উত্তর দেবার জন্য। তারপর বললেন,—না মা, তোয়ামার আদেশ অমান্য করবার স্পর্ধা আমার নেই।

এ কথা আমরা তোয়ামাকে জানালাম। তিনি খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন,—ভয় নেই, আমি ওদের দুজনকেই রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবো।

বিবাহ দিতে হয়েছিল গোপনে। রাসবিহারীর পক্ষ থেকে কথাটা শুনেছিলেন মাত্র একজন। তিনি কেশোরাম সবরওয়াল। তিনি লিখে গেছেন,—বোসদা একদিন ঝড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে আমার ডেরায় এসে হাজির। বললেন,– বিয়ে করছি। তোমার মত কী? সব শুনে আমি ত মত দিতে দ্বিধা করিনি। কিন্তু কতই না ভালোবাসতেন আমাকে! যেন আমার মত না নিলে চলছিল না! নইলে বিপদসঙ্কুল পথ বেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অমন করে ছুটে আসতেন!

ঐ তোয়ামাই বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এক কথায়, তিনিই ছিলেন এ বিবাহের বরকর্তা, কন্যাকর্তা। শ্রীমতী সোমা লিখে গেছেন,—আমার ছেলে টিকাকোর বয়স তখন মাত্র উনিশ, তোসিকোর থেকে এক বছরের ছোট মাত্র। তাকে দিয়েই বিয়ের সব আয়োজন করলাম। তখনও আমি শয্যাশায়ী। বিয়ের জন্য দরকারী জিনিস-পত্র তার হাত দিয়েই যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলাম। শুভলগ্ন সমাগত হবার কিছু পূর্বে আমার তোসিকো আমার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল। আমি ওপরের জানালা দিয়ে ওকে যতক্ষণ দেখা যায়, দেখ্ছিলাম, দুটি চোখ বারবার জলে ভরে উঠ্ছিল। আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাও হচ্ছে নিজের বাড়িতে নয়, অন্য লোকের বাড়িতে, তাও লুকিয়ে, কোনো জাঁকজমক নয়, কিছু নয়, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবের ভীড়ও নয়! কোন্ মায়ের প্রাণে না ব্যথা লাগে?

বিয়ের পর শুরু হলো রাসবিহারী ও তোসিকোর দাম্পত্য জীবন। শ্রীমতী সোমা লিখে গেছেন,—লুকিয়ে থাকতো ওরা। বাড়ি পাল্টাচ্ছে বারবার গোয়েন্দাদের চোখ এড়াবার জন্য। এইভাবে কেটেছে ওদের দীর্ঘ আট বছর।

কিন্তু আট বছরের কথা এখন থাক। বিয়ের পরের ঘটনাই বলা দরকার। স্বামী চাইতেন বাইরে বাইরে ঘুরতে, স্ত্রী চাইতেন যতটা পারা যায় ঘরে আট্‌কে রাখতে। তোসিকো বলতো,—তোমাকে আরও ভালো করে জাপানী শিখতে হবে। আমি শেখাবো, কিন্তু আমাকে বাংলা শেখাও।

বলা বাহুল্য, অসীম আগ্রহে বাংলা শিখতে লাগলো তোসিকো। বাংলা শিখতে শিখতে এক-এক সময় স্বামীর মুখের দিকে তাকাতো, কী যেন জানবার চেষ্টা করতো ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে।

—কী দেখছো ?

তোসিকো বলতো,—তোমার সব কথা জানতে ইচ্ছা করে।

রাসবিহারী ওঁর আগ্রহে কথাগুলো না বলেও পারতেন না। বলতেন, একেবারে গোড়ার কথা। ১৮৮৬ সালে তাঁর জন্ম, সুবলদহ বলে এক অজ-পাড়াগাঁয়ে, ঠাকুর্দা কালীচরণ বসুর কুটিরের সংলগ্ন গো-শালায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ, তারই একটি জেলার নাম বর্ধমান। বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত ঐ সুবলদহ গ্রাম। তারকেশ্বর বলে একটি তীর্থক্ষেত্র আছে, সেখান থেকে বারো মাইলের কম নয়। চকদীঘি বা মসাগ্রাম থেকেও যাওয়া যায়। আমার পূর্বপুরুষরা প্রথমে বৈঁচি বলে এক গ্রামে থাকতেন, সেখান থেকে যান সিঙ্গুরে, সিঙ্গুর থেকে চলে এসেছিলেন ঐ সুবলদহে।

তোসিকো এত সব কথার খুটিনাটি না বুঝলেও আগ্রহভরে সব কিছু শুনতো। কেশোরাম পরে রাসবিহারীর কাছ থেকে শোনা কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন। তোসিকো প্রতিটি জিনিসের খুটিনাটি শুনতে চাইতো, তাকে যা-তা করে কোনো কথা বললে চলতো না।

ঠাকুর্দা কালীচরণ কাছাকাছি গ্রামগুলোর সমাজপতি ছিলেন বলা চলে। ওঁর গোশালায় যখন রাসবিহারীর জন্ম হয়, তখন তাঁর বাবা বিনোদবিহারী সুদূর সিমলায় সরকারী চাকুরিতে রত ছিলেন। সুদূর সিমলাতে চাকরী করতে গেলেন কেন, এ-সম্পর্কে একটি কাহিনী

আছে। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল সিঙ্গুরের কাছেই, পাড়েলা বলে একটি গ্রামে। শ্বশুরের নাম নবীনচন্দ্র সিংহ। ওঁরই এক ভাই বিনোদ বিহারীকে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে ভালো চাকরি করে দেন। কিন্তু একদিন শ্বশুরবাড়িতে তাঁর সাজসজ্জার পারিপাট্য লক্ষ্য করে শ্বশুরবাড়িরই কোন কুটুম্ব মহিলা একটু ঠাট্টা করেছিলেন। এই ঠাট্টার মধ্যেই শ্বশুর-বাড়ির সাহায্যে তাঁর চাকরি প্রাপ্তির ইঙ্গিত ছিল। আর যাবে কোথায়? শ্বশুরবাড়িতে সবে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, আর না বসে থেকে সোজা চলে এলেন কলকাতায়। চাকরিও ছেড়ে দিলেন। বুঝিয়ে সুঝিয়েও কেউ রাজী করাতে পারে নি। দেশে ঠিক তখনই কোনো চাকরি না পাওয়ায় চলে গেলেন সুদূর সিমলায়। সিমলায় গিয়ে অবশ্য চাকরি যোগাড় করতে পেরেছিলেন। এই তেজস্বীতা ও আত্মসম্মান-বোধ ছিল বিনোদবিহারীর বৈশিষ্ট্য।

রাসবিহারী শৈশবের কথায় আরও একজনের নাম বলতেন। তিনি হচ্ছেন বিনোদবিহারীর ছোটকাকা শ্যামাচরণ বসুর দ্বিতীয়া পত্নী বিধুমুখী। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না, তাই ভাসুরদের ছেলেমেয়েদের খুব যত্ন করতেন। সম্পর্কে ইনি রাসবিহারীর ঠাকুমা। খুড়ী-ঠাকুমা বলা যেতে পারে। এই ঠাকুমার চোখের মণি ছিলেন রাসবিহারী। ছোটবেলায় রাসবিহারী খুব দুরন্ত ছিলেন। কেউ শাসন করতে এলে কোনরকমে এই ঠাকুমার কোলে চড়তে পারলে আর ভয় ছিল না। এঁর কথা সুদূর জাপানে বসে রাসবিহারী যখন বলতেন, তখন তাঁর চোখ জলে ভরে আসতো।

ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিল রাসবিহারীর। রাসবিহারী ও তাঁর ছোট বোন সুশীলাকে রেখে ওঁদের মা ভুবনেশ্বরী চলে যান। বিনোদ বিহারী পরে আবার বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর বিনোদবিহারী চন্দননগরে বাড়ি কিনে রাসবিহারী ও সুশীলাকে স্ত্রীর কাছে রাখলেন। এখানে রাসবিহারী আর একজনের স্নেহ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁর এক মাসীমা—বামাসুন্দরী। রাসবিহারীর শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। ইনিও উত্তরকালে একজন বিপ্লবী হয়েছিলেন। এঁরই সঙ্গে রাসবিহারী পড়তেন ডুপ্লে কলেজে। যে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক চারুচন্দ্র রায়। ডুপ্লে কলেজে পড়তে পড়তে আরও যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় রাসবিহারীর, তাদের মধ্যে কানাই লাল দত্ত অন্যতম। এই কানাইলাল, শ্রীশ ঘোষ, নরেন্দ্র ঘোষকে নিয়ে চারুবাবু চন্দননগরে গোপনে এক বিপ্লব-সংহতি গড়ে তুলেছিলেন। চারুবাবুকে বিপ্লবের পথে সরাসরি টেনে এনেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। কিন্তু সে-সব কথা পরে বলা যাবে।

তোসিকা স্বামীর কাছ থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এসব কাহিনী শুনতেন। রাসবিহারী মা-মাসীদের কাছে আদরযত্ন পেয়ে খুবই একগুঁয়ে হয়ে পড়েছিলেন। ডুপ্লে কলেজে জনৈক শিক্ষকের আচরণের প্রতিবাদ করায় চারুবাবু রাসবিহারীকে ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করেন। যদিও জানতেন রাসবিহারীর অন্যায় ছিল না, সঙ্গত কারণেই তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারুণ্যের চাপল্যবশতই শিক্ষকের গায়ে দূর থেকে দোয়াতের কালি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আর সেজন্য তিনি ক্ষমা চাইতেও প্রস্তুত নন। কাজেই অন্তরে অসীম স্নেহ থাকলেও প্রশাসক হিসাবে চারুবাবুকে কঠোর হতে হয়েছিল। আবার এই চারুবাবুই কলকাতার কটন স্কুলের প্রধান শিক্ষককে চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রাসবিহারীকে ভর্তি করে নিতে। কটন কলেজের প্রধান শিক্ষক তাঁর খুব বন্ধু ছিল। ঐ আপাত তুচ্ছ ঘটনার কথাও বলতে বলতে রাসবিহারী আবেগে আপ্লুত হয়ে যেতেন, বলতেন—চারুবাবুর মতো লোক তোমরা দুটি দেখতে পাবে না। বাইরে কঠোর, ভিতরে ফুলের মত নরম। অগাধ স্নেহ ছিল, নইলে অমন করে চিঠি লিখে দেন, নিজের হাতে!

কলকাতায় ঠনঠনের বাজারের কাছে সুবলদহের কিছু লোক বাসা নিয়ে একত্রে থাকতেন। রাসবিহারী এসে এখানে উঠলেন। পড়াশুনাও চলতে লাগলো, চলতে থাকলো শরীর গঠন, আর বিপ্লবীদের সঙ্গে

রইলো যোগাযোগ। কিন্তু তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল সৈন্যদলে ঢোকার। বাঙ্গালী বলে ঢুকতে পারেন নি, তখন বাঙালীদের সেপাইদের দলে নেওয়া হতো না। রাসবিহারী নাম ভাঁড়িয়েও ঢোকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। শেষপর্যন্ত এতো বিরক্ত হয়ে উঠলেন যে, পড়াশুনাই ছেড়ে দিলেন। অমন মেধাবী ছাত্র, আর দু-এক বছর পড়লেই পাশ করে বেরুতে পারতেন। কিন্তু কী হবে পড়ে? এই প্রশ্ন মনে জাগায় আর স্কুলের দিকে গেলেন না, চলে এলেন বাড়ীতে। বিনোদবিহারী খবর পেয়ে চন্দননগরে এলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে না পেরে রাসবিহারীকে নিয়ে সপরিবারে সিমলা চলে গেলেন। এই সিমলাতেই বিনোদবিহারী রাসবিহারীকে সরকারী প্রেসে চাকরি করে দিলেন। রাসবিহারী হলেন কপি-হোল্ডার। এই সুযোগে মেধাবী রাসবিহারী ইংরেজী শিখলেন খুব ভালো করে। আর নিজের গরজে টাইপ করাও শিখে নিলেন। শুধু তাই নয়, সিমলার সঙ্গীত সমিতিতে যোগ দিয়ে গানবাজনাও শিখতে লাগলেন। ধ্রুপদ সঙ্গীত ও বেহালায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তিনি। শুধু কি তাই? ওখানকার নাট্যাভিনয়েও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। কখনো-কখনো এসব কথাও বলতেন কেশোরামকে। বলতেন,—চন্দ্রশেখরে 'লরেন্স ফস্টর' করেছিলুম। খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। সবাই বললে, অভিনয়-চর্চা করলে আমি নাকি রাধিকানন্দর মতো হতে পারতুম! রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় তখন সিমলায় চাকরি করতেন, খুব ভালো অভিনয় করতেন।

এ-ছাড়া বাবার দেখাদেখি রাসবিহারী খবরের কাগজে-টাগজে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করতেন। এই কাজে তাঁর এক সহকর্মীও তখন উদ্যোগী ছিলেন। তিনি হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কে-সি-রায়। কিন্তু লেখার উৎসাহে দুই বন্ধু এমন একটা কাজ করে বসলেন যে বিনোদবাবুকে বিশেষ বিব্রত হতে হয়েছিল। সরকারী ছাপাখানায় তখন খুব গোপনীয় কিছু নথিপত্র ছাপা হচ্ছিল। এর থেকে কোনো

একটা গোপনীয় বিষয় হঠাৎ খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। হৈ-হৈ কাণ্ড। কিন্তু কে যে একাজ করলো কেউ জানতে পারলো না। কিন্তু বিনোদবিহারী বুঝলেন, আসল ব্যাপারটা কী। তিনি কয়েকটা ব্যাপারে ছেলের ওপর আগেই বিরক্ত হয়েছিলেন, এবার একেবারে রাগে ফেটে পড়লেন। ছেলেকে বকলেন তো খুবই, তারপরে বললেন, এখুনি ইস্তফা দাও।

এইভাবে চাকরিটা ছাড়তে বাধ্য হলেন রাসবিহারী। পিতাপুত্রে তখন মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। মাঝখানে মা পড়লেন বিপদে। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে পুত্র। দুজনকে দু'ভাবে বুঝিয়েও কিছু সুরাহা করা গেল না। এরকম অবস্থায় হঠাৎ রাসবিহারী একদিন বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন। মা কেঁদেকেটে বিছানা নিলেন, দিন যায়, তবু রাসবিহারীর সন্ধান নেই। একদিন ছোট্ট একটা চিঠি এলো বাবার নামে,—বাবা আমি ভালো আছি। মাকে ভাবতে বারণ করো।

চিঠি পেয়ে মা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেও একেবারে নির্ভাবনা হলেন না। বিমাতা হলেও মায়ের থেকে কম ছিলেন না তিনি। কিন্তু বহুদিন পার হয়ে গেল, রাসবিহারীর আর কোনো খোঁজ-খবর নেই। বিনোদবিহারী কী একটা কাজে ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন, কাল্কা ষ্টেশনে হঠাৎ এক পাঞ্জাবী যুবক তাঁর কামরায় উঠে ঠিক সামনাসামনি বসলেন। ট্রেন চলতে শুরু করলো। যুবক মৃদু মৃদু হাসছিলেন ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। বিনোদবিহারী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি আমাকে চেনেন?

যুবক তখন উঠে এসে ওঁকে প্রণাম করলো, পরিষ্কার বাংলায় বললো,—আমি রাসবিহারী, চিনতে পারেন নি আমাকে?

বিনোদবিহারী দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। তার পরে প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কাটবার পর ছেলেকে বললেন,—ওরে, তোর মা যে তোর জন্য বিছানা নিয়েছে! একবার দেখা দিবি চল্।

রাসবিহারী বললেন, ঠিক আছে। সময়মতো ঠিক দেখা করবো তা' তিনি কথা রেখেছিলেন। ছ-মাস পরে একদিন রাত্রে এসে হাজির মায়ের কাছে। মা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। আর তখনি সবাই জানলো, রাসবিহারী কসৌলীর পাস্তুর ইন্সটিটিউটে চাকরি করছিলেন। অবশ্য এখানে বেশিদিন তিনি থাকেন নি। চলে গেলেন ডেরাডুনে। সেখানে বন বিভাগের দপ্তরে কেরানীর চাকরি নিয়েছিলেন। এবং এই ডেরাডুন থেকেই তাঁর কর্ম্মস্রোত অন্য দিকে সবেগে প্রবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু সে-সব কথা এখন নয়, পরে যথাসময়ে বলা যাবে।

জাপানে, তোসিকো স্বামীকে বলতেন, আমি আরও শুনতে চাই। তোমার দেশের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সব কথা।

রাসবিহারী ওঁর আগ্রহ দেখে না বলে পারতেন না। কিন্তু এক দিনেই তিনি সবটা বলেন নি, ধীরে ধীরে, থেমে থেমে দিনের পর দিন ধরে তিনি বলেছিলেন।

এইখানে, আমি শ্রীসঞ্জয়, আমাকেও একটু থামতে হলো। শেফালী যা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল, তা-ও একদিনে নয়। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর দু-দিন ধরে সে আমাকে সব শুনিয়ে খাতাখানা শেষ করে ফেলেছিল। আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠেছিলাম,—আর কই?

শেফালী উত্তর দিয়েছিল,—আর তো নেই। এখানেই শেষ।

—হতেই পারে না। আপনি আরও বলে যান।

শেফালী উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখখানা কেন জানি না উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কোমল গলায় বলেছিল,—তাহলে অপেক্ষা করুন, আরও লেখা হোক। লেখা হলে শোনাবো।

এবং এরপর দাত্নু-নাতনীতে পাশের ঘরে থেকে এক নাগাড়ে সাত সাতটা দিন বসে কী করছিল জানা নেই! এর মধ্যে ডাক্তারবাবু দুবার এসে গেছেন, আমার ব্যাণ্ডেজ বদ্‌লে দিয়ে গেছেন, ওষুধও বদলে দিয়ে গেছেন। এই সাত দিনে আমি উঠে বসতে পেরেছি। শেফালীরই ব্যবস্থায় নিতাই-এর হাত দিয়ে আমার বাড়িতে বৌদির কাছে চিরকুট পাঠিয়েছি, —'ভালো আছি। একদম ভেবো না।' কিন্তু কোথায় আছি সে-কথা জানাই নি। নিতাইকেও সে-কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিলাম। বৌদি যখন ওকে জিজ্ঞাসা করলো, এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?' তখন সে শেখানো-মতো বেমালুম মিথ্যা কথা বলেছিল,—এক বাবু মোড়ের মাথায় দিয়ে বললে,—ও বাড়িতে দিয়ে আয়।

যাক, ও-দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। সাত দিন পরে শেফালী অবসর মতো আবার আমার কাছে এসে বসলো, বললো,— কী উপকারই যে করেছেন! দাতুর স্মৃতির দরজা খুলে দিয়েছেন। ডায়রী দেখছেন, বইপত্র দেখছেন, আর আমাকে গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন। এই দেখুন, মোটা খাতার একখানা খাতা ভর্তি হয়ে গেছে। নিন, পড়ুন না বসে নিজে নিজে?

না,—বলে উঠেছিলাম,—আপনার মুখে শুনবো। শুনতে খুব ভালো লাগবে।

পরিপূর্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করলো আমার চোখের ওপর, তারপরে অল্প একটু হেসে বললো, খুব নিচু গলায়,—ঠিক আছে, পড়ে শোনাতে আমারও ভালো লাগবে।

এক কথায়, এইভাবে আবার শুরু হয়েছিল আমাদের আসর। শেফালী পড়া শুরু করার আগে একটু ভূমিকা করে নিলো। বললো, —পলাশী আর বক্সার যুদ্ধেই আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল এ কথা সবাই জানে। দাতু তাঁর কাহিনী পলাশী থেকেই শুরু করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের জয় থেকেই দেশের স্বাধীনতার জ্যোতি

নিভে আসতে থাকে, বক্সারে তা পুরোপুরি নিভে যায়। পলাশীর যুদ্ধে যে নির্ভীক সেনাপতি প্রথম প্রাণ দেন, তিনি মীর মদন। সেজন্য দাদুর মতে, আমাদের প্রথম শহীদ, মীর মদন। তারপরে সিরাজের হত্যা, মীরজাফরের পর মীরকাশিমের উত্থান এবং মীরকাশিমের সঙ্গে বিহারের বক্সারে ইংরেজের তুমুল যুদ্ধ ও পরাজিত মীরকাশিমের পলায়ন,—এ সব ঘটনা অল্প বিস্তর সবারই জানা। দাদু বলেন, এর পরের শহীদ হচ্ছেন মহারাজ নন্দকুমার। কিন্তু তাঁরও আগে শহীদ হয়েছিলেন কয়েকজন। সেটা হচ্ছে ১৭৬৪ সালের কথা। পাটনায় বেতন পেতে বিলম্ব হওয়ায় সিপাইরা বিদ্রোহ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ করে তারা পাটনা ছেড়ে শত্রু পক্ষে যোগ দিতে রওনা হয়েছিল। কিন্তু মেজর মনরো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাজিত করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন পাটনা সহরে। এখানে ঐ সিপাইদের যারা নেতৃস্থানীয়, তাদের কামানের সঙ্গে বেঁধে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কথা লিখে গেছেন স্বয়ং কার্ল মার্কস। দেখবেন তাঁর বই?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম,—না। আপনি বলে যান।

শেফালী একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেছিল। বলেছিল—দাদু বলতেন, কেশোরামজীর কাছে রাসবিহারী একটি নাম খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন,—তিনি হচ্ছেন মহারাজ নন্দকুমার। এই নন্দকুমারের কথা দিয়েই দাদু তাঁর এবারকার কাহিনী শুরু করেছেন। পড়বো এবার, খাতাখানা?

—নিশ্চয়ই।

শেফালী খাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পড়তে শুরু করলো।

কতো বিনিদ্র রজনী কেটে যেতো স্বামীর মুখে এসব গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শুনতে শুনতে! কোনো প্রশ্ন করতো না, একমনে শুধু শুনে যেতো এমন দেশের কথা, যে দেশ সে কখনো চোখে দেখে নি! কিন্তু তবু ভালো লাগতো শুনতে, কারণ সে দেশ তাঁর স্বামীর দেশ!

এবং এই দেশেরই মানুষ মহারাজ নন্দকুমার। পলাশীর পর মীরজাফরকে ইংরেজরা নবাব করেছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বৃহৎ বঙ্গের। কিন্তু তিন বছর চার মাস পরেই আরও টাকার লোভে ইংরেজরা মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাই মীরকাসিমকে নবাব করে। মীরজাফর মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। প্রাক্তন নবাবের দুর্দশা দেখে নন্দকুমার তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজদের গভর্ণর তখন ভান্সিটার্ট। তিনি এ-ব্যাপার দেখে যার পর নাই রুষ্ঠ হলেন নন্দকুমারের ওপর। হেষ্টিংস তখন গভর্ণর নন, একজন কর্মচারী মাত্র। সবে মাত্র বোধ হয় গভর্ণরের কাউন্সিলের সভ্য হয়েছেন। কিন্তু সে যাক, নন্দকুমারের তখনকার কার্যকলাপ একজন যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকের মতো। তিনি ভাবলেন,— দেশে কতো শক্তিশালী লোক আছেন! এরা যদি পরস্পর মিলিত হয়ে এই ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তাহলে ভারতীয়রা আবার মাথা তুলতে পারবে, নইলে কোনো আশা নেই। সে সময় বর্ধমানের মহারাজা বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। নন্দকুমার এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যোগাযোগ করলেন বিহারের কামাগার খাঁ ও মারাঠা সেনাপতি শ্রীভট্টর সঙ্গে। শোনা যায়, এই যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল পরবর্তীকালের বিপ্লবীদের মহাতীর্থ চন্দননগরে। একত্র হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই ছিল এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে বর্ধমান-রাজকে লেখা নন্দকুমারের একখানা চিঠি ইংরেজদের হাতে পড়ে যায়। ভান্সিটার্ট সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমার প্রভৃতিকে স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় রেখে দেন। কিছুদিন পরে ভান্সিটার্ট ওঁদের বাড়ির দরজার প্রহরীদের সরিয়ে নিলে নন্দকুমার বিলেতে চিঠি লিখলেন ভান্সিটার্ট প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে, তাঁদের অত্যাচার-অবিচারের কথা জানিয়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ চিঠিও ভান্সিটার্টের হাতে পড়লো। এই একটি কারণ এবং পরিস্থিতিজনিত আরও কতকগুলি কারণ অনুমান করে নিয়ে

নন্দকুমারকে আবার প্রহরীবেষ্টিত করে রাখলো ভান্সিটার্ট। সে সময় মীরকাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছিল ইংরেজের। মীরকাসিম পরাজিত হলে ইংরেজরা ১৭৬৩ সালের ৬ই জুলাই আবার মীরজাফরকেই নবাব করলেন। মীরজাফর নন্দকুমারকে মুক্ত করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে নিজের মন্ত্রীত্ব পদে বরণ করলেন। এর পরের ঘটনা হচ্ছে, মীরজাফরের মৃত্যু ও নাজিমুদ্দৌলার মসনদ লাভ। কিন্তু নাজিমুদ্দৌলার কোনো ক্ষমতাই ছিল না, ইংরেজরাই ছিল সর্বেসর্বা। তারা নন্দকুমারকে দেখতে পারতো না। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা রেজা খাঁকে তারা তুলতে লাগলো। ভান্সিটার্ট বিলেত চলে গেলেন, নন্দকুমারের নামে নানারূপ দোষারোপ করে একটি বই লিখে। গভর্ণর হয়ে ফের এলেন রবার্ট ক্লাইভ। রবার্ট ক্লাইভ নন্দ কুমারকে জানতেন, তাই ভান্সিটার্টের রিপোর্ট তাঁকে বিচলিত করলো না, নন্দকুমারও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ওদিকে নাজিমুদ্দৌলা হঠাৎ মারা গেলেন। নবাব হলেন তাঁর ভাই সইফুদ্দৌলা, ১৫ বছরের কিশোর মাত্র। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি এই রকম, আর কলকাতায় রবার্ট ক্লাইভ ভান্সিটার্টের নানারকম দুর্নীতির কথা শুনে মহারাজ নন্দকুমারকেই দিলেন তার তদন্ত করতে। তদন্ত করে দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করলেন নন্দকুমার। এই তালিকা নিয়ে ক্লাইভ চলে গেলেন বিলেতে, গভর্ণর হলেন ভেরলেস্ট সাহেব। ভেরলেস্টের পর কার্টিয়ার। এই কার্টিয়ারের সময়ই হয়েছিল কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন অনাহারে মারা যেতে লাগলো। গ্রামে গ্রামে কঙ্কালের সমারোহ, শহরে শহরে কঙ্কালের শোভাযাত্রা। সাহেব-সুবো দেখলেই পায়ের ওপর তারা লুটিয়ে পড়ছে,—আমাদের সারাজীবনের জন্য ক্রীতদাস করে নাও, মুখে দুটি অন্ন দাও। গঙ্গাবক্ষ মৃতদেহে পূর্ণ, শহরের পথে পথে মৃতদেহ। কে কার সৎকার করে? দেশের চারভাগের একভাগ লোক মারা গিয়েছিল এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে। আর ওদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনামাত্র মহম্মদ রেজা খাঁ। এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশের প্রায়

সমস্ত চাল কিনে নিয়ে চড়া দামে বিক্রি করতে লাগলেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর দেশে গিয়ে গ্রামকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। দুর্গতদের অন্নদান সেবাই ছিল তাঁর অন্যতম ব্রত। ওদিকে সইফুদ্দৌলাও মারা গেল। নবাব হলো তেরো বছরের বালক মোবারকউদ্দৌলা। আর ১৭৭২ সালের ১৩ই এপ্রিল কার্টিয়ার পদত্যাগ করলে সে জায়গায় গভর্ণর হলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। এই হেষ্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের বিবাদ ক্রমশঃ ঘোরতর হয়ে উঠলো। হেষ্টিংসে দুর্নীতির সম্পর্কে নন্দকুমার তাঁকেই গভর্ণর হিসাবে এক পত্র লিখেছিলেন। তাতে বারাণসীর চেত্ সিং-এর ব্যাপারে হেষ্টিংস যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার ইঙ্গিত আছে। আর আছে রানী ভবানীর কথা। নন্দকুমার লিখেছিলেন, ‘গভর্ণর সাহেব বাহারবন্ধ প্রভৃতি জমিদারী রাণী ভবানীর কাছ থেকে নিয়ে নিজের বেনিয়ান কান্তবাবুকে কেন দিয়েছেন, জানতে পারি কী?’ শুধু এখানেই শেষ নয়, হেষ্টিংসের ঘুষের একটি তালিকা দিতেও নির্ভীক নন্দকুমার দ্বিধা করেন নি। এবং এর ফল কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ষড়যন্ত্রের জাল ক্রমশই তাঁর বিরুদ্ধে বিস্তার করতে লাগলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। মিথ্যা জালিয়াতির মামলায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফাঁসি দিলেন। ফাঁসির আগে অবশ্য একটা বিচারের প্রহসন হয়েছিল। ১৭৭৫ সালের ৬ই মে রাত দশটার সময় নন্দকুমারকে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, কারাগারে জলটুকুও খাবেন না। ৯ই তারিখে দেখা গেল, মহারাজের জিহ্বা একেবারে শুকিয়ে গেছে, শরীর একেবারে অবসন্ন। তবুও ব্রাহ্মণের তেজ যায় নি। শেষ পর্যন্ত ১১ই মে বেলা দশটার সময় জেলের প্রাঙ্গণে আলাদা কুটির করে তাঁকে রাখা হলো, তাঁর দাস-দাসী পাচক প্রভৃতি এলো। তিনি মুখে জল দিয়ে অন্ন গ্রহণ করলেন। সেই যুগে এই অনশন-ব্রতের কথা বিশেষভাবে মনে রাখবার মতো। যা বহু পরে বহু দেশসেবক অনুসরণ করে অনুরূপভাবে অনড় রাজশক্তিকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন। যাই হোক, তথাকথিত মামলা

চলার পর ১৬ই জুন তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। মহারাজ অবিচল, আদর্শ শহীদের মতো মাথা উঁচু করে হেঁটে গিয়ে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর ফাঁসি হয়েছিল ৫ই আগষ্ট তারিখে। সারা দেশ হাহাকার করে উঠেছিল। সেদিন কলকাতায় যত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরা কেউই অন্ন গ্রহণ করেন নি। অনেকে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে নিয়ে গান রচনা করে সেই গান নৌকো বাইতে বাইতে, কিম্বা পথ হাঁটতে হাঁটতে গেয়ে উঠতো। বহুদিন পরে ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে সাধারণ মানুষ মুহ্যমান হয়ে গান গেয়েছিল, 'একবার বিদায় দাও মা ফিরে আসি',—ঠিক সেইরকম সেই ১৭৭৫ সালে সাধারণ মানুষ অন্তরের দুর্বিষহ বেদনাকে গানে রূপ দিয়েছিল,— 'নন্দকুমার রায় ছিল বাংলার অধিকারী। হেষ্টিংসসাহেব এলো জান করিবারে বারি। নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙের পানে চেয়ে। আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙি বেয়ে!'

নন্দকুমারের ফাঁসির আগেকার সময়ে যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তার কথাও একটু উল্লেখ করা দরকার। সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসীর দল সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে শাসক-শক্তিকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। ১৭৬৩ সালে ওদের প্রথম দেখা যায় বটে, কিন্তু ১৭৭২ সালেই তাদের বিদ্রোহ তীব্রতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংসই লিখে গেছেন, সন্ন্যাসীরা হঠাৎ কোনো গ্রামে এসে উপস্থিত হতো, যেন আকাশ থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা! তারা ছিল অবিশ্বাস্য রকম সাহসী এবং কুশলী। এদের কথা মনে রেখেই ঋষি বঙ্কিম লিখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'।

এই প্রসঙ্গে আরও একখানি বইয়ের নাম তাহলে করতে হয়। সেটি হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'। এ নাটক তিনি লিখেছেন ১৮৫৮ সালে। জোর করে ইংরেজ সাহেবরা গ্রামের চাষীদের বাধ্য করাতো নীল বুনতে। এতে ব্যক্তিগতভাবে তাদের হতো চরম ক্ষতি আর সমষ্টিগত ভাবে দেশের হতো খাদ্যশস্যের হানি। ধান না বুনে

যদি নীল বুনতে হয়, তাহলে এই ক্ষতি ত হবেই! ১৮৫৭ সালে হয়েছিল সর্ব ব্যাপক সিপাহী বিদ্রোহ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, কিম্বা কিছু আগে থাকতেই নীল বিদ্রোহের শুরু হয়, ১৮৬০ এর গোড়ার দিকে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের নদীয়া থেকে ফরিদপুর জেলা পর্যন্ত।

কিন্তু এই নীল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলবার আগে আরও একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। ১৮২৪ সালের অক্টোবরে বর্ম্মায় যুদ্ধে যাবার জন্য আদিষ্ট হবার পর ব্যারাকপুরের ৪৭ নম্বর বেঙ্গল দেশীয় পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল। কার্ল মার্ক্স বলেন ১৮২৬ সালেও ওখানে একবার বিদ্রোহ হয়েছিল। তবে ব্যাপকতার দিক থেকে ১৮৫৭ র সিপাহী বিদ্রোহকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের কথা বলবার আগে নীল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক। সাহেবরা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কুঠি নির্মাণ করে এই নীল চাষের ব্যবস্থা করেছিল। তাদের অধিকাংশই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। দেশীয় লোক, বিশেষ করে গরীব চাষীদের মানুষ বলেই গণ্য করতো না, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ সে অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষ্যকে বুকে নিয়ে চিরজীবী হয়ে আছে।

নীল চাষ করে নীল তৈরি শুরু করেন লুই বোনো নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক চন্দননগরের কাছে তালডাঙায়। ইংরেজদের মধ্যে প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত করেন ক্যারল ব্লুম ১৭৭৮ সালে। তখনকার দিনে পৃথিবীর নীলের চাহিদার পাঁচ ভাগের প্রায় চার ভাগই মেটাতো আমাদের বাংলাদেশ। আর তা মেটাতো আমাদেরই চাষীভাইয়েরা বুকের রক্ত দিয়ে। এই প্রসঙ্গে আসে নদীয়ার কৃষিজীবী পরিবারের মীর নিসার আলি বা তিতুমীরের কথা। বাঁশের কেল্লা তৈরি করে তীতু মীর ১৮২৯ সালে প্রথম সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন। আর এইভাবে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ—এই

তিনটি জেলায় বিপ্লবের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন তিনি, সেই ক্ষেত্রে নীলবিদ্রোহের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম বীজ যিনি রোপণ করে যান ১৮৩৯ সালে, তাঁর নাম মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নীলচাষীদের প্রতিরোধ বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ নয়, তাদের সংগঠন শক্তি বাংলার তখনকার ছোট লাটসাহেব মিঃ গ্রান্টকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছিল। অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহের পরেই এদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা আরও প্রকাশ পায়। তীতুমীরের পরেই যার নাম আগে মনে আসে, সে হচ্ছে মেঘাই সর্দার। তারপর আসে বিষ্ণু ঘোষ, পীতাম্বর সেখ এবং বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দারের নাম। এই বিশ্বনাথ সর্দারকে সেদিন 'বিশে ডাকাত' নামে অভিহিত করলেও সে ছিল গরীবের বন্ধু, সহৃদয় মানুষ। অত্যাচারীকে সে সাজা দিয়েছে গরীবদের রক্ষা করবার জন্য। ধনীর টাকা নিয়ে সে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। একসময়কার কিম্বদন্তীর নায়ক এই বিশ্বনাথ নীলকরদের যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশের নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। স্যামুয়েল ফেডি বলে এক অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে তার বাংলো থেকে হরণ করে জঙ্গলে নিয়ে এসে বিচার করে। বিচারে তার অনুচরেরা সবাই একবাক্যে সাহেবকে দেয় প্রাণদণ্ড। কিন্তু ফেডি কান্নাকাটি করে মুক্তি প্রার্থনা করে। প্রতিজ্ঞা করে, এ ঘটনার কথা কাউকে সে বলবে না। কিন্তু মিথ্যাবাদী সাহেব তার প্রতিজ্ঞা রাখে নি, ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ বিশ্বনাথ বা 'তথাকথিত' বিশে ডাকাতকে দমন করা অতো সহজ ছিল না। তাকে ধরবার জন্য বাংলা সরকার 'ব্ল্যাকওয়ার' বলে এক ইংরেজ সেনাপতিকে সৈন্যদলসহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ নদীয়ায় পোড়াগাছা বলে একটা জায়গা আছে! তার কাছে বিশে ডাকাত তার দলবল নিয়ে সাহেবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তারা পালিয়ে গিয়ে বাঁশবেড়িয়া কুঠিতে উঠে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেদিন। বিশ্বনাথ জানতে পেরে এই বাঁশবেড়িয়ার কুঠিও আক্রমণ করে। সাহেব-মেমরা কুঠির পিছন

দিককার 'কলিঙ্গা বিলে' মাথায় কালো হাঁড়ি বসিয়ে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে লুকিয়ে ছিল বলে শোনা যায়। নদীয়া জেলার নিশ্চিন্দিপুরের কুঠিও আক্রমণ করেছিল বিশ্বনাথ। সেকালে নীলকররা ওর ভয়ে কাঁপতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বনাথ একদিন অতর্কিতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা তাড়াতাড়ি এক বিচারের অভিনয় করে বিশ্বনাথকে ফাঁসি দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করে। যে মাঠে বিশ্বনাথ ও তার কয়েকজন অনুচরকে ফাঁসি দেওয়া হয়, সেই মাঠকে লোকে বলতো 'ফাঁসি তলার মাঠ'। বিশের ফাঁসির পর তার মা কাঁদতে কাঁদতে সাহেবদের কাছে গিয়ে ছেলের মৃত দেহখানা ভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু তারা তার কান্নায় কানও দেয়নি।

মেঘাই সর্দারের কথা বলেছি। তাকেও অতর্কিতে একদিন মেরে ফেলে নীলকরের লোকেরা। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যুগলমণি বা হেমাঙ্গিনী নীলকরদের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের নিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এ ছাড়া আরও দুজন বীর কৃষিজীবীর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাঁরা হলেন বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস।

এই তো হলো বাংলার নীলবিদ্রোহের মোটামুটি কাহিনী। এর সঙ্গে ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহের কথাটা না বললে বিষয়টা সম্পূর্ণ হয় না। এই বিদ্রোহের শীর্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী আর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম না করলে চলে না। ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাঁড়ে ও অন্যান্যদের নামও করা যায়। কিন্তু ঐ তিনজনকে কেন্দ্র করে যে উত্তাল প্রবাহ সেদিন প্রবাহিত হয়েছিল, তা-ই ছিল ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান নিরিখ।

'এই রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা শুনতে চাও?' —রাসবিহারী তোসিকোকে হয়ত এই রকম প্রশ্ন করেছিলেন সেদিন। তোসিকোও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন নিশ্চয়ই। রাসবিহারী স্ত্রীকে সম্ভাব্য যে-সব কথা বলেছিলেন, তা হয়ত এই:—

১৮৩৫ সালের ২৯শে নভেম্বর কাশীধামে লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্ম, ডাক নাম মনুবাঈ বা মনু। বাবার নাম মোরোপন্ত। ইনি দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের ভাই চিমাজী আপ্পার দেওয়ান ছিলেন। বাজীরাও বিঠুরে গিয়ে বাস করতে থাকলে, চিমাজী আপ্পা কাশীতে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে আসেন সপরিবারে মোরোপন্ত। লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স যখন তিন বছর মাত্র, তখন তার মা মারা যায়। তারপরে চিমাজী আপ্পাও পরলোক গমন করেন। মোরোপন্ত তখন আর কাশীতে কি করবেন? মেয়েকে নিয়ে বিঠুরে বাজীরাওয়ের কাছে চলে এলেন। এখানে বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র নানাসাহেব হয়ে উঠলেন মনুবাঈয়ের খেলার সাথী। ছোট থেকেই ঘোড়ায় চড়তে, তলোয়ার চালাতে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন মনুবাঈ। তখনকার দিনে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। তাই মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে। বিবাহের আট বছর পরে মনু বা লক্ষ্মীবাঈয়ের একটি ছেলে হয়েছিল। কিন্তু সে বাঁচেনি, মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সে মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুতে গঙ্গাধর রাও খুব কাতর হয়ে পড়েন। তারপর নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুর পূর্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করে গিয়েছিলেন, তার নাম দামোদর রাও। কিন্তু গঙ্গাধর রাওয়ের পর দামোদর রাওয়ের অধিকার ইংরেজ-বড়লাট লর্ড ড্যালহাউসি মেনে নিলেন না, ঝাঁসী অধিকার করে নিলেন। অপমানে লক্ষ্মীবাঈয়ের অন্তর ক্ষোভে, দুঃখে ও রোষে জ্বলে উঠলো। তিনি একজন ইউরোপীয় ও একজন বাঙালী উকিল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—এই দুইজনকে উপযুক্ত অর্থ ও দরখাস্ত দিয়ে বিলেতে দরবার করতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু উমেশবাবুর অক্লান্ত চেষ্টাতেও কিছু হলো না, ইংরেজরা কোনো কথা শুনলো না। ড্যালহাউসীর পর লর্ড ক্যানিং এলেন বড়লাট হয়ে। এঁর শাসনকালের এক বছর যেতে না যেতেই ভারত জুড়ে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল ১৮৫৭ সালে। এর প্রথম আরম্ভ হয়

বাংলাদেশে। এন্‌ফিল্ড রাইফেলের জন্য যে টোটা ব্যবহৃত হতো, তা বন্দুকে ভরবার সময় দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হতো। রটে গেল ঐ টোটাতে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো হয়েছে। এই থেকেই ক্রম-বর্ধমান অসন্তোষ বহ্নিমান হয়ে উঠেছিল। নতুন এই রাইফেলগুলোর সঙ্গে গ্রীজ দেওয়া টোটাগুলোও এসেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। ঐ টোটার মতো আরও টোটা তৈরি হতে লাগলো আম্বালা, শিয়ালকোট আর কলকাতার কাছেই, দমদমে। এই দমদম থেকেই শুয়োর আর গরুর চর্বির কথাটা ওঠে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমান যে তখনকার দিনে যুগপৎ উত্তেজিত হয়ে উঠবে এতে আর সন্দেহ কী? এর ওপরে মুর্শিদাবাদের কাছে বহরমপুরে সিপাইদের কাছে তাদের কর্ণেল মিচেল কঠোর ভাষায় আদেশ দিয়ে বসে,—টোটা তোমাদের ব্যবহার করতেই হবে। না করলে চীন বা বার্মায় চালান করে দেবো। সেখানে এমন কষ্ট করতে হবে যে, তোমরা কেউ বাঁচবে কিনা সন্দেহ!

এই কথায় অসন্তোষ আরও বেড়ে যায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে সিপাইরা রুখে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু ২৬শে মার্চ ব্যারাক-পুরের ঘটনাই হলো মারাত্মক। এদের মধ্যে জমাদার শালিগ্রাম সিং, ঈশ্বরী পাণ্ডে আর মঙ্গল পাণ্ডের নামই বেশি করে করতে হয়, বিশেষ করে তরুণ সিপাই মঙ্গল পাণ্ডের। ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডে একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট মেজরের ওপর গুলি চালায়। ফলে, সেনাপতিরা বেরিয়ে এসে তাকে ধরতে যায়। মঙ্গল উপায়ন্তর না দেখে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আঘাত তত গুরুতর হয়নি। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে সুস্থ করে নিয়ে তারপরে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ঐ অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যু বৃথায় যায়নি। এ দুঃসংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায়। বিদ্রোহ শুরু হয় মীরাট ও লক্ষ্ণৌ এলাকায়। তারপরে আরও ছড়িয়ে যায় নানান দিকে। সিপাইরা একযোগে স্লোগান দেয়,—'দিল্লী চলো, চলো দিল্লী।'

দিল্লীর শেষ নবাব বাহাদুর শা-কে সম্রাট বলে ঘোষণা করে তারা

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাঁতিয়া টোপী ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বিদ্রোহের আগুন ছড়াচ্ছিলেন। নানা সাহেবের প্রতিনিধি বলে নিজের পরিচয় দিতো তাঁতিয়া। বাজীরাওকে যে পেন্সন দিতো ইংরেজরা, সে পেন্সনের টাকা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী নানাসাহেবকে না দেওয়ায় তিনি বিদ্রোহে যোগদান করে অন্যতম নেতৃত্বপদে আসীন হন। এই সময় রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর। ঝাঁসীতেই থাকতেন, যদিও ঝাঁসী তখন ইংরেজ অধিকারে। ৪ঠা জুন ঝাঁসীতে সিপাইরা বিদ্রোহ করলো, এর সঙ্গে রাণীর কোনো যোগ ছিল না। তিনি বরং বিপন্ন কয়েকজন ইংরেজকে মমতাপরবশ হয়ে সাহায্যই করেছিলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীরা সাহেবদের বেপরোয়া হত্যা করতে লাগলো। করে ঝাঁসির রাজপ্রাসাদ অবরোধ করলো। রাণীর কাছ থেকে তক্ষুনি তিন লক্ষ টাকা চাই। টাকা না পেলে তারা তোপের মুখে রাজপ্রাসাদ উড়িয়ে দেবে। রাণী এতে ভয় পেয়ে পিতা মোরোপন্তকে তাদের কাছে পাঠালেন তাঁর আর্থিক দুরাবস্থার কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্য। কিন্তু তারা কোনো কথা শোনবার পাত্র তখন নয়, উল্‌টে মোরোপন্তকে বন্দী করে ফেললো। বাধ্য হয়ে রাণী তখন নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে বিদ্রোহীদের সর্দারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। এবার মোরোপন্তকে মুক্তি দিলো। দিয়ে, তারা ঝাঁসী ছেড়ে চললো দিল্লীর দিকে, মুখে বুলি—'মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহ্‌কা, অম্বল রাণী লক্ষ্মীবাঈকা!' অর্থাৎ মুলুক হচ্ছে ঈশ্বরের আর বাদশাহের, কিন্তু আমল লক্ষ্মীবাঈয়ের।

আর, এইভাবেই ঘটনাচক্রে ঝাঁসী-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্মীবাঈয়ের আবার করায়ত্ত হলো। রাজ্য পেয়েই তিনি রাজ্যের উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। প্রায় দশ মাস কাল রাণী স্বাধীনভাবে রাজ্যের প্রশাসন কার্য খুবই দক্ষতার সঙ্গে নির্বাহ করেছিলেন। অপূর্ব রূপসী এই মহিলাকে দেবীর মতো মনে হতো, কিন্তু এই দেবীর রাজ্য

আবার আক্রমণ করলো ব্রিটিশ-শক্তি, স্যার হিউরোজের অধিনায়কত্বে। বেশি বর্ণনা করে লাভ নেই, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নারী হয়েও যে সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তা অতুলনীয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ যখন জয়লাভ করলো, তখন পিতা মোরোপন্ত ও অন্যান্য সহচরী প্রভৃতিদের নিয়ে দুর্গ থেকে ইংরেজদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলেন। নিজে পরেছিলেন পুরুষের পোষাক, সঙ্গিনীরাও তাই। নিজের পিঠে পুত্র দামোদরকে রেশমী কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন। তারপরে নির্বিঘ্নে গিয়ে পৌঁছোলেন কালপিতে। সেখানে তখন তাঁতিয়া টোপীও এসে পড়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে পিতা মোরোপন্তকে ধরে ফেলে ইংরেজরা। পরে ইংরেজরা তাঁর প্রাণদণ্ড দিতেও ইতস্তত করেনি। কাল্‌পির কাছে তাঁতিয়া টোপীদের সঙ্গে স্যার হিউরোজের যুদ্ধ হলো। এতেও রাণীর রণচাতুর্য প্রশংসিত হয়। পরে তাঁতিয়া টোপী প্রভৃতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাণী গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করে দখল করে নিলেন। এটাই তখন হলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের বড়ো ঘাঁটি। হিউরোজ আবার আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধ চললো কদিন ধরে। রাণী শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন জয়ের আর আশা নেই, তখন নিরুপায় হয়ে কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে পুরুষ বেশে শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে গেলেন। একজন সঙ্গিনী মারা পড়লো। রাণী বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘোড়াটা ছিল নতুন, সে একটা খালের সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, রাণী তাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারছিলেন না, এমন সময় একজন ইংরেজ সৈনিক ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করে। তিনি প্রতি-আক্রমণ করে তাকে ভূপাতিত করেন বটে, কিন্তু নিজেও তরবারির আঘাত থেকে বাঁচতে পারেন নি। সব থেকে কাছেই যে সঙ্গিনীটি ছিল, তাকে বললেন,—আমার মৃতদেহ যেন শত্রুরা ছুঁতে না পারে, তার আগেই তোরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবি। এবং ওটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। সঙ্গিনীরা চোখের জল মুছতে মুছতে তাঁকে নিয়ে যায়

খালের ওপারে, জঙ্গলের মধ্যে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে বীরাঙ্গনা ঝাঁসীর রাণী পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, তাঁর যে সঙ্গিনীরা তখন কাছে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন, তাঁর সমবয়সী হলেও, সম্পর্কে মাসী হতেন। এই মাসীটিও ছিলেন বালবিধবা, এঁর নাম 'সুনন্দা', পরে পরিচিত হয়েছিলেন গঙ্গাবাঈ নামে। এই সুনন্দা বা গঙ্গাবাঈ রাণীর শেষকৃত্য করার পর চলে গিয়েছিলেন তাঁতিয়া টোপীর সন্ধানে. সেখান থেকে নানা সাহেবের কাছে। এই গঙ্গাবাঈয়ের কথা পরে আরও বলতে হবে। ইনিও এক মহীয়সী নারী, যার কথা বাদ দিয়ে পরবর্তীকালের সন্ত্রাসবাদের কাহিনী বলা যায় না।

সন্ত্রাসবাদের কথা বলতে গিয়ে আরও পুরানো কথা মনে পড়ে যায়। ব্রিটিশ দু'শ বছর ধরে এ-দেশে রাজত্ব করে খুব যে স্বস্তিতে ছিল তা নয়, প্রথম থেকেই নানান বাধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাংলায় সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কথা আগে বলেছি, যার সঙ্গে ভবানী পাঠক ও মহিলা নেত্রী দেবী চৌধুরাণীর নামও জড়িয়ে আছে। এই সঙ্গে ফকিরদের বিদ্রোহের কথাও যোগ করা দরকার। এদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মজনু শাহ, ১৭৭৬-৭৭ সালে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। এঁর মৃত্যুর পরে এঁর ছেলে চিরাগ আলি শা-রও নাম করা উচিত। ভবানী পাঠকদের সঙ্গে এঁদের যোগ ছিল।

আর ঐ যে বক্সার যুদ্ধের কথা বলেছিলাম, তাতে মীরকাশিমের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন হিম্মৎগিরি গোঁসাইয়ের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী। এই সূত্রে আরও একজন তৎকালীন সন্ন্যাসী-যোদ্ধার নাম করতে হয়, তিনি মধুসূদন সরস্বতী।

আর বলতে হয় বাংলার চুয়াড়-বিদ্রোহের কথা। জঙ্গল মহলের চুয়াড়, সিংভূমের হো, ছোটনাগপুরের কোল আর মুণ্ডা, মানভূমের ভূমিজ, রাজমহলের সাঁওতাল, ওড়িষ্যার খোন্দ, আসামের খাসিয়া,—এদের বিদ্রোহের কথা আদৌ অবহেলার বস্তু নয়। ১৭৬৮ সালে ধলভূমের

রাজা জগন্নাথ ধল ব্রিটিশ-শক্তিকে প্রবল প্রতিরোধ করেছিলেন। আবার ১৮৩২ সালে আদিবাসীদের আবার জাগিয়ে তুলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন আরেকটি মানুষ, তাঁর নাম গঙ্গানারায়ণ। এরপরে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথাও উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁদের নেতা বীরশা ভগবান এখনো তাঁদের কাছে চিরস্মরণীয় নাম। এইখানে বলে রাখি, পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা এইসব বিদ্রোহের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেষ্টা করতেন।

প্রসঙ্গক্রমে ওড়িষ্যার কথাও আসে। খুর্দার রাজা ১৮০৪ সালে বিদ্রোহ করেন বটে, কিন্তু তারপরে যে পাইক-বিদ্রোহ হয়, সেটাই উল্লেখের যোগ্য বেশি। এদের নেতার নাম ছিল জগবন্ধু। ১৮১৭তে ইংরেজরা খুর্দা আবার দখল করে বটে, কিন্তু পুরী তখনো বিদ্রোহীদের দখলে। অনেক কাণ্ডের পর ১৮২৫ সালে জগবন্ধু ধরা দেন। তাঁকে কটকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। খোন্দদের বিদ্রোহের সঙ্গে ডোরা বিশারী ও চক্র বিশারী, এই দুই নেতার নাম বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে।

আসামের কথাও ফেলবার নয়। অহোম রাজবংশের গোমধর কোনওয়ারকে আসামবাসীরা ১৮২৪ সালে রাজা বলে ঘোষণা করে। তাদের নেতা ছিল ধনঞ্জয় বড়গোহাই। দু-বছর পরে আরও একটি বিদ্রোহ হয়, তার সঙ্গে পিয়ালী বরফুকন ও জিউরামের নাম উল্লেখ করতে হয়, এঁদের দুজনকে ইংরেজরা ফাঁসি দিয়েছিল। এইসঙ্গে খাসিয়াদের কথাও বলতে হয়। ১৮২৯ সালের কথা। বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন তীরথ সিং। একে ধরে নিয়ে ঢাকায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। সেখানে বন্দী অবস্থাতেই তিনি মারা যান ১৮৩৪ সালে।

এই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কথাও একটু বলতে ইচ্ছা করে। ১৮৩০-৩৪ সালে বিশাখাপত্তনমের বীরভদ্র রাজা ও জগন্নাথ রাজা, কুর্গের বীররাজা, টিপু সুলতানের শ্রীরঙ্গপত্তমের পতনের পর ধোন্দজী-ওয়াগের

বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলমানদের জেহাদ ঘোষণা। এঁদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন রায়বেরিলীর সৈয়দ আমেদ। ১৮৩১ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

এর পরেই হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ, যার কথা আমি আগেই বলেছি। এই সূত্রে বাংলার কথা এসেছে, আসামের কথাও একটু বলা দরকার। ১৮৩৩-এর পর আসামের শেষ রাজা পুরন্দর সিং রাজত্ব হারালে দেওয়ান মণিরাম কলকাতায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। এঁর ফাঁসি হয় ১৮৫৮ সালে।

সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক নানাসাহেব। ইনি সাহায্যের আশায় চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণরের মাধ্যমে পরপর তিনখানি চিঠি লিখেছিলেন "রাজার রাজা সম্রাটের সম্রাট নেপোলিয়ন বাহাত্বরকে।" বিদ্রোহ ঠিক-ঠিক আরম্ভ হওয়ার আগে নানা সাহেব তাঁর পরামর্শদাতা আজিমুল্লা খাঁকে নিয়ে দিল্লী-লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে আসেন। ইংরেজরা ঠিক তখুনি কিছু না বুঝলেও তাঁদের যে সন্দেহ হয়েছিল এ-বিষয়ে ভুল নেই। দিল্লীর শেষ নবাব বাহাত্বর শাহ্‌কে বিদ্রোহীরা আবার সম্রাট বলে ঘোষণা করলেও ঐ বংশের তরুণ রাজকুমার ফিরোজ শাহ্‌ বিদ্রোহীদের সত্যিকার নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। নির্বাসিত অবস্থায় এঁর মৃত্যু হয়। এই সঙ্গে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র বেগম হজরৎ মহলেরও নাম করতে হয়। তাঁর সাহসিকতা ও তেজস্বীতা তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখে গেছে। আর একজন নেতা ছিলেন বিহারের, যাঁকে বিহারের সিংহ বলা হতো,— কুনওয়ার সিং।

তাঁতিয়া টোপীর কথা আগেই বলেছি। তাঁর প্রকৃত নাম— রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ। ছত্রপতি শিবাজীর ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ইনি গেরিলা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এঁকে শত চেষ্টা করেও ইংরেজরা ধরতে পারে নি ; শেষপর্যন্ত এক সঙ্গী বিশ্বাসঘাতকতা করে

গভীর জঙ্গলের মধ্যে এঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। দুঃসাহসী এই বীর, ফাঁসির মঞ্চে উঠে নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় টেনে নিয়েছিলেন।

সম্রাট বাহাদুর শা যখন বিদ্রোহের নেতৃত্বের মুকুট মাথায় পরেছিলেন তখন তাঁর বয়স আশী বছরেরও বেশী। এঁর চোখের সামনে এঁর ছেলেদের গুলি করে মেরেছিল ইংরেজরা। আর এঁকে এঁর বেগমের সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল বর্মাদেশে, এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পরে রইল নানাসাহেবের কথা। ইনি নেপাল অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে স্বস্তি ছিল না। নেপাল সরকার তখন ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সেজন্য ইংরেজরা ওঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য বারবার নেপাল সরকারকে লেখে। নেপাল সরকার তখন লোকজন-সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে ওঁকে ধরবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখনো সফল হতে পারে নি। পরে, ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়—নানাসাহেব যদি আর গোলমাল না করেন, তাহলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে, তিনি দেশে ফিরে এসে কোথাও শান্তভাবে বসবাস করতে থাকুন, সরকারের কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু নানাসাহেব অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি ফিরে আসেন নি। তিনি ইংরেজদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,—'যতক্ষণ এই দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকবেই। আর সেজন্য, যা আমি করবো, তা করবো শুধু তলোয়ারেরই সাহায্যে, অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে নয়।' এই নানাসাহেবের কথা আমার কাছে অমৃত সমান্। এঁর কথা ভাবতে ভালো লাগে, বলতে ভালো লাগে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি মানুষের কথাও এসে পড়ে, ইনি হচ্ছেন আজিমুল্লা। কোনো এক ধনী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারে খিদ্‌মদ্‌গার হিসাবে ওঁর জীবন আরম্ভ। এদের সাহচর্যেই তিনি ইংরেজী আর ফরাসী ভাষা শেখেন। এবং ভাষা-শেখায় অসামান্য পারদর্শিতার জন্যই তাঁকে কানপুর সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। পাশ করে এখানেই তিনি শিক্ষক হয়েছিলেন। সামান্য খিদ্‌মদ্‌গার থেকে গভর্ণমেণ্ট স্কুলের

শিক্ষক, কথাটা কম নয়। এখান থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন নানাসাহেবের প্রতিনিধি। নানাসাহেব নিজের আর্জি বিলাতের প্রভুদের জানাবার জন্য ওই আজিমুল্লা খাঁ-কে পাঠান। এই আজিমুল্লা দেখতে নাকি ছিলেন সুন্দর এবং চালচলনে ছিলেন খুবই কেতাদুরস্ত। এতে সহজেই বিলেতের অভিজাত মহলে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। এখানে তিনি সুন্দরীদের মনও জয় করেছিলেন শোনা যায়। ১৮৫৭ সালে বিঠুরে নানাসাহেবের প্রাসাদ খানাতল্লাসী করতে গিয়ে আজিমুল্লাকে লেখা কয়েকখানি চিঠি পেয়েছিলেন লর্ড রবার্টস। তিনি তাঁর বোনকে লিখে জানিয়েছেন,—ইংরেজ মেয়েরা এই লোকটির জন্য পাগল হয়েছিল জানতে পেরে ঘোরতর লজ্জা পেয়েছি আমরা। ব্রাইটনের শ্রীমতী অমুখ ত এই লোকটিকে প্রেমপত্র লিখে বসে আছেন। আবার কুমারী অমুখ ত এই শয়তানটাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন।

তা লর্ড রবার্টস যা-ই লিখুক না কেন, আজিমুল্লা যে অসাধারণ লোক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি বিলেতে নানাসাহেবের ব্যাপারে বিফল মনোরথ হলেন। হয়ে, ফেরবার সময় সোজা চলে না এসে ঘুর পথ ধরলেন। শুনেছিলেন, মাল্টায় ইংরেজ আর ফরাসীর সম্মিলিত সৈন্য রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছে। ইংরেজ-ফরাসীদের চূর্ণ করেছে, রাশিয়ার এই 'রুস্তম' বা 'বীরপুরুষ' যারা—তাদের দেখতেই হবে। এই মনে করে তিনি কনসট্যান্টিনপোলে চলে এলেন। এখানে একজন নামকরা সাংবাদিক ডোবলিউ-এইচ-রাসেলী-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁর লেখা থেকে আজিমুল্লা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। আজিমুল্লা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিলেন বলে এই রাসেল সাহেবই লিখে গেছেন। আর যেটা লেখেননি সেটা হচ্ছে, আজিমুল্লা কি সেদিন রাশিয়ার রুস্তমদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন নি? এই কথা কি তাঁর মনে হয়নি, এই রুস্তমদের সাহায্যে নানাসাহেব তথা ভারতের জাগরণ, যাকে ইংরেজরা 'বিদ্রোহ' নাম দিয়ে গেছে, তাকে সার্থক করে তোলা যেতে পারে?

যাইহোক, এর পরে আজিমুল্লার কথা আর কিছু শোনা যায় না, নানাসাহেবও নির্বাসনে। নানাসাহেব নেপালে যখন চলে যান, তখন অযোধ্যার বেগম হজরত মহলও নেপালে আশ্রয় নেন। আর আশ্রয় নেন রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সেই তরুণী মাসী, সুনন্দা। রায়বেরিলীতে এঁর জন্ম। কয়েকজন পেশোয়া তখন রায়বেরিলীতে এসে বসবাস করছিলেন। ছোট থেকেই এঁর মেধা ছিল অসাধারণ, সাত বছর বয়স থেকে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেছিলেন। আর ছিল সর্ববিধ শরীর-চর্চা। ঘোড়ায় চড়তে, অস্ত্র চালাতে রাণীর উপযুক্ত সহচরীই বটে। এঁর বাবা নারায়ণ রাওয়ের একটি দুর্গ ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর এই দুর্গ সংস্কার করে রীতিমত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। ইংরেজরা জানতে পেরে তাঁকে কিছুদিন ত্রিচিনোপল্লীতে অন্তরীণ করে রাখে। এই মহিলাটির ভিতরে ছিল ঈশ্বরভক্তি। তিনি ওখান থেকে নৈমিষারণ্যে গিয়ে গৌরীশঙ্করের সেবিকা হন। হন তপস্বিনী। তখন তিনি পরিচিত ছিলেন গঙ্গাবাঈ নামে। এরপরে ১৮৫৭-র ডাক। রাণীর সঙ্গে সংযোগ। তারপরে নানাসাহেবের সঙ্গে আত্মগোপন করে চলে যান নেপালে। এই নেপালে তিনি নানা-সাহেবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তপস্বিনীর বেশে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নেপালীদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ, উভয়ই জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এইভাবেই 'মাতাজী তপস্বিনী' নামে তিনি সবার কাছে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠেন, এমন কি নেপালের রাজপরিবারেও তিনি সন্ন্যাসিনী-রূপে বিশেষ আদৃত হতেন।

এই মাতাজীর কথা বিশেষ ভাবে বলতে হবে এইজন্য যে, বিপ্লব-প্রচেষ্টায় এই মহিলার অবদানও কম নয়। মহারাষ্ট্রে যখন ফাড্‌কে আর তারপরে চাপেকর-ভ্রাতাদের ঘটনা ঘটে গেল, তারপরের ঘটনা এটা। ফাড্‌কে আর চাপেকরদের প্রসঙ্গ বলবার আগে মাতাজীর কাহিনী বলে নিই। বাংলায় ঊনবিংশ-শতাব্দীর নবজাগরণ জাতীয়তা-বাদের ভিত স্থাপন করে। আর এই জাতীয়তাবাদকে আত্মিক শক্তিতে

বলিয়ান করার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথাও স্মরণ করতে হয়। ডিরোজিওর শিষ্য নব্য বাঙালী তরুণদের কথা যেমন আসে, যেমন আসে রামমোহনের পথ ধরে আরও অনেক মনীষীর কথা, আসে মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের কথা, আসে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা, তেমনি রামকৃষ্ণের কথাও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার নয়। এই রামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন দেশকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান,—নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দকে। এ-সম্পর্কে কথিত আছে বাংলার সন্ত্রাসববাদ সম্পর্কে গোপন যে রিপোর্ট প্রদত্ত হয়েছিল, তাতে ছিল, Terrorism in Bengal owes its origin in Dakshineswar. কথাটা যখন লেখা হয়, তখন ঠাকুর অবশ্য দেহরক্ষা করেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাজ চলছিল বলা যেতে পারে।

এইবার মাতাজীর কথা বলি। মাতাজী তখন প্রৌঢ়া, নেপালে 'গঙ্গামন্দির' নামে একটি মন্দির স্থাপনা করে তপস্যা করছেন। এমনই এক সন্ধ্যায় আরতির পর তিনি যখন মন্দির চত্বরে বসে জপ করছিলেন, সেই সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক তরুণ সন্ন্যাসী। মাতাজী চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলেন সেই জ্যোতির্ময় মুখ, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। বললেন,—মা, আপনি কী করছেন? নিজের আত্মিক উন্নতি? কিন্তু পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তি আপনি, আপনি শুধু নিজের জন্য ভাববেন কেন? সন্তানদের জন্য ভাবুন? ছেলেরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে চায়, আপনি মা হয়ে তা তো শুধু চোখ চেয়ে দেখতে পারেন না! আপনাকে অবশ্যই কিছু করতে হবে।

মা জপ থামালেন, বললেন,—কী আমাকে করতে হবে, বলো?

তরুণ সন্ন্যাসী মায়ের কাছে বসলেন। অনেক কথা হলো। সন্ন্যাসী বললেন,—মাতাজী, ছেলেদের জন্য পিস্তল চাই। রাণাদের বাড়িতে আপনার অসীম প্রভাব আমি জানি। ওদের কাছ থেকে যে-রকম করে হোক ও-গুলো জোগাড় করে আপনি কলকাতায় চলে যাবেন।

মাতাজী বললেন—কিন্তু আমি ত কলকাতায় কখনো যাইনি! কাউকে চিনি না।

সন্ন্যাসী হাসলেন, বললেন,—চেনাশোনা ঠিকই হয়ে যাবে। আপনি সোজাসুজি এখান থেকে কলকাতা রওনা হবেন না, কলকাতা-গামী প্যাসেঞ্জারদের ওপর পুলিশের ভীষণ নজর। আপনি এখান থেকে দ্বারভাঙ্গা যান, সেখানে দুদিন থেকে তারপরে কলকাতা রওনা হবেন।

মাতাজী একটু ভেবে বললেন,—কলকাতায় গিয়ে কি তোমার দেখা পাবো?

—না মা,—সন্ন্যাসী হাসলেন, বললেন,—আমি আপনাকে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, যার কাছে যাবেন, তার নাম লিখে দিচ্ছি। আমার হাতের লেখা দেখলেই সে চিনতে পারবে। কিন্তু মা, সন্ধ্যার আঁধারে যদি হিসাব করে পৌঁছতে পারেন সেখানে, তাহলেই খুব ভালো হয়।

মাতাজী বললেন,—তা-ই করবো। কিন্তু বাবা, তোমার পরিচয় ত জানা হলো না।

সন্ন্যাসী মাতাজীকে প্রণাম জানিয়ে বললেন,—আমি আপনার সন্তান। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ভাববেন না মা, যথাসময়ে আবার আমাদের দেখা হবে।

এরপরে সন্ন্যাসী উঠে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মাতাজী তপস্বিনীর নেপালে আর দেখা হয়নি। মাতাজী তাঁর খোঁজও করেননি অবশ্য। তিনি তার পরের দিনই কাজে লেগে গেলেন। আর বেশ কয়েকদিন লাগলো তাঁর অভিষ্ট কর্ম সিদ্ধ করতে। কিছু অস্ত্র জোগাড় হলো অবশেষে রাণাদের কৃপায়। সেগুলি একটা পুঁটলীতে বেঁধে সন্ন্যাসিনী রওনা হলেন দ্বারভাঙার পথে। দ্বারভাঙায় দুদিন কাটিয়ে এলেন কলকাতায়। তারপরে সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে পড়লেন কাগজে লেখা সন্ন্যাসী প্রদত্ত সেই ঠিকানার উদ্দেশ্যে। জায়গাটা বাগবাজার। যখন বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

হয়ে গিয়েছিল। কড়া নাড়তেই একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলেন। মাতাজী কোনো কথা না বলে কাগজখানা এগিয়ে দিলেন তার হাতে। তিনি সেটা নিয়ে ভিতরে গেলেন। এবং তার পরক্ষণেই সেই কাগজটা হাতে করে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলেন আরেক দীর্ঘাঙ্গিণী মহিলা, সুশ্রী এবং জ্যোতির্ময়ী, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরণে পা পর্যন্ত ঝোলা একটা গাউন। তিনি এসে আগেই গড় হয়ে প্রণাম করলেন মাতাজীকে, তারপরে দরজা বন্ধ করে হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভিতরে, একেবারে সরাসরি দোতলায়। সমাদর করে বসিয়ে তুই হাত অঞ্জলির মতো পাতলেন, বললেন,—দিন।

মা সেই পুঁটলীটা দিলেন ওঁর হাতে। মহিলাটি সেটা কোথাও লুকিয়ে রেখে এলেন। তারপরে এসে দাঁড়ালেন কাছে। বললেন,—আগে হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন মা।

বলে, হাত ধরে ওঠালেন ওঁকে। মাতাজী কলঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ভালো করে বসলেন। দেখলেন, তাঁর সামনে শুদ্ধাচারে সাজানো কিছু ফলমূল। মাতাজী অল্প অল্প হাসছিলেন, বললেন,—কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝছি না মা, তুমিই বা কে, আর ঐ চিঠি যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই বা কে ?

দীর্ঘাঙ্গিণী মহিলাও সন্ন্যাসিনী। তিনি বললেন,—যাঁর চিঠি নিয়ে আপনি এসেছেন, তিনি আমার গুরুদেব, আমি তাঁর শিষ্যা।

—তাঁর নাম ?

—স্বামী বিবেকানন্দ।

—আর তুমি ?

—মারগারেট নোবল। গুরু নাম দিয়েছেন, নিবেদিতা।

এই ঘটনার কথা পুরোপুরি কোথাও লেখা নেই, কিন্তু আংশিক কোথাও-কোথাও লেখা আছে। অনিবার্য কারণেই এগুলো লেখা হয়নি তখন, মুখে-মুখে চলে আসছে। এই মাতাজী পরে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আমি এর পর কী করবো ?

নিবেদিতা বলেছিলেন,—সে নির্দেশও গুরুদেব আমাকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বড়ো অভাব, আপনি যদি সে-ভার নেন ?

—বল্‌ছো কী ! আমি পারবো ?

নিবেদিতা বললেন,—গুরুদেব বলেছেন, পারলে আপনিই পারবেন।

পরে এই জিনিসটাই করা হয়েছিল। স্বামীজীর প্রেরণা, মাতাজী ও নিবেদিতার চেষ্টায় একটি আদর্শ স্ত্রী-শিক্ষা-নিকেতন গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এটা গড়ে তুলতে মাতাজীর অবদানই ছিল সব থেকে বেশি। এই বিদ্যালয়টির নামই 'মহাকালী পাঠশালা' ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই পাঠমন্দির এক আদর্শ বিদ্যালয় ছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদ্যালয় দেখতে এলেন, দেখতে এলেন মাতাজীকে। মাতাজী তাঁকে সবিনয়ে বললেন,—'আমি ভগবতীজ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করে থাকি, নইলে বিদ্যালয় করে যশ পেতে চাই না।'

বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে মন্তব্য-করার খাতায় স্বামীজী শুধু লিখে দিয়েছিলেন,—The movement is in the right direction.

আদর্শ শিক্ষিকা ছিলেন মাতাজী, কিন্তু তা বলে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। কলকাতায় একসময় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মাতাজী অস্ত্রের জন্য নেপালের মহারাজার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন, কিন্তু নানান বিঘ্নের জন্য তিলক যোগাযোগ করতে পারেন নি। মাতাজী তখন তাঁর পুত্রস্থানীয় কে-পি-খাদিলকর, যে বহুদিন ধরে তাঁর কাছে থাকতো, শিক্ষকতাও করতো, তাঁকে পাঠালেন নেপালে। নেপালের সেনাপতি চন্দ্র সামসের জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করেছিল খাদিলকর। স্থির হয়েছিল বিখ্যাত জার্মাণ কোম্পানী ক্রু‌প্‌সের সহায়তায় একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে উঠবে। বাইরে থাকবে টালি তৈরির কারখানা, কিন্তু ভিতরে থাকবে তার অন্য রূপ।

নেপালে খাদিলকর ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কৃষ্ণ রাও। ইংরেজরা যাতে টের না পায়, সেজন্য নেপাল সরকার এঁকে 'নিরীহ মানুষ' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। কিন্তু এঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু দামু যোশি কোলাপুরের রাজার কাছে প্রস্তাবিত অস্ত্র কারখানার কথাটা প্রসঙ্গ ক্রমে বলে ফেলে। কোলাপুরের রাজাই খবরটা দিয়ে দিয়েছিলেন বোম্বের গোয়েন্দা পুলিশকে। ফলে প্রস্তাবটি বানচাল হয়ে যায়, খাদিলকরকে অন্তরীণ করা হয়, তবে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আসল মানুষটির কথা পুলিশ কোনো দিনই জানতে পারে নি। মাতাজী কলকাতাতেই মারা যান ১৯০৭ সালে। কিন্তু তাঁর 'মহাকালী পাঠশালা'র সুনামের কথা এই সেদিন পর্যন্তও শোনা যেতো।

আমি অবশ্য মাতাজীর কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে এসেছি, পিছিয়ে যেতে হবে ১৮৭২ সালে। এই সালটাকে পরবর্তী কালের বিপ্লবীরা মনে রাখবার চেষ্টা করতেন। এই সালে ঋষি অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই সালেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বার করেন, এই সালেই বন্দেমাতরম্-মন্ত্র-সম্বলিত 'আনন্দমঠ' লিখতে আরম্ভ করেন। এই সালেই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃপুরুষ সুরেন্দ্র-নাথের চাকরি যায় ও তার ফলে অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে। মহারাষ্ট্রে মহামতি রাণাডে এই সালেই 'সার্বজনিক সভা'র প্রতিষ্ঠা করে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস করতে থাকেন। ১৮৭৬ সালে ঐ মহারাষ্ট্রেই ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করার একটা চেষ্টা হয়। এদের নেতার নাম দিল বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কে। এই ফাডকে সরকারী চাকুরে ছিলেন, কিন্তু তার মন ছিল দেশাত্মবোধে পরিপূর্ণ। তাঁর দেশের ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শে এক গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এই বাহিনী ব্রিটিশ রাজশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ তাকে ভালবেসে নাম দিয়েছিল 'দ্বিতীয় শিবাজী।, কিন্তু হায়দরাবাদ জেলার এক মন্দিরে হঠাৎ তিনি ধরা পড়ে যান ১৮৭৯ সালে। বিচারে হয়েছিল যাবজ্জীবন

কারাদণ্ড। এঁকে ভারতের সীমারেখার মধ্যে রাখতে সাহস পায়নি ইংরেজ সরকার। এঁর হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে এঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সুদূর এডেনে। কিন্তু এডেনের নির্জন জেলখানার ভিতরে অসহ্য নিপীড়নে তাঁর শরীর ভেঙে পড়লো একেবারে। কোনো চিকিৎসা নয় কিছু নয়, এক অন্ধকার সেলের ভিতরে বীর ফাডকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৮৮৩ সালে। কিন্তু বীরের এ আত্মত্যাগ বৃথা গেল না, জেগে উঠতে লাগলেন লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলক। ঐসময় ওখানকার কোলাপুর রাজ্যের অবস্থা খুব জটিল হয়ে ওঠে। রাজারাম মহারাজ মারা গেলে তাঁর দুই বিধবা স্ত্রী শিবাজী রাওকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই শিবাজী রাও-এর মধ্যে পাগলের লক্ষণ দেখা দেয়। লোকে বলাবলি করতে লাগলো রাজপুত্রকে কেউ কিছু খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। একে তাড়িয়ে অন্য কাউকে সিংহাসনে বসানোই ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য। এই সূত্রে শোনা যেতে লাগলো রাও বাহাদুর বার্ভে বলে একজন ধনী ও প্রতিপত্তি-শালী লোকের নাম। ঐসব নিয়ে যখন মহারাষ্ট্র তোলপাড়, তখন তিলক আর তাঁর সহযোগী আগরকর তিনখানি চিঠি পান তাঁদের কাগজ 'কেশরী' এবং 'মারাঠা'তে প্রকাশ করবার জন্য। এই চিঠি তিনখানি তাঁরা প্রকাশও করেন। বার্ভের তদ্বিরে তাঁদের শেষ পর্যন্ত বার মাসের জেল হয়ে যায়।

লোকমান্য তিলকের কীর্তি শুধু ঐ 'মারাঠা' আর 'কেশরী'ই নয়। মানুষের মনে তিনি দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য সার্বজনীন গনপতি পূজা ও শিবাজী উৎসবের সূচনা করেন যথাক্রমে ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ সালে। এর ফলে দেশাত্মবোধের এক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে মহারাষ্ট্র জুড়ে। কিন্তু ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে পুণা ও তার চার-পাশের অঞ্চলে প্লেগ দেখা দিয়েছিল মহামারীর আকারে। এই সর্বনাশা মহামারী বোম্বাইয়ের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

শুরু হলো মৃত্যুর বিভীষিকা। মানুষও দিশাহারা। সরকার প্লেগ দমন করবার জন্য আইন করলেন। এই আইনে সরকারী ব্যক্তি খুশি মতো যে কোনো ঘরে ঢুকে যে কোনো লোকের দেহ পরীক্ষা করে দেখতে পারতো। প্রকৃত রোগী হলে তো কথাই নেই, সন্দেহ ভাজন হলেও তারা তাদের টেনে প্লেগ হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতো। আইন আসলে মন্দ নয়, মন্দ ছিল এর প্রয়োগ। র‍্যাণ্ড বলে এক কুখ্যাত ইংরেজ অফিসারকে আনা হলো এই কাজের কর্তা হিসাবে। সে আর তার টমি অনুচরেরা প্লেগ পরীক্ষার নামে যা-তা করে বেড়াতো। মানুষদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখতো। এ-থেকে মেয়েরা পর্যন্ত বাদ যেতেন না। মেয়েদের পর্যন্ত উলঙ্গ করে এই নর পিশাচরা রোগ হয়েছে কিনা তা দেখবার অজুহাতে তাদের শরীর স্পর্শ করতো যথেচ্ছভাবে। এই সন্ত্রাসে বহু লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর যাঁরা রুখে দাঁড়াবার তারা রুখে দাঁড়ায়। গর্জে উঠলেন লোকমান্য তিলক। তাঁর 'কেশরী' প্রতিবাদে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো। আর বাংলা থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো।

আর নিপীড়নের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এলো বীর চাপেকর ভাইয়েরা। পুণার অধিবাসী এঁরা। চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। বড়ো ভাইয়ের নাম দামোদর হরি চাপেকার। ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব। রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, সরকারী ভবন থেকে উৎসব শেষে একে একে বেরিয়ে আসছেন সাহেবরা। কাছেই অস্ত্র হাতে লুকিয়ে আছেন দামোদর। ওর আর এক ভাই বালকৃষ্ণ একটু দূরে রাস্তার ধারেই আছেন লুকিয়ে। খানিকটা এগিয়ে ঐভাবে আত্মগোপন করে আছেন দামোদরেরই গুপ্ত সংগঠনের সক্রিয় সদস্য মহাদেও বিনায়ক রাণাডে।

এঁদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে প্রথম ঘোড়ার গাড়ি যেটি বেরিয়ে

এলো, সেটিতে ছিলেন লেফটেনান্ট আয়ার্স্ট ও তাঁর স্ত্রী। তারপরে বেরুলো র‍্যাণ্ডের গাড়ি। দামোদরও বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে, কিছুদূর পর্যন্ত ছুটে এসে গাড়ির পিছনে উঠে পড়লেন তড়াক করে। র‍্যাণ্ডের প্রায় পিঠ ছুইয়ে ফায়ার করলেন পিস্তল। গাড়ির মধ্যে লুটিয়ে পড়লেন র‍্যাণ্ড। তখনো মরে নি, দশদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে হেরে যায়। আয়ার্স্টকেও অনুরূপ ভাবে গুলি করেছিলেন বিনায়ক রাণাডে; তিনি মারা গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। এর আর বিস্তৃত বর্ণনা করে লাভ নেই, এর পর শুরু হলো ধরপাকড়ের পালা। নানান নির্যাতন আর সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে দামোদরের খোঁজ পেলো ইংরেজ। বিচারের প্রহসন করে এঁকে যখন প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো, তখন তিনি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিলেন,—এইটুকু মাত্র, আর কিছু নয়। বালকৃষ্ণও পরে ধরা পড়েছিলেন, তাঁরও হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। তিন ভাইয়ের সব থেকে ছোট ভাইটি একেবারে বালক বললেই হয়। তার নাম বাসুদেব। এই বাসুদেব আর রাণাডে, যারা দামোদর ও বালকৃষ্ণের নাম পুলিশের কাছে বলেদিয়েছিল, তাঁরাও দ্রেভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদেরও ফাঁসি হয়েছিল। ছোটভাই বাসুদেব আর বন্ধু রাণাডে ফাঁসির মঞ্চে ওঠবার দিনকয়েক পরে ফাঁসি হয়েছিল বালকৃষ্ণের।

সারাদেশ এই শহীদ বীরদের শোকে মুহ্যমান। একে একে যাঁর তিনটি ছেলে ফাঁসিতে জীবন দিলো, সেই মায়ের কথা মনে করে আরেকটি মহাপ্রাণ কেঁদে উঠলো। তিনি হলেন সিস্টার নিবেদিতা। তিনি চলে গেলেন পুণায়, সেই বীরমাতার সামনে। দেখলেন, গৃহদেবতার সামনে অবিচল বসে আছেন এক শক্তিময়ী নারী। শোক নয় কিছু নয়, ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ এক মহিয়সী মাতৃমূর্তি। নিবেদিতা তাঁকে প্রণাম করে চলে এসেছিলেন। চলে এসেছিলেন বোম্বাইতে। বলাবাহুল্য, প্লেগকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ

সন্ত্রাস ও চাপেকর-ভাইদের আত্মবিসর্জন প্রভৃতি নিয়ে তিলক সমানে লেখনী 'চালনা করছিলেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি নাম, গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ১৮৬৬ সালের ৬ই মে গোখলের জন্ম রত্নগিরি জেলার একটি গ্রামে। ইনিও চাপেকরদের মতো চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। গোখলের ছাত্রজীবন সংগ্রামপূর্ণ। চার বোন দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাই হিসাবে তিনিই ছোট ছিলেন। মাত্র তেরো বছরে বাবার হঠাৎ মৃত্যু হলে ১৮ বছরের দাদা চাকরিতে ঢোকেন, ছোটভাই গোপালকৃষ্ণ কোলাপুরেপড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৫ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে তখনকার দিনের প্রথা অনুসারে। কোলাপুরের রাজারাম কলেজে পড়তে লাগলেন। অসাধারণ ছিল তাঁর মেধা। এখান থেকে গেলেন পুণায় ডেকান কলেজে। সেখান থেকে আবার কোলাপুরে। কোলাপুর থেকে বোম্বের এলফ্রিসস্টোন কলেজে, সেখান থেকে বি-এ পাশ করেন। কিন্তু পুণায় তাঁর স্বল্পকালের স্থিতি তাঁর মনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। তিলকের মারাঠা ভাষার 'কেশরী' আর ইংরেজী 'মারাঠা' তরুণ মনকে উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলেছিল যথেষ্ট। তারপরে যখন শুনলেন তিলক চার মাসের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করছেন, তখন তাঁর সাহায্যের জন্য অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নেন। তারপরে পুণায়ও চলে আসেন একটি স্কুলের মাস্টারী নিয়ে। এখানেই তিনি তিলকের সংস্পর্শে আসেন আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে। এই গোখলের কথা পরে আরও বলতে হবে, কিন্তু তখনকার দিনে সারা দেশে তরুণদের মনে তিলকের প্রদীপ্ত দেশাত্মবোধ যে শ্রদ্ধা বিকীরণ করেছিল, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁরও জন্ম রত্নগিরি অঞ্চলে, ১৮৫৬ সালে, যেকথা হয়ত আগে বলতে ভুলে গেছি। মেধায় তিলকও কম যান না। বি-এ-তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বি. এ-র পর ল পাশ করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর কেশরীর

কথা ত আগেই বলেছি। চাপেকার ভাইদের ঘটনার পর তিলককে গ্রেপ্তার করা হলো ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে 'কেশরীতে' তাঁর একটি লেখার অজুহাত ধরে। ১৮৯৮ এর সেপ্টেম্বরে তিনি মুক্তি পান। অবশ্য এরপর বহুবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। সেসব কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

আমরা একটু আগে বলছিলাম নিবেদিতার কথা। মিস্ মার্গারেট নোবল বা নিবেদিতার জন্ম আয়ার্ল্যাণ্ডে ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবরে। তাঁর যখন ২৮ বছর বয়স, তখন লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্বামী বিবেকানন্দের, ১৮৯৫ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে। নিবেদিতা তাঁর দেশকে ইংল্যাণ্ডের অধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য যে বিপ্লব হয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা পার্নেল এবং রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপটকিন, এই দুজনের দ্বারাই বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন নিবেদিতা, তাঁর প্রথম জীবনে। এঁদের হয়ে তিনি বিপ্লবেরই কাজ করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে। আইরিশ সিন্-ফিন, আর রাশিয়ার নিহিলিজম—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠছিল সেই সময়। তাঁর প্রথম জীবনে রোমান্সও যে আসে নি এমন নয়। দু-দুবার তাঁর বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল। প্রথমবার তাঁর প্রণয়ী তরুণটি হঠাৎ মারা যায়। দ্বিতীয়বার তাঁকে যে বিবাহ করতে চেয়েছিল, সে ছেলেটি তাঁকে ছেড়ে অন্য মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়। এই ঘটনায় ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। আর ঠিক ঐ সময়ই তিনি দেখা পান স্বামী বিবেকানন্দের। নিবেদিতার ভারতের মাটিতে প্রথম পা দেবার তারিখ ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৮। পরের বছর ১২ই মে চাপেকর ভাইদের আত্মাহুতি শেষ। পুণায় চাপেকরদের মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন নিবেদিতা। তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব একেবারে মিলিয়ে যায়নি দেশ থেকে। নিবেদিতা যেমন কলকাতায় প্লেগের রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ঠিক তেমনি করেছিলেন বোম্বাইতে আর এক

মহিয়সী মহিলা, তাঁর নাম ভিকাজী রুস্তমকামা পরবর্তীকালে 'মাদাম কামা' নামে যিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিতা হয়েছিলেন।

এই ভিকাজী ছিলেন বোম্বাইয়ের নাম-করা পার্শী ব্যবসায়ী শেঠ সোরাবজী ফ্রামজী প্যাটেলের মেয়ে। ভিকাজীর জন্ম সাল ১৮৬১। বিবাহ হয়েছিল প্রখ্যাত পার্শী সলিসিটর রোস্তম কে. আর. কামার সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে পরে মতান্তর। প্লেগ-রোগীর শুশ্রূষা, এবং পরে ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে ইয়োরোপ যাত্রা। লণ্ডনে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রচারের কাজে দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে আত্ম-নিয়োগ করলেন। দাদাভাইয়ের মাধ্যমে আলাপ হলো সর্দার সিং রাণার সঙ্গে, রাণা তখন ব্যারিস্টারী পড়ছিলেন। এর পরে তাঁর আলাপ হলো পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। এই তিনজনের কথা পরে বিশেষভাবেই বলতে হবে।

বলতে বলতে মনে পড়ে যায় মিসেস ডাঃ অ্যানি বেসান্তের কথা। ১৮৯৩ সালের নভেম্বর নাগাদ তিনি প্রথম ভারতবর্ষে আসেন মূলতঃ লণ্ডনের থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাষণ দিতে। মাদ্রাজের আডিয়ার থেকে কাশী পর্যন্ত বহু জায়গায় তিনি এ-উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি এই বিদেশিনী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি কাজ আরম্ভ করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে জাতীয়তা, আত্মোন্নতি এবং সমাজসংস্কারমূলক কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে গড়ে উঠে তাদের কাজ করে যাচ্ছিল। যেমন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। অমৃতবাজার পত্রিকার স্রষ্টা মহাত্মা শিশির ঘোষ, কৃষক-বিদ্রোহ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নীলবিদ্রোহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে-ভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন সে যুগে, তা অতুলনীয়। অসময়ে হরিশ মারা গেলেন। 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন কবিবর মাইকেল মধুসূদন,

আর তা প্রকাশ করার দায়ে জেম্‌স লঙ্‌সাহেব অভিযুক্ত হয়েছিলেন আদালতে, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন। এসব কথা তখনকার লোকের মুখে কিম্বদন্তীর মতো ফিরতো। তারই জের দেখা যেতো নরেন্দ্রনাথ সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরর', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকায়। ওদিকে পাঞ্জাবের দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করেছেন আর্যসমাজ। বোম্বাইয়ের কাগজ 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার কথাও স্মরণ করতে হয়। তিলক ও গোখলে ছাড়াও বোম্বাইয়ে নেতা হিসাবে পুরোভাগে এসে তখন দাঁড়িয়েছিলেন দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডে, বদরুদ্দীন তায়েবজী প্রভৃতি। মাদ্রাজের হিন্দু-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যাঁরা পুরোভাগে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন কে, সুন্দররামা আইয়ার, রঘুনাথ রাও এবং টি-মাধব রাও। এই সময় দেখা যায় বিলাতের থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি ১৮৭৯ সালে তাঁদের হেডকোয়ার্টার বদ্‌লে ভারতে নিয়ে এলেন। সরকারী চাকরি করতেন অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম সাহেব (আই-সি এস), তিনিও চাকরি থেকে অবসর নিয়ে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করলেন। এর পরে এই হিউম সাহেব ভারতীয়দের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য জীবনপণ করলেন, গঠিত হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তাঁদের প্রথম অধিবেশন বসলো পুণায় ১৮৮৫ সালে, বাংলার তদানীন্তন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ডবলিউ-সি-ব্যানার্জীকে সভাপতি করে। ভারত থেকে দরবার করতে একটি কমিটি ইংলণ্ডে গেল, যাঁদের মধ্যে হিউম সাহেব তো ছিলেনই, ছিলেন উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ ও হেনরি কটন। ইংল্যাণ্ড থেকে 'ইণ্ডিয়া' বলে একটি কাগজও বার করলেন এঁরা। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে আরও একটি সাহেবের নাম যুক্ত হলো, তিনি চার্লস ব্র্যাড্‌ল। বোম্বাইতে তখন তিনজন নেতার নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হতো। কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং, ফিরোজ শা মেটা আর বদ্‌রুদ্দিন তায়েবজী।

যাইহোক, কংগ্রেসের মাধ্যমে তখন 'আবেদন-নিবেদন'-এর রাজনীতি শুরু হলেও তাঁদের অধিবেশনগুলো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ১৮৮৬ তে কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন হলো কলকাতায়, তাতে সভাপতিত্ব করলেন দাদাভাই নৌরজী। পরের বছর মাদ্রাজের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন বদ্‌রউদ্দীন তায়েবজী। কংগ্রেসের উন্মেষকাল সম্পর্কে একটি কথা শোনা যায়, হিউম সাহেব কংগ্রেস-গঠনের প্রেরণাস্থল হলেও, বড়লাট লর্ড ডাফরিনেরও এতে প্রচুর উৎসাহ ছিল।

কিন্তু এই 'মডারেট' বা নরমপন্থী রাজনীতির প্রবাহ একদিকে আর 'এক্সট্রিমিস্ট' বা চরমপন্থীদের পথযাত্রা অন্যদিকে। এঁদের মধ্যে যাঁর নামটি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ। বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সম্পদ, বিবেকানন্দের বৈরাগ্য, বিদ্যাসাগরের উদারতা ও তেজ, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভগবৎপ্রেম, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র পালের দেশাত্ম-বোধ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয়তা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মানবতা,—এসমস্তই শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে প্রতিফলিত।

কিন্তু তাঁর কথায় আসার আগে দুটি মানুষের কথা বলা দরকার। একজন রমেশচন্দ্র দত্ত ও আর একজন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মাধবী কঙ্কণ' 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতির লেখক রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে দশ বছরের ছোট ছিলেন। বঙ্কিমের জন্মসালটা মনে আছে, ১৮৩৮, মৃত্যুর বছর ১৮৯৪। বন্দেমাতরম'-এর ঋষি বঙ্কিম কংগ্রেস-গঠনের কথা জেনে গেছেন, জেনে গেছেন মারাঠা দেশের জাগরণের উন্মেষকালের কথা। এবং বাংলাদেশের স্বদেশী-আন্দোলনের উষাকাল তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। যোগেশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর কাছে প্রায়ই যেতেন। সেই যোগেশচন্দ্র, যিনি 'ম্যাজিনী-গ্যারিবল্ডী'র জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ব্যারিস্টার পি-মিত্র পরিচিত হন বঙ্কিমের সঙ্গে। এক বঙ্কিমেরই প্রেরণায়

তিনি তরুণদলকে সংগঠিত করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি শরীর-চর্চ্চায় তাদের নিয়োজিত করেছিলেন। এবং বঙ্কিমের 'অনুশীলন-তত্ত্ব'-এর রেশ ধরে তিনি তাঁর সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন 'অনুশীলন-সমিতি।

এসব কথায় পরে আসছি। রামবাগানের সুবিখ্যাত দত্ত পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম, পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত। অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন রমেশচন্দ্র। এঁর মেধার কথা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরে কোথাও লিখেছিলেন। রমেশবাবু বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস হবেন, এই ছিল অভিলাষ। তাঁর আগে একজন মাত্র ভারতীয়, আই-সি-এস হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রমেশবাবুর মতো তাঁর আরও দুজন সহপাঠীরও ছিল এই ইচ্ছা, তাঁরা হচ্ছেন বিহারীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলেতে আই-সি-এস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেম রমেশচন্দ্র। বিহারীবাবু ও সুরেন্দ্রনাথও সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিন বন্ধুতে ফরাসী বিপ্লবের রূপ দেখবার জন্য প্যারিসে গিয়েছিলেন বেড়াতে। বিপ্লবীরা চর সন্দেহে ওঁদের ধরেছিল। কিন্তু ভারতীয় ছাত্র জেনে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু সে সব কথা থাক, রমেশচন্দ্র ১৮৭১ সালে আলিপুরের সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রাজকার্যে যোগদান করলেন। কিন্তু রাজকার্যের থেকে যেটা আমাদের সব থেকে প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়, সেটা হচ্ছে তাঁর মনীষা, যা পরবর্তী-কালে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ কাজে এসেছিল। তাঁর লেখা 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' তখনকার দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল তাঁদের কাছে, যাঁরা দেশের অর্থনীতির পুরো ছবিটা পেতে চাইতেন। এই রমেশচন্দ্রের কথা পরে আরও বলতে হবে। বাকি থাকে তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথের কথা। এক সময় 'সুরেন বাঁড়ুজ্যে' নামটি দেশের তরুণদের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি

করতো, সেইজন্য দেশবাসী তাঁর নাম দিয়েছিল 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ'। ১৮৭৯ সাল থেকে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন, ১৯০০ সাল থেকে 'বেঙ্গলী' হয়েছিল দৈনিক। কিন্তু এটাই তাঁর সব পরিচয় নয়। তাঁর বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। তিনিই বলতেন,— The services of this mother land is the highest form of religiion, it is the truest service of god.

আই-সি-এস হয়ে তরুণ সুরেন্দ্রনাথ সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন শ্রীহট্টে। তখন নভেম্বর মাস, ১৮৭১ সাল। শ্রীহট্ট জেলা তখন বাংলাপ্রদেশেই ছিল। কিন্তু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ডের ঈর্ষা প্রণোদিত ষড়যন্ত্রে একবছর পরেই তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হন।

এরপরে দেখতে পাই তিনি সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দরবার করবার জন্য দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করলেন, কিন্তু কার্যে সফল না হওয়ায় ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন। কিন্তু পদচ্যুত সিভিলিয়ানকে কর্তৃপক্ষ ব্যারিস্টার বলতে রাজী নন, তাই বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে এলেন। এটা তাঁর দুঃসময় বলতে হবে। তাঁর স্ত্রী চণ্ডীদেবী এই সময় তাঁর সমস্ত গয়না বিক্রি করে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'পৈতৃক বাড়িখানা রয়েছে, দু'মুঠো ভাত জুটে যাবেই, তুমি নিশ্চিন্ত-মনে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আরও একজন করুণার হস্ত প্রসারিত করলেন। তিনি তাঁর পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিছুদিন পূর্বে তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে তিনিই ডেকে নিয়ে বললেন, আমার কলেজে পড়াও।

সুরেন্দ্রনাথ অকূলে কূল পেলেন, হলেন ওখানে ইংরেজীর অধ্যাপক। আর এখান থেকেই তাঁর নবজীবনের শুরু। এখান থেকেই ক্রমশ তিনি স্যর হেন্‌রি কটনের ভাষায়, - 'Tribune of the people' হয়ে ওঠেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতার প্রকাশ পেতে

লাগলো। হয়ে উঠতে লাগলেন 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।' থাকতেন তালতলার নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেনের পৈতৃক বাড়িতে, পাল্কিতে যাতায়াত করতেন কলেজে। তাঁর প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন অন্যতম। তিনি বলতেন, শিক্ষকতায় সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ গুরু। দেখতে দেখতে ছাত্রসম্প্রদায়ের তিনি দেবতাস্বরূপ হয়ে উঠলেন। বহুকাল ধরে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে এসেও শিক্ষাক্ষেত্রকে ভুলে যান নি। পরে তিনি সিটি কলেজে যোগদান করেন কর্তৃপক্ষের আগ্রহে। প্রথমে দুই কলেজেই পড়াতেন, পরে শুধু সিটি কলেজে। আবার সিটিতে থাকতে থাকতেই ফ্রি চার্চ কলেজের সঙ্গে যুক্ত হলেন। যার পরবর্তী নাম 'স্কটিশচার্চ কলেজ।' তাঁকে দেখা যায় তখন অধ্যাপনা রাজনীতি, জনসেবা ও সাংবাদিকতা,—এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর অক্লান্ত কর্মজীবন বিকশিত হয়ে উঠছে। 'ফ্রি চার্চে' থাকা-কালীনই আবার ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি ইন্‌স্টিটিউশনের ভার নিলেন তিনি। এটিই ১৮৮৪ সালে 'রিপন কলেজ' হয়ে দাঁড়ায় মূলতঃ তাঁরই চেষ্টায়। কিন্তু সেযুগে তাঁর আরও একটি কীর্তি 'ছাত্রসভা'। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন,—ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়।'

'ছাত্রসভা'-গঠনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আনন্দমোহন বসু। বয়সে সুরেন্দ্রনাথের থেকে চার বছরের বড়ো। এই আনন্দমোহনের নামও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। প্রথমত ছাত্র হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব তুলনায় উজ্জ্বলতম। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হয়ে বিলাতে গিয়ে কেম্ব্রিজের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার হয়ে ও ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও চরিত্র তাঁকে দেশপূজ্য করে তুলেছিল। এদের দুজনের সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বলতেন,—'আনন্দমোহনের বিশুদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা মিলিত

হয়েই আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্মের সূচনা করে। একা সুরেন্দ্রনাথ দেশে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে পারতেন না।'

ভগিনী নিবেদিতাও এঁর প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দও শ্রদ্ধা করতেন এঁকে। তখনকার বাংলাদেশে এমন সত্যাশ্রয়ী ও সংযত চরিত্রের পুরুষ বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাবলিউ-সি-ব্যানার্জী) তাঁকে 'সেন্ট আনন্দমোহন' বলে ডাকতেন। এই আনন্দমোহন বিলাতের পাঠ সাঙ্গ করে ১৮৭৫ সালে দেশে ফেরার পথে কিছুদিন বোম্বাইতে ছিলেন। ওখানে একটি ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠ্‌ছিল তখন, যার থেকে ধীরে ধীরে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি'র জন্ম হয়েছিল। লোকমান্য তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাণাডে প্রভৃতি নেতারা এই ছাত্র আন্দোলন থেকেই সেদিন প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এই দেখেই আনন্দমোহন কলকাতায় এসে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশে ছাত্রসভা গড়ে তুলেছিলেন। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট আনন্দমোহন, ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরেন্দ্রনাথ, সম্পাদক নন্দকৃষ্ণ বসু, প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই নন্দকৃষ্ণের পরে যিনি সম্পাদক হয়েছিলেন, তিনি পরবর্তী কালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী।

যাইহোক, সুরেন্দ্রনাথ প্রথম ছাত্রসভায় যে বক্তৃতা দেন, তার বিষয় ছিল, ভারতে শিখ জাতির অভ্যুত্থান। তার পরের বক্তৃতা, 'শ্রীচৈতন্য।' ধর্মপ্রবণ শ্রীচৈতন্য নয়, সমাজ-সংস্কারক শ্রীচৈতন্য। তাঁর মতে চৈতন্যদেব ফরাসী বিপ্লবের অনেক আগেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে গেছেন।

ওঁদের ঐ ছাত্রসভার সঙ্গে তখন যুক্ত ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ বিশ্বাস, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশঙ্কর গুহ, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতি। সুরেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে তাঁর ছোট ভাই ক্যাপ্টেন

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ইনি ব্যারিস্টার ছিলেন, কিন্তু শারীরিক বলবীর্যে ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

'ছাত্রসভার' পর সুরেন্দ্রনাথের আর এক কীর্তি 'ভারত সভা'। তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারার প্রকৃত বিকাশ শুরু হয় এখান থেকেই। এর সঙ্গে আনন্দমোহন ও শিবনাথ শাস্ত্রী ছাড়া আরও যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নবীন ইটালির স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরু ম্যাজিনির মন্ত্র-শিষ্য। সুরেন্দ্রনাথেরই প্রেরণায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'আর্যদর্শন'-এ ম্যাজিনির জীবনী প্রকাশ করতে থাকেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলতেন,—'সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি (বা ম্যাজিনি) সম্পর্কিত বক্তৃতায় প্রেরণা লাভ করে আমরাও গুপ্তসমিতি গড়ায় মনোযোগ দিলাম।

তিনি আরও বলতেন, 'এইরকম একটি সমিতির কথা আমার জানা ছিল। এর সভ্যরা তলোয়ার দিয়ে বুক চিরে সেই রক্তে শপথ-পত্রে নিজের নাম সই করতেন।'

এইরকম একটি সভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু থাক সে প্রসঙ্গ। ম্যাজিনির জীবনচরিত আরও একজন লিখেছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত। সুরেন্দ্রনাথ ইটালি ছাড়া আয়ার্ল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিকদের কাহিনী, ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিকথা,—সবই বলতেন তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে। বিপিনচন্দ্র বলতেন, তাঁর মুখে শুনেই আমরা ম্যাজিনির বই গাভান ডাফির ইয়ং আয়ার্ল্যাণ্ড, কার্লাইলের ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন প্রভৃতি বইয়ে মশগুল হয়ে যেতাম।'

এই সময়কার আর একটি ঘটনা বলি 'ভারত-সভা থেকে একটি জনসভা হলো টাউন হলে, ২৪শে মার্চ ১৮৭৭ সালে। ভারত-সচিব লর্ড স্যালিসবেরি হঠাৎ একটা নিয়ম করে বসলেন, আই-সি-এস হতে গেলে সর্বনিম্ন বয়স আর একুশ নয়, উনিশ হবে। অর্থাৎ পরোক্ষে ভারতবাসীদের ঐ দিকে যাবার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। ঘটনাটি হয়ত সামান্য, কিন্তু এই অবিচারকে কেন্দ্র করে সেদিন যে আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল ভারত-সভা, তারই গুরুত্ব সব থেকে বেশি। ঐদিন মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব হয়েছিলেন সভাপতি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষ করে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বাগ্-বিভূতি। সভায় প্রস্তাব নেওয়া হলো,— এই নিয়মের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এই সভা হবার মাস দুই পরে সুরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম সভা হলো পাঞ্জাবের লাহোরে। এ-যাত্রায় ওঁর সঙ্গী ছিলেন ভারত-সভার কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য সুবক্তা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বলা কর্তব্য, সেবার এই লাহোরেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ার। এঁর মহৎ কীর্তি দুটি, এক দয়াল সিং কলেজ, দুই, 'ট্রিবিউন' পত্রিকা, যার সম্পাদক হিসাবে পরে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথেরই অন্যতম শিষ্য কালীনাথ রায়।

শুধু লাহোর নয়, অমৃতসর, দিল্লী, মীরাট, আলীগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী,—সর্বত্রই সুরেন্দ্রনাথের ভাষণ বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করলো, দেশাত্মবোধের প্রবাহ বয়ে গেল, প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো ভারত-সভার অনুরূপ সভা-সমিতি।

তারপর মাদ্রাজ ও বোম্বাই। বোম্বাইতে ফিরোজ শা মেটা, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং প্রভৃতি নেতারা সুরেন্দ্রনাথকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করলেন। এখান থেকে গেলেন পুণায়। পুণায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের বাড়িতে।

এক কথায় সারা ভারতে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরেছিলেন। তারপরে ভারত-সভা ঠিক করলেন, এর জন্য বিলেতে জনমত তৈরি করা দরকার। সেজন্য সুরেন্দ্রনাথেরই যাওয়া দরকার বিলেতে, কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তখন পাঠানো হলো লালমোহন ঘোষকে। ইনিও কম বড়ো বাগ্মী ছিলেন না। জন ব্রাইটের মতো সুদক্ষ বক্তাও তাঁর ভাষণ শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, লালমোহন ঘোষ সেই সময়ে পার্লামেন্টে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছিলেন। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে জিতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী। কিন্তু তার আগে লালমোহন ঘোষ কিভাবে বিলাতে গেলেন, সে-কথা বলা দরকার। বিলাতে লোক পাঠানো বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কি করে টাকা তোলা যায় যখন ভাবা হচ্ছিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন, দেশ জুড়ে এই যে আন্দোলনের প্রবাহ বইছে, এতে আছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন। এটা জেনে সুরেন্দ্রনাথ আর দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বহরমপুরে গিয়ে রাজীবলোচনের সঙ্গে দেখা করলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী সব কথা শুনে সেদিন অর্থ সাহায্য না করলে লালমোহন ঘোষ বিলেত যেতে পারতেন না। মূলতঃ লালমোহন বাবুর বক্তৃতা ও তার প্রভাবে প্রভাবিত পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য জন ব্রাইটের চেষ্টায় ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। এককথায়, জয় হয়েছিল লালমোহনের, তথা সুরেন্দ্রনাথের।

সুরেন্দ্রনাথের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেনরী কটন যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আজও আমার মনে আছে। তিনি বলে

ছিলেন,—The Bengalee babus now rule public opinion from Peshwar to Chitagong.

এরপরে দেশব্যাপী আরও দুটি আন্দোলন দেখা দেয়। বড়লাট তখন লর্ড লিটন। দেশীয় সংবাদপত্র, বিশেষ করে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণ, আর ভারতবাসীদের নিরস্ত্র-করা, এই দুটি আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার অন্যতম নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখন অর্ধেক বাংলা আর অর্ধেক ইংরেজীতে প্রকাশিত হতো। রাতারাতি পত্রিকাটি ইংরাজীতে রূপান্তরিত হয়। ১৮৭৮ এর ২১শে মার্চ তারিখে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হলো, "It is with deep regret that we past with our vernacular columns."

একই কারণে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কিন্তু তাঁর 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে জনমত তীব্র হয়ে উঠেছিল, লর্ড-লিটন বিদায় নিলে লর্ড রিপন আসেন। তিনি ঐ কুখ্যাত 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' উঠিয়ে দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে এর সম্পাদক হন। একুশবছর সাপ্তাহিক হিসাবে চালাবার পর ১৯০০ সালে এটি দৈনিকে পরিণত হয়েছিল। যাই হোক, প্রথম পাঁচবছর বেঙ্গলীর সম্পাদনার কাজে সুরেন্দ্রনাথের যিনি দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন, তিনি হচ্ছেন আশুতোষ বিশ্বাস। পরে আশুবাবু ওকালতিতে পসার বাড়ায় সাংবাদিকতা ছেড়ে দেন। পরে যখন আলিপুর বোমার মামলা হয়, তখন আশুবাবুই সরকার পক্ষের উকিল হয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে যান। ফলে বিপ্লবীদের হাতে তিনি মারা যান শোচনীয় ভাবে। সে-কথাও বলবো যথাস্থানে।

১৮৮৩ সালে ঐ 'বেঙ্গলী'কে কেন্দ্র করেই একটি ঘটনা ঘটে। বিচারপতি নরিস সাহেব কী একটি মামলার ব্যাপারে আদালতে

হিন্দুদের পবিত্র শালগ্রাম শীলা আনবার হুকুম দিয়েছিলেন। ভুবনমোহন দাস তাঁর 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' কাগজে এ-সম্পর্কে কিছু সমালোচনা লিখেছিলেন। এটা পড়ে সুরেন্দ্রনাথও 'বেঙ্গলী'তে কিছু লেখেন। ভুবনবাবু তাঁর কাগজে আবার কিছু লিখলেন। তারপরে বেঙ্গলীতে সুরেন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন ঐ ঘটনাটার। আর যায় কোথায়? আদালতের অবমাননা করার জন্য অভিযুক্ত হলেন সুরেন্দ্রনাথ। নিজে তখন তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু হলে হবে কী, বিচারের জন্য তাঁকে হাইকোর্টে যেতে হলো। লোকে লোকারণ্য। ছাত্রদের বিক্ষোভই বেশি। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পাইকপাড়ার রাজাদের ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ একলক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে আদালতে উপস্থিত, জরিমানা হলেই এ-টাকা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেবেন। কিন্তু জরিমানা হলো না, হলো দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড। জনসেবার কাজে কারাদণ্ড ভোগের ব্যাপারে লোকমান্য তিলকের পরে তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যক্তি। যাই হোক, জেলে প্রথম যিনি দেখা করলেন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে, তিনি তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ বিহারীলাল গুপ্ত। ইনি তখন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড যেন বহ্নি সঞ্চার করেছিল সারা দেশে। সে বিপুল ক্ষোভের তুলনা হয় না। এমন কি, শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিল, এবং সম্পাদক রবার্ট নাইট, সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী যখন জেলে স্বামীকে দেখতে যান, তখন নিজে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জেল হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা পোষাকের সঙ্গে কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কলকাতার দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই উত্তেজনার মুহূর্তে কেশবচন্দ্র সেন বার করলেন এক পয়সার 'সুলভ সমাচার,' যোগেশচন্দ্র বসু 'বঙ্গবাসী' আর কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী'। এইসব কাগজ আগ্রহের সঙ্গে

সবাই পড়তে লাগলো সেদিন। একজন লিখে গেছেন যে ভারতে এক সাড়া পড়ে গেল। কবি-রবির সভাপতিত্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করলেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রেইস অ্যাণ্ড রাইয়ত' পত্রিকা এবং বোম্বাইয়ের 'ইন্দু প্রকাশ' কালো শোকচিহ্ন ধারণ করে পাঠক সমীপে উপস্থিত হতে লাগলো। ময়দানে সভা হলো। তাতে সভাপতিত্ব করলেন ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। যোগ দিলেন অশীতিবর্ষ বয়স্ক পলিতকেশ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান নেতা সৈয়দ আমেদও সভা করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। আপীলের জন্য উদ্যোগী হলো 'মিরার'-এর নরেন্দ্রনাথ সেন, বিলেতে ছুটলেন লাল মোহন ঘোষ। ১৮৮৩র ৪ঠা জুলাই মুক্তি পেলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই বারেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দ মঠ'-এর রচনা শেষ করেন ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

এর পরে স্থাপিত হলো 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' বা 'ন্যাশনাল ফণ্ড' যার পরিণতি ঘটলো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সে। এর পরের ঘটনা ইলবার্ট বিল আন্দোলন। ভারতীয়রা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হলেও শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে পারতেন না। লর্ড রিপন এই অদ্ভুত নিয়ম বদ্‌লাতে চাইলেন, তাঁর আইন-সচিব চার্লস ইলবার্ট আইন সভায় বিল্‌ আনলেন। এই বিল্‌কেই বলা হয়,—ইলবার্ট বিল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। তাঁদের পক্ষে দাঁড়ান ব্যারিস্টার ব্র্যানসন, আর বিলের স্বপক্ষে নেতৃত্ব করলেন লালমোহন ঘোষ। এক সাহেব বলেছিলেন,—'The Ilbert Bill controversy has a turning point in the history of India's Nationalism.

এই নতুন রাজনৈতিক চেতনাই আত্মপ্রকাশ করলো ১৮৮৩র ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সম্মেলনে। সারা ভারতের নেতারা এসেছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিনের সভাপতি

হয়েছিলেন পক্ককেশ রামতনু লাহিড়ী। তাঁর পাশে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন।

লর্ড রিপনের পর বড়লাট লর্ড ডাফরিন। কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের পরের বছরেই হলো একটি আন্তর্জাতিক মহামেলা। তারপরেই হলো মাদ্রাজের মহাজন সভার উদ্যোগে প্রাদেশিক সভা এবং বোম্বাইতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। এর পরে হিউম সাহেবের প্রেরণায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। সে-কথা আগেই বলেছি। আগেই বলেছি দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের কথা। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা গান গাইলেন,—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।'

এর পরে ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে জিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার পরিচয় হয়। এই অধিবেশনেই Indian Arms Act বা অস্ত্র-আইন নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়েছিল। সাহেবরা বন্দুক রাখার লাইসেন্স পাবে, আর ভারতীয়রা পাবে না, এ কেমন কথা? উঠিয়ে দিতে হবে এই আইন—এই-ই ছিল কংগ্রেসের দাবি। তাছাড়া ছিল ভারতে স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে বিলাতে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ। ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে এ-নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রতিনিধি-দল বিলাতেও গেলেন। দলে ছিলেন হিউম ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, ফিরোজ শা মেটা প্রমুখ, সব মিলিয়ে আটজন। বিলাতে কংগ্রেসের প্রচারও ছিল সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম লক্ষ্য। এ-সব সেরে তিনি দেশে ফিরলেন ৬ই জুলাই ১৮৯০ সালে। এর পরে তাঁকে দেখি কলকাতা করপোরেশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে। বলা বাহুল্য বিপুল ভোটে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু সে সব কথা থাক। ১৮৯৫ সালে পুণায় কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব

করতে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই অধিবেশনে তাঁর ভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই ভাষণে তিনি সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি করেছিলেন, **'Congress is the non-official parliament of the Nation'.**

পুণা-কংগ্রেসে তিনি নাটু-ভ্রাতাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আগে পুণায় প্লেগ-সংক্রান্ত কথা বলতে গিয়ে চাপেকার-ভ্রাতাদের প্রসঙ্গ এবং র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যার কথাও বলেছি। এরই জের টেনে পুণার বিশিষ্ট নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনা বিচারে নির্বাসন দিয়ে তাদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালের অমরাবতী কংগ্রেসে। এইরূপ উত্তেজনাকর জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লর্ড কার্জন এলেন বড়লাট হয়ে। সে সময়, ১৮৯৮তে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন আনন্দ মোহন বসু। পরের বছর লক্ষ্ণৌতে হয়েছিল অধিবেশন। সেবার সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন,—তোমাদের মধ্যে ম্যাজিনী কে হবে? উত্তর আসতো, আমরা সবাই। কিন্তু সত্যিই কি আর সবাই ম্যাজিনী হতে পারে। ডঃ অ্যানি বেসান্ট ভারতের ম্যাজিনী বলে অভিহিত করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে। ১৮৭২ সালে ম্যাজিনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঐ বছরের ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথা এবার বলবো।

এইখানে, আবার আমার নিজের কথা একটু বলতে হচ্ছে ওপরের ঐ পর্যন্ত লেখার পর শেফালীর খাতা শেষ হয়ে গেছে

এবং ঐ পর্যন্ত যা ও লিখেছিল, তা একনাগাড়ে ও আমাকে পড়ে শোনায় নি, দু-দিন কী আড়াই দিন লেগেছিল। ততদিনে আমি যে উঠে বসতে পেরেছি, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাতখানা কাঁধের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছি বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে একটু-আধটু চলাফেরায় কোনো কষ্ট নেই।

শেফালী খাতা শেষ করার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—এর পর কী হবে ?

শেফালী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো, বললো,—এরপর আরও লিখতে হবে।

এবং এক কথায় শুরু হলো সে-এক তপস্যা। দাদু, দাদুর ঘর, দাদুর বই আর ডায়েরী, এ-নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ও খাতা লেখায় মেতে গেল। এই সাতদিন আমি উসখুস করে কাটাচ্ছি। একবার ভাবছি, ও-ঘরে ঢুকে যাবো ? আবার ভাবছি, না থাক, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কাজ নেই।

সলিল ডাক্তার এর মধ্যে দু-দুদিন এলেন। বললেন,—এই তো, ভালো হয়ে গেছো হে ?

গম্ভীর হয়ে বললাম,—ডাক্তারবাবু, এবার আমি বাড়ি যেতে পারি ?

ডাক্তারও কথাটা শুনে গম্ভীর হলেন, বললেন,—না, অন্ততঃ আরও মাসখানেক না গেলে বিপদ কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম,—বাড়িতে তো ভাবছে।

ডাক্তার সস্নেহে আমার কাঁধে হাতখানা রেখে বললেন,—না, ভাবছে না। আমরা কায়দা করে জানিয়ে দিয়েছি।

অবাক হয়ে বললাম,—কি করে ?

ডাক্তারবাবু গলা নামিয়ে বললেন, শেফালীর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তোমার বাড়িতে নিতাই কিংবা নিতাইয়ের মাকে পাঠানো হতো, কিন্তু শেফালী বললে, না, সন্দেহ করতে পারে। পুলিশের লোক যে আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে বসে নেই কে

বললে ? তাছাড়া, পাড়ার ছেলেরা জানলেও বিপদ। তাই, ও-ই পরামর্শ দিলে। আমার কমপাউণ্ডারকে এ-পাড়ার কেউ চেনে না। তাকে দিয়ে একখানা উড়ো চিঠি পাঠালুম খামে মুড়ে। সে চিঠি-খানা তোমার বৌদির হাতে দিয়েই চম্পট দিয়েছিল। খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়তে পড়তে আমার কম্পাউণ্ডার হাওয়া।

—কী লেখা হলো চিঠিতে ?

ডাক্তার বল্লেন,—কোন এক বন্ধু লিখছে, কোনো ভাবনা করবেন না, সঞ্জয় ভালো আছে, নিরাপদেই আছে। যথাসময়ে ফিরবে। চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলবেন।

—যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

—কেমন লাগছে এ-বাড়িতে ?

বললাম,—খুবই ভাল। তবে পড়ার আসরে আপনাকে পেলে ভালো হতো।

ডাক্তার বললেন,—মন ত ছটফট করে, কিন্তু সময়ই যে পাচ্ছি না। ওদিকে শেফালী যে তপস্যা আরম্ভ করে দিয়েছে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি !

—কীসের তপস্যা ?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন,—তোমাকে খুশি করার তপস্যা !

আমি মুখ নিচু করলাম! একটুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে বললাম,—ডাক্তারবাবু আমার চোখ খুলে যাচ্ছে ! আমি যেন—

বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। ডাক্তার আমার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি বুঝে গেছি।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। এবং তার কিছুদিন পরে আবার শুরু হলো পড়ার পালা। বললে,—মনে আছে ? রাসবিহারী বসুর জবানীতে সব-কিছু বলা হচ্ছিল ? তাঁর স্ত্রী তোসিকোর আগ্রহ দেখে রাসবিহারী তাঁর জন্মভূমির স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াকার কথাগুলো বলছিলেন। সাল-তারিখ সব যে মিলিয়ে মিশিয়ে সব

সময় বলতে পেরেছিলেন, এতটা কল্পনা করা যায় না,—ওটা দাদুর বই পত্তর ঘেঁটে আমিই বার-টার করে বসিয়ে দিচ্ছি আর কী! ভালো লাগছে না?

—খুব ভালো লাগছে। আপনি পড়ে যান।

শেফালী আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপরে কপালের কাছ থেকে হাওয়ায় উড়ে-আসা চুলের গোছা সরিয়ে ধীরে ধীরে পড়তে আরম্ভ করলো তার নতুন খাতাখানা।

শ্রীঅরবিন্দের বাল্যকথা বলতে গেলে তাঁর বাবা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ বা কে-ডি-ঘোষ, আই-এম-এস-এম-ডি-র কথা তো বলতেই হয়, কিন্তু তারও আগে বলা দরকার শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কথা। হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র, সতীর্থরা ছিলেন মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি। ১৮২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে জন্ম। ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ইংরেজী খাঁ' বলে ডাকতেন। মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করেছেন একটানা ষোলো বছর। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল সারল্য ও তেজ। স্বদেশানুরাগ ছিল প্রবল। 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। এই বিষয়ে প্রথম যে-রচনাটি লেখেন সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালে 'ন্যাশনাল পেপার'-এ। উদ্‌বুদ্ধ হলেন নবগোপাল মিত্র, তিনি শুরু করলেন 'স্বদেশী মেলা'। এই সময়ই রাজনারায়ণকে 'জাতির পিতামহ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,—মরবার আগে যদি দেশের একটি শত্রুকেও নিপাত করতে পারতাম, তবে বুঝতাম, জীবন সার্থক হয়েছে।

রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে বিবাহ হয় কে-ডি-ঘোষের। এদের প্রথম সন্তানের নাম বিনয়কুমার

ঘোষ। দ্বিতীয় পুত্র কবি ও প্রখ্যাত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। এই দুজন ও স্ত্রীকে রেখে ঘোষ সাহেব বিলেত গিয়েছিলেন ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শী হতে। ফিরলেন একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে। এরপরেই তাঁর তৃতীয় সন্তান লাভ। ইনিই হলেন অরবিন্দ। কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ বংশের সন্তান ডাক্তার কে-ডি-ঘোষ আয়ও যেমন করেছেন প্রচুর, তেমনি বদান্যতায় ছিলেন মুক্তহস্ত। অরবিন্দের যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, তখন তিনি ছেলেকে দার্জিলিঙে লেরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এরপরে ডাক্তার ঘোষের মেয়ে হলো। নাম রাখা হলো, সরোজিনী। মেয়ের জন্মের পর স্বর্ণলতার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটলো। সূত্রপাত আগেই হয়েছিল, এখন তা প্রবল আকার ধারণ করলো। ডাক্তার সাহেব সপরিবারে বিলাত যাত্রা করলেন, অরবিন্দের তখন সাত বছর বয়স। ম্যাঞ্চেস্টারে প্র্যাকটিশ করার চেষ্টা করতে লাগলেন ঘোষ সাহেব। চললো স্ত্রীর চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষা। ড্রুয়েট্-পরিবারে রেখে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের গ্রামার স্কুলেও তাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন। ছেলেরা ইংরেজী ও ল্যাটিনে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন এই ড্রুয়েট্ দম্পতির কাছ থেকেই। ১৮৮০ সালে ঘোষ সাহেবের ছোট ছেলে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ম্যাঞ্চেস্টারে জন্মলাভ করেন। বিলাতের চিকিৎসাতেও স্বর্ণলতা পুরোপুরি ভালো হন নি। তিন ছেলেকে বিলেতে রেখে স্ত্রী, কন্যা ও শিশু বারীন্দ্রকে নিয়ে দেশে ফিরলেন ডাক্তার ঘোষ। দেওঘরে রাজনারায়ণের কাছে এদের রেখে তিনি সরকারী ডাক্তার হয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে চলে যান। কাজের ব্যাপারে বদলি হয়েছেন বটে, কিন্তু চাকরির বেশির ভাগ সময়টাই তাঁর কেটেছিল খুলনায়। তাঁর বড়ো ছেলে বিনয়কুমার কুচবিহারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি নেন, মেজো মনোমোহনের ছিল কবি-খ্যাতি, তিনি প্রথমে ঢাকা ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের

অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। অরবিন্দ ক্যামব্রিজ ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপোজ পরীক্ষায় প্রথম হন। ইংরেজীতে তো বটেই, গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। রাশিয়ান প্রভৃতি অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষাও তিনি জানতেন। ১৮৯০ সালে বি-এ পাশ করার পর আই-সি-এস পরীক্ষাও দিলেন ডাঃ ঘোষের আদেশে। পরবর্তীকালে যে বিচ্‌ক্রফট সাহেবের আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল, সেই বিচ্‌ক্রফট-ই পরীক্ষায় তাঁর নিচের স্থানে ছিল। আই-সি-এস-য়ে খুব ভালো ফল করলেও অরবিন্দ ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিলেন না। এই সময় তাঁর মন দেশের দুরাবস্থার কথায় টলে উঠেছিল। সে সময় দাদাভাই নৌরজীও বিলেতে থাকতেন। তাঁর মডারেট-পন্থী রাজনৈতিক মতের প্রতিবাদ করতে তরুণ অরবিন্দ দ্বিধা করেন নি। অরবিন্দ 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' নামে একটি গুপ্ত সমিতিও গড়ে তুলেছিলেন বিলেতে। এসব কথা পল্লবিত হয়ে দেশে বাবার কানে ওঠা স্বাভাবিক। তিনি অরবিন্দকে দেশে ফিরে আসতে লিখলেন। যে জাহাজে অরবিন্দের আসার কথা, সে জাহাজে তাঁর আসা হয়নি। কিন্তু পথে আসতে সে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে ডাঃ ঘোষ ভাবলেন, ছেলেও বুঝি মারা গেছে। শোকে অত্যাধিক মদ্যপান করতে করতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মারা যান ডাক্তার ঘোষ, ১৮৯২ সালে।

শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরার তোড়জোড় করছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে করবেন কি? বরোদার তরুণ গাইকোয়াড় বা মহারাজা তখন অক্সফোর্ডের বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেতে এসেছেন। আলাপ হলো অরবিন্দের সঙ্গে। প্রায় সমবয়সী। মহারাজা তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করে কাছে কাছে রাখলেন। অতএব ফেরা হলো না দেশে। না ফিরলেও অরবিন্দ দেশের বিষয়ে ভালো করে জ্ঞান লাভ করবার জন্য দর্শন ইত্যাদি পাঠ করছিলেন। এমন সময় দৈবাৎ হাতে এসে পড়লো বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'।

ভালো বাংলা জানতেন না তবু আস্তে আস্তে কোনো রকমে পড়ে ফেললেন। বলা বাহুল্য, এর প্রেরণা ছিল সুদূরপ্রসারী।

যাইহোক, পুরো চৌদ্দ বৎসর বিলেতে কাটিয়ে অরবিন্দ ভারতে এলেন ১৮৯৩ সালের প্রথম দিকে। আগেই ছুটলেন দেওঘরে, দাদু ও মাকে দেখতে। মা তখন এমনই পাগল যে, নিজের ছেলেকে চিনতেই পারলেন না। বেশি দিন কাছে থাকবারও উপায় নেই, অরবিন্দ তাঁর কর্মস্থল বরোদায় চলে গেলেন। কিছুদিন রাজস্ব বিভাগের কাজ করার পর অরবিন্দ বরোদার রাজ কলেজের অধ্যাপক ও তার পরে ভাইস প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হলেন। অরবিন্দের ক্যামব্রিজের সহপাঠী কে-জি দেশপাণ্ডে বোম্বাই থেকে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদনা করছিলেন। এই পত্রিকায় অরবিন্দ বঙ্কিম ও 'বন্দেমাতরম'-এর ওপর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে একটি পংক্তি ছিল 'যা কিছুই ধ্বসে যাক বা রক্ষা পাক না কেন, বঙ্কিমের খ্যাতি কখনো নষ্ট হতে পারে না।' কিন্তু তারপরে যখন লিখলেন 'New Lamp for old' প্রবন্ধ তখন মারাঠী নেতা রাণাডেও পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। ফলে, ইন্দুপ্রকাশে লেখা বন্ধ হয়ে গেল। ঐ সময় বিবেকানন্দ লিখেছিলেন,—'হে ভারত! তুমি ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।'

অরবিন্দ ছাত্রদের মধ্যে স্বাদেশিকতার ভাব জাগাবার জন্য 'তরুণ সমিতি' গঠন করলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপরে মহারাষ্ট্রে প্লেগের ঘটনা ও চাপেকর ভাইদের ফাঁসি, এসব কথা আগে বলেছি। সরকারের এইসব দমন নীতি দেখে ডাঃ পরাঞ্জপে তাঁর 'কাল' কাগজে জ্বালাময়ী এক নিবন্ধ লেখেন। সেটি আবার 'কেশরী' পত্রিকায় ছাপলেন। 'কেশরী'র তৎকালীন সম্পাদক বিখ্যাত নাটুভ্রাতৃদ্বয়। আর যাবে কোথায়? পরাঞ্জপে ও নাটুভ্রাতৃদ্বয় অচিরেই নির্বাসিত হলেন।

ওদিকে, পুণায় ঠাকুর সাহেব বলে এক নেতা একটি গুপ্ত

সমিতির প্রতিষ্ঠা করলেন, অরবিন্দকে সভাপতি করে। চাপেকার-ভাইদের ফাঁসির পর তাঁদের 'হিন্দুধর্ম-সংঘ'-য়েরও ভার এসে পড়ে অরবিন্দের ওপর। এর ফলে তার নিজের 'তরুণ সমিতি' ও এই দুটি সমিতি, সব এক করে নিয়ে চালাতে শুরু করলেন তিনি। ঐ সময় বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে বাসনা হলো, কিন্তু বাংলাই বলতে পারেন না ভালো করে। বাংলায় এসে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করবেন কী ভাবে ? নাঃ! বাংলা শিখতে হবে ভালো করে। মামা যোগেন্দ্রনাথ বসুকে সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, শীগ্‌গিরই একজন বাংলা শিক্ষক পাঠিয়ে দিতে। 'পল্লীচিত্র' প্রভৃতির লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায়কে বরোদায় পাঠালেন যোগেন্দ্রবাবু। দীনেন্দ্র-কুমারের সাহায্যে তিনি বাংলা শিখে অচিরেই বিবেকানন্দের রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা প্রভৃতি একে একে পড়ে ফেলতে লাগলেন। এই সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থেরও অধ্যয়ন চলছিল।

বরোদার গাইকোয়াড় ছিলেন অরবিন্দের বিশেষ গুণমুগ্ধ। অরবিন্দেরই পরামর্শে তিনি তাঁর রাজ্যের দেওয়ান পদে বরণ করে আনলেন রমেশচন্দ্র দত্তকে। ১৮৯৯ সালে রমেশবাবু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছেন। পরের বছর আবার বিলেত গেলেন, প্রকাশ করলেন তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ বই **Famines in India.** আর ১৯০২ সালে 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম পর্ব। ১৯০২ সালেই বিলেত থেকে ফিরলেন, তাঁর জাহাজ এসে ভিড়লো মাদ্রাজে ঐ ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে। এই জাহাজে তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা।

এর পরে ঘটলো সারা ভারতেরই পক্ষে শোকাবহ ঘটনা, ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই, স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ। তার আগে দেহ রেখেছেন বঙ্কিম ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বৈপ্লবিক কার্য্যলাপের জন্য পুলিশের নজর নিবেদিতার উপর বেশি করে পড়ায় বেলুড় মঠের সঙ্গে

নিবেদিতার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আনুষ্ঠানিকভাবে। এ-না করলে মঠকে সেদিন বাঁচানো যেতো না। পুলিশ মঠে এসে বার বার হাজির হতো। কিন্তু নিবেদিতা ও মঠের সঙ্গে এই আপাত ব্যবধান গড়ে ওঠায় মঠ রক্ষা পেয়েছিল, অনেক বিপ্লবীকে ওঁরা মাঝে মাঝে তাই সহজেই লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন মঠের আওতায়।

ওকাকুরা ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিবেদিতার, সে-কথা আগেই বলেছি। গোপালকৃষ্ণ গোখলেও নিবেদিতার পরিচিতদের একজন হয়ে উঠলেন। গোখলে ছিলেন নিবেদিতারই সমবয়সী, তাই বন্ধুত্ব হয়েছিল সহজেই। কিন্তু নরম-পন্থী গোখলের থেকে চরমপন্থী তিলকের মানসিকতার সঙ্গেই নিবেদিতার মিল ছিল বেশি। গুরুর মহাপ্রয়াণের পর নিবেদিতার আহ্বান আসে যেমন যশোর থেকে, তেমনি আসে সুদূর লাহোর, বম্বে, পুণা প্রভৃতি জায়গা থেকে। কাজের প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েন নিবেদিতা। ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে পড়েন। এইখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অরবিন্দের, সাক্ষাৎ হয় রমেশচন্দ্র দত্তের।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, শরীর-চর্চ্চা ইত্যাদির মাধ্যমে যুবকদের তৈরি করার জন্য প্রমথ মিত্র 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করেছিলেন বটে, এবং বঙ্কিমের আদর্শে জাতীয়তার একটা ভিতেরও পত্তন হয়ত হয়েছিল, কিন্তু বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা তখনো তার সম্যক রূপ খুঁজে পায়নি। এই সময় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক তরুণের মনে বিপ্লব-প্রয়াসের প্রথম প্রেরণা জাগলো কার্যকরী রূপে। শরীর-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে, এই মনে করে তিনি সিপাহীদের দলে মিশতে গেলেন, কিন্তু বাঙালী বলে গৃহীত হলেন না, তাই চুপি চুপি চলে গেলেন বরোদায়, এবং অরবিন্দেরই চেষ্টায় নাম ভাঁড়িয়ে গাইকোয়াড়ের দেহরক্ষী বাহিনীতে ঢুকে সামরিক শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।

অরবিন্দ ততদিনে বিভিন্ন সাধুর কাছ থেকে যোগাভ্যাস শিখে নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে বিষ্ণুভাস্কর লেলে-র নামই বিশেষ করে করতে হয়। অরবিন্দ বাংলা শিখে 'ভবানী মন্দির' বলে একটি রচনা লিখেছিলেন। এই সময় তাঁর পিতৃবন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত একদিন তাঁকে ডেকে বললেন,—ওহে ভারী আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে গেছে।

—কী ঘটনা ?

রমেশচন্দ্র বললেন,—তার আগে তুমি বলো বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কিনা ?

—বিয়ে !

—হ্যাঁ, বিয়ে,—রমেশচন্দ্র বললেন,—ক্ষতি কী ; বহু মুণি-ঋষি বিয়ে করেও সাধনপথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে গেছেন। তুমিও না হয় তাদেরই পথ ধরবে ! বিশেষ করে একজন যখন যেচে তোমায় পতিত্বে বরণ করতে চাইছে।

—বলছেন কী !

রমেশচন্দ্র বললেন,—বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু আমাকে চিঠি লিখে কী জানিয়েছেন, জানো ? আমরা দুজনে যখন বিলেতে পড়তুম, তখন আমাদের এক বন্ধু ছিল, ভূপালচন্দ্র বসু। এই ভূপালের মেয়ে মৃণালিণী তোমার কথা লোকমুখে শুনে শুনে তোমাকেই স্বামীরূপে মনে মনে বরণ করে নিয়েছে।

অরবিন্দ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বিষয়টা ভাবতে লাগলেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলে লাভ নেই, বিবাহ উপলক্ষে বহুকাল পরে বাংলায় এলেন শ্রীঅরবিন্দ। বিবাহ হয়ে যাবার পর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিন্তু বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যাপারে তাঁদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না, একমাত্র তাঁর মেদিনীপুরের মাতুল জ্ঞান বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছাড়া। তিনি প্রমথনাথ মিত্র ও ঠাকুরবাড়ির সরলাদেবীর নাম শুনেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর মেয়ে এই সরলাদেবী। যুবকদের

তৈরি করার ব্যাপারে এঁর উৎসাহ আছে। 'বীরাষ্টমী ব্রত' প্রভৃতির উদ্ভাবিকা এই সরলাদেবীই। অরবিন্দের মেজদা কবি মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে সরলা দেবীর বন্ধুত্ব ছিল।

বরোদায় ফিরে এলেন অরবিন্দ। কিন্তু আর বেশি অপেক্ষা করা চলে না। তিনি 'উপাধ্যায়' বলে পরিচয় দিয়ে যাঁকে গাইকোয়াড়ের দেহরক্ষী করে ঢুকিয়েছিলেন, সেই যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে কাছে ডাকলেন। ইতিপূর্বে অরবিন্দ বাংলায় 'ভবানী মন্দির' বলে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন 'আনন্দমঠ'-এর 'সন্তানদল'-এর প্রেরণায়। এই 'ভবানী মন্দির' তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে পাঠালেন বাংলায়, বিপ্লবীদল গঠন করার জন্য। সঙ্গে দিলেন দুখানি চিঠি, একখানি সরলা দেবীকে, অন্যখানি প্রমথনাথ মিত্রকে। সরলা দেবী 'গুপ্ত সমিতি' স্থাপনে খুবই সাহায্য করেছিলেন যতীন্দ্রনাথকে, কিন্তু প্রমথবাবু ওতে রাজী হননি। তিনি যুবকদের লাঠি ও ছোরা খেলা প্রভৃতি শরীর চর্চাতেই আস্থাবান ছিলেন এবং এই চর্চার জন্যই 'অনুশীলন সমিতি' তৈরি করলেন, যে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি, নেতৃত্ব করতেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। যতীনবাবু এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন, কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন মেদিনীপুরে, অরবিন্দের মামা সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর দাদা জ্ঞান বসুর নেতৃত্বে। এই সব কাজকর্মে যুবকদের মধ্যে তখনকার দিনে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বরোদা থেকে অরবিন্দ এবার পাঠালেন ছোটভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষকে ১৯০৩ সালে, যতীনবাবুকে সাহায্য করবার জন্য। বারীন্দ্র পি মিত্র বা প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর অনুশীলন সমিতির উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বারীন্দ্রের সঙ্গে তিলক মহারাজের একখানা চিঠি ছিল। এই চিঠি নিয়ে দেখা করলেন 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক সখারাম গনেশ দেউস্করের সঙ্গে। মারাঠী ব্রাহ্মণ এই সখারাম বাংলায় বসবাস করছিলেন, বাংলা ভালোভাবেই

শিখে বাংলা পত্রিকার সম্পাদনায় রত হয়েছিলেন। এঁর সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল বারীন্দ্রের। তাঁর মুখে সখারামের সব কথা শুনে অরবিন্দ এক চিঠির মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেশের অর্থনীতি নিয়ে কিছু লেখবার জন্য। এর আগে বাংলায় শিবাজীর জীবনী লিখে সখারাম যশ লাভ করেছিলেন। এবার অরবিন্দের অনুপ্রেরণায় লিখলেন, 'দেশের কথা'। এই বই লেখার ব্যাপারে বারীন্দ্র ও তাঁর সহকর্মী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে অনেক তথ্য জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এই বই তখনকার দিনে এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে, ইংরেজ সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিলেন। ইংরেজের শোষণের ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য কীভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কীভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিল অর্থ নৈতিক কাঠামো, এসব নানান তথ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছিল এই বইতে। বাঙালীর স্বদেশ চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির দিক থেকে এই বইখানার মূল্য সেদিন ছিল অপরিসীম।

এই আবহাওয়ার মধ্যেই গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে উঠতে থাকে বাংলায়। ঢাকায় গড়ে উঠলো 'অনুশীলন সমিতি, যার নেতৃত্বে ছিলেন পুলিন দাস। বরিশালে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। এ-ছাড়া ছিল ফরিদপুরে 'ব্রতী সমিতি' ও মৈমনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমিতি।' শোনা যায় এই সুহৃদ সমিতির কোনো এক প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন সরলা দেবী। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ছেলেরা ধ্বনি দিয়েছিল 'বন্দেমাতরম'। এই থেকে নাকি ধ্বনি বা স্লোগান হিসাবে 'বন্দেমাতরম'-এর প্রচলন।

যাই হোক, গুপ্ত সমিতির কাজকর্মের ধারা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রের সঙ্গে মতান্তর দেখা দেয়। এবং সেটা শেষ পর্যন্ত এমন আকার নিলো যে, সমিতিগুলির ভার বারীন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যান।

সন্ন্যাসী হবার পর তার নাম হলো 'নিরালম্ব স্বামী'। সন্ন্যাসী হয়ে জপ-তপ নিয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে বহু বিপ্লবী এঁর কাছে গেছেন, উপদেশ-নির্দেশ নিয়েছেন।

ইতিপূর্বে নিবেদিতা বরোদায় সাক্ষাৎ করেছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে। বয়সে নিবেদিতা তাঁর থেকে পাঁচ বছরের বড়ো। কিন্তু আদর্শে দুজনেই এক। নিবেদিতা এই সাক্ষাৎকারকে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে করতেন। প্রথম কথাতেই তিনি অরবিন্দকে বলেছিলেন, কলকাতা চাইছে আপনাকে। আপনার যোগ্য জায়গা বাংলা।

অরবিন্দ বলেছিলেন,—না, আমি থাকতে চাই পিছনে। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা।

নিবেদিতা উত্তরে বলেছিলেন,—আমার উপর নির্ভর করতে পারেন। আমাকে বন্ধু বলে জানবেন।

এইভাবে দুজনের মধ্যে আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। তারই ফলে নিবেদিতা বাংলায় এসে গুপ্ত সমিতির জন্য কাজ করতে লাগলেন। মাতাজী তপস্বিনীর কথা আগেই বলা হয়েছে, এখন তরুণ দলের সঙ্গে মিশে প্রকৃত কাজ আরম্ভ।

বারীন্দ্র অরবিন্দের নির্দেশে কলকাতায় এসে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করলেন। বারীন্দ্র তখন মাত্র ২৩ বছরের যুবক। নিবেদিতা ও সরলাদেবী যুবকদের উৎসাহ দিলেও এ-কথা বলা যেতে পারে সরলাদেবী ঠিক বিপ্লবী ছিলেন না, বিপ্লবী ছিলেন নিবেদিতা। দুজনে সখ্যতা ছিল, নিবেদিতা সরলাদেবীকে বেলুড়ে নিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে। এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। নিবেদিতা যখন গেছেন বরোদায় অরবিন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে, ঠিক তখনি গেছেন সরলা দেবী লোকমান্য তিলকের সঙ্গে দেখা করতে।

সে যাই হোক, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেই কিন্তু অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত-সমিতির প্রথম নেতা বলা যেতে পারে। গুপ্ত সমিতির কাজও

চলছে সমানে ১৯০৩ সালে, সরলাদেবীর লাঠি খেলোয়াড়ের দলও চলেছে। এদের যোগসূত্র ছিলেন যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সরলা দেবীর কাছে ইনিই বেশি আসতেন। এঁর কাছ থেকেই সরলা দেবী বারীন্দ্রের খবর পেতেন। 'ভারতী' পত্রিকায় সরলাদেবী লিখে ছিলেন' 'ইংরেজ ঘুষি দিলে আমরা দেশী কিল দেবো' তবু তিনি ছেলেদের স্বদেশী-ডাকাতিতে মত দিতে পারেন নি।

যাই হোক, নিবেদিতা প্রথম সাক্ষাতের দিনে বারীন্দ্রকে বলেছিলেন,—দেশের জন্য দরকার হলে প্রাণ দিতে পারবে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন বারীন্দ্র,—আপনি যদি জোয়ান অব আর্ক হন, তাহলে নিশ্চয়ই পারবো।

সিস্টারের কাছে এই তরুণ বিপ্লবীরা ছিলেন সন্তানের মতো। ছেলেদের ঐ গুপ্ত সমিতিতে তাঁর নিজের লাইব্রেরীর জাতীয়তা-বিষয়ক বহু মূল্যবান বই দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতির ক্লাশের প্রথম ছাত্র বারীন্দ্র, তারপরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে। অর্থনীতি পড়াতেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। মানসিক প্রস্তুতি সম্যক না হলে বিপ্লব হয় না,—এ-কথা তখনকার নেতারা ভালো-করেই বুঝেছিলেন।

এই মানসিক প্রস্তুতির দিক থেকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকা ও ডন সোসাইটির অবদানও সেদিন কম ছিল না। নিবেদিতা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সতীশবাবু ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। নিবেদিতা শুধু 'ডন' নয়, বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজেও লিখতে শুরু করলেন। তাঁর মতামতকে তখন ইংরেজীতে বলা হতো, 'Aggressive Hinduism'। ১৯০৪ সালে নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় যান হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিরোধ মেটাতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু। ঐতিহাসিক সরকার পরে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন।

নিবেদিতা তখন গুরুর কৃপায় এক আশ্চর্য প্রেরণার বশে কাজ করে চলেছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান-চর্চায় বড়ো হতে সাহায্য করছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে বহুবার এসেছেন, নিবেদিতাও গেছেন তাঁর কাছে, এমনকি তাঁর শিলাইদহের কাছারী বাড়িতেও শোনা যায়, নিবেদিতার প্রেরণাতেই তিনি 'গোরা' উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

এসব ছাড়া নিবেদিতার ছিল নিজের আধ্যাত্মিক জীবন, ছিল তরুণ বিপ্লবীদের মানস-গঠনের কাজ। 'ডন' সোসাইটির সঙ্গে আরও একটি নাম উল্লেখ করা উচিত, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এঁর আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জীর ভাইয়ের ছেলে ইনি এবং বিবেকানন্দের সহপাঠী। জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, মৃত্যু ২৭শে অক্টোবর ১৯০৭। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানে যোগ দিয়ে ব্রাহ্ম হন। তার পরে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান হয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতাও করেন। কিন্তু তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। বিবেকানন্দের তিরোভাবের পর তিনি বিলেতে গিয়ে ক্যাম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডে হিন্দুদর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এঁর সম্পর্কে পরে আরও বলতে হবে।

লর্ড কার্জনের কথা আগেই বলেছি। ভদ্রলোক ১৮৯৮এর ৩০শে ডিসেম্বর বড়লাট হয়ে আসেন, ১৯০৫-এর ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে থাকেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ যেমন এঁর একটা কীর্তি, তেমনি অ-কীর্তি হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ। যুব-জাগরণে বড়লাট যেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাঁকে বিচলিত করেছিল। ১৯০৪ সালের শেষে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব বিলেতের মন্ত্রিসভায় পাঠালেন লর্ড কার্জন। এ-খবর অরবিন্দও পেয়েছিলেন। এর পর আর চুপ করে থাকা চলে না। ১৯০৪

সালের ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন তিনি। নেতাদের বোঝালেন সমূহ বিপদের কথা। লোকমান্য তিলকের সঙ্গেও দেখা করলেন। কিন্তু তিলক একা কি করবেন? কংগ্রেসের নেতারা তখন নরমপন্থী, তাঁরা গা করলেন বলে মনে হলো না। অরবিন্দ বুঝলেন, শুধু এদের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। কলকাতা থেকে বারীন্দ্র তখন বরোদায় চলে এসেছিলেন। কলকাতার গুপ্তসমিতিগুলি তখন ভেঙ্গে পড়েছিল বলা চলে, তাছাড়া পুলিশের তৎপরতার জন্যও তখন প্রায়ই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার দরকার ছিল। যাই হোক বারীন্দ্রকে তিনি আবার কলকাতায় পাঠালেন। বারীন্দ্র তাঁদের মেসোমশায় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সমস্ত খবরাখবর দিয়ে বরোদায় ফিরে গেলেন। অরবিন্দ তাঁর 'ভবানী-মন্দির' আর 'No Compromise' বলে একটি ইস্তাহার ছাপিয়ে বারীন্দ্রের হাত দিয়ে আবার তাঁকে বাংলায় পাঠালেন, সেটা হচ্ছে ১৯০৫ সালের মার্চ মাস। বারীন্দ্র তাঁদের গুপ্তসমিতির সভ্যদের খুঁজে বার করে সমিতিগুলিকে আবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ করাই স্থির করলেন কার্জন। তিনি বললেন,—Partition of Bengal is a settled fact. সুরেন্দ্রনাথকে বলা হতো 'Surrender-not', তিনি গর্জন করে উঠলেন,—We shall unsettle the settle fact.

বারীন্দ্রকুমার 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের প্রচার শুরু করলেন, আর সেই 'নো কম্‌প্রোমাইজ' ইস্তাহারটি চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন লুকিয়ে লুকিয়ে। শ্রীঅরবিন্দও এসে পড়লেন বাংলায়, ছুটি নিয়ে, ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে। বঙ্গভঙ্গ বিল যাতে পাশ না হয়, তার জন্য কৃষ্ণকুমার মিত্রকে নিয়ে জনমত গঠনের জন্য সভা-সমিতি করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু তবু রোধ করা গেল না। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ভারত সচিব বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে মত দিলেন। শুরু

হলো দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন। অরবিন্দ বললেন,—চাই অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, ও বিদেশী জিনিস বর্জনই শুধু নয়, সরকারী স্কুল-কলেজও বর্জন করতে হবে। 'সঞ্জীবনী'র মারফৎ প্রচার চললো। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'ও চুপ করে বসে রইলেন না। 'বেঙ্গলী'-অফিস থেকেই বার হতো 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সহকারী সখারাম গণেশ দেউস্কর। এঁরাও প্রচার চালাতে লাগলেন।

এই প্রসঙ্গে মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জের স্কুলের নাম করতে হয়। এই স্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয় করা হয়। বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ-বার্ষিকী উপলক্ষে ঐ স্কুলে সভা করতে আসেন কৃষ্ণ কুমার মিত্র, সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ও বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। এই স্কুলের হেডমাস্টার সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের শিষ্য। তিনি সেই প্রথম প্রকাশ্য সভায় বয়কটের কথা উত্থাপন করলেন। সভায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। দেশের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে শুরু হয়ে গেল স্বদেশী আন্দোলন। কলকাতার টাউন হলে হলো প্রতিবাদ-সভা, ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সালে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী হলেন সভাপতি। বিশিষ্ট যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, সূর্যকান্ত চৌধুরী, যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুন্দরীমোহন দাস, রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, এ-রসুল, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ গণ্যমাণ্য সবাই। এই সভায় অরবিন্দের বয়কটের প্রস্তাব সামনে আনলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। নেতৃপদে বরণ করা হলো সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কার্জন আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ১৯০৫-এর ১৫ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ

ঘোষণার দিন স্থির করে দিলেন। নেতারা শুনে এক বাক্যে ফতোয়া দিলেন,—ঐ দিনটি হবে আমাদের জাতীয় শোকের দিন।

১৫ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) সবাই গঙ্গাস্নান করে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ এলেন পুরোভাগে। এই সময় মন্ত্র হয়ে দেখা দিলো তাঁর একাধিক গান, খালি গায়ে তিনি নিজে সবার সঙ্গে পথ-পরিক্রমা করে সবার হাতে রাখী বাঁধছেন আর গাইছেন, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই'। এ ছবি যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাঁদের জীবন সার্থক।

অরবিন্দ কাজ আরম্ভ করে দিয়ে বরোদায় ফিরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে বারীন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন 'যুগান্তর' নাম দিয়ে একখানা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বার করতে, সে-সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কাগজ 'সন্ধ্যা'ও বার করলেন। বারীন্দ্র তাঁর সহযোগী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে পত্রিকা বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কার্জন বিলেত চলে গেলে, ১৯০৫-এর ডিসেম্বরের শেষে কাশীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন, সভাপতি মহামতি গোখলে। অরবিন্দ এই সভায় তিলককে দিয়ে তাঁর চার-দফা-সম্বলিত বয়কট-প্রস্তাব পাকা করাতে সচেষ্ট হলেন। বাংলার আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য অরবিন্দ চিঠি লিখলেন ডাঃ মুঞ্জে, খাপার্দে, লাজপত রায়, মদন মোহন মালব্য, প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাদের কাছে। কাশীর অধিবেশনে অরবিন্দ নিজেও এলেন বরোদা থেকে। কিন্তু সভা বয়কট-আন্দোলনের প্রস্তাব নিতে পারলো না। তবে অরবিন্দের 'জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন'-এর প্রস্তাবটি গ্রহণ করলো একটা ঘরোয়া বৈঠকে।

অরবিন্দ বরোদায় ফিরে গেলেন কতকটা আশাহত চিত্তে। ওদিকে ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো। এই 'যুগান্তর'-এর উদ্দীপনাময় বাণী পাঠ করে বাংলার

তরুণ দল সেদিন যে উদ্দীপনা লাভ করেছিল, তার তুলনা মেলা ভার। দলে দলে স্কুল-কলেজ ছেড়ে তারা দেশের কাজে এগিয়ে এলো। সরকারী সার্কুলার অনুসারে বহু তরুণ ছাত্রকে স্কুল-কলেজ থেকে বার করেও দেওয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠলো, এরা যাবে কোথায়? নেতারা কলকাতায় একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করলেন। কিন্তু এর পরিচালনা করবেন কে? একবাক্যে সবাই তুললেন একটি নাম,—শ্রীঅরবিন্দ। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দকে অনুরোধ জানালেন,—আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে আপনি অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসুন।

এ-আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন নি অরবিন্দ, বরং বলা যায়, এ আহ্বানেরই যেন অপেক্ষা করছিলেন তিনি। বরোদার উচ্চপদ ও উচ্চ বেতন ছেড়ে দিয়ে মাত্র দেড়শ' টাকা বেতনের শিক্ষকতায় চলে এলেন অরবিন্দ। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হলো। সভ্য হলেন সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ। আর শিক্ষকতা করবার জন্য যারা এলেন, অরবিন্দ ভিন্ন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় কুমার সরকার, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

যাই হোক, কলকাতায় অরবিন্দ এসে উঠলেন 'যুগান্তর' অফিসে। অতি সাধারণ বাঙালীর বেশবাস, যদিও পরিষ্কার বাংলায় তখনো কথা বলতে পারতেন না। দলে দলে ছেলেরা এলো প্রণাম করতে। বিকেলে এলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সখারাম গনেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। রাজা সুবোধ মল্লিক ওঁকে ঐ অপরিসর 'যুগান্তর'-এর অফিস বাড়িতে রাখতে রাজী নন তাই চারুবাবুকে পাঠিয়েছিলেন একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে নিজের বাড়িতে।

অরবিন্দ সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে বহুদিন ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজও করছেন, আবার অবিনাশ ভট্টাচার্য যুগান্তরের লেখাগুলি তাঁর কাছে আনলে সেগুলি সম্পাদনাও করে দিচ্ছেন। অরবিন্দ এসময় বাংলায় প্রবন্ধ লেখারও চেষ্টা করেছিলেন। যদিও বেশির ভাগ লেখাই লিখেছেন ইংরাজীতে, বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে তা ছাপতেন বারীন্দ্র। এই যুগান্তর বার করার ব্যাপারেও নিবেদিতার হাত ছিল। তাঁর বাড়ীতে বসেই বিবেকানন্দ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আর বারীন্দ্র সমস্ত জিনিসটা ছকে নিয়ে প্রথম সংখ্যার নিবন্ধাদি লিখে ফেলেছিলেন·।

এর পরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বরিশাল কনফারেন্স, ১৪ই এপ্রিল ১৯০৬ সাল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে বরিশালে। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ব্যারিস্টার এ. রসুল হলেন সভাপতি। তখন কার্লাইল সাহেবের সার্কুলার অনুসারে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু শোভাযাত্রার সময় সমবেত ধ্বনি উঠলো,—বন্দেমাতরম।

আর যায় কোথায়? এর্মাসন বলে যে ম্যাজিস্ট্রেটটি ছিলেন ওখানে, তিনি সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে চারশ' টাকা জরিমানা করলেন। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার বালক পুত্র চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ বেধড়ক লাঠির বাড়ি মেরে রক্তাক্ত করে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। তার অপরাধ সে ধ্বনি দিয়েছিল,—'বন্দেমাতরম'।

ছেলেকে তুলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সভায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। তারপর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। পুলিশ এসে জোর করে সভা ভেঙ্গে দিলো। নেতারা ফিরে এলেন কিন্তু নবগঠিত পূর্ববঙ্গের গভর্ণর অত্যাচারী ফুলারকে না সরালে আর চলছে না দেখা গেল। বরিশাল কন্‌ফারেন্সের এক মাস পরেই পরামর্শ সভা বসলো নিবেদিতার বাড়িতে। ফুলার বধের সিদ্ধান্ত হলো, এতে অরবিন্দও সায়

দিয়েছিলেন। ঠিক হলো হেমচন্দ্র দাস (পরে উপাধি কানুনগো লিখতেন) ফুলারকে শেষ করবে। তিনি ফুলারকে কিছুদিন চোখে চোখে রাখলেন বটে, কিন্তু সতর্ক মানুষটির কিছুই করতে পারলেন না। তখন শিলংয়ে ফুলারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন বারীন্দ্র। একদিকে চলছে এই কাজের চেষ্টা, অন্যদিকে হলো শিবাজী উৎসব। মাতৃমূর্তি গঠন করে পূজা। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজায় আপত্তি জানালেন। উপাধ্যায় মহাশয় এই উৎসবের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, তিনি চিত্তরঞ্জন দাসকে মধ্যস্থ মানলেন। সি-আর-দাশ বললেন,—কালীঘাটের কালীমন্দির বাদ দিয়ে আমরা কি কোনদিন দেশের লোকের কাছে পৌঁছতে পারবো?

কিন্তু সে প্রসঙ্গের দরকার নেই। শিবাজী-উৎসবের মাস দুই পরে ইংরেজীতে বন্দেমাতরম কাগজ বার হলো। প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, সহকারী অরবিন্দ ঘোষ। সঙ্গে রইলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। আগে বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজ ছিল। এতে স্বাধীনতার সমস্ত বাণী এই সময়ে প্রকাশ করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন উপাধ্যায় মশাই, শ্যাম-সুন্দরবাবু, ললিত ঘোষাল, হরিদাস হালদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিপিনবাবু রাজী হয়ে কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলেন, আর চাইলেন অরবিন্দের লেখা। অরবিন্দ বললেন,—বরিশাল কংগ্রেসে বালক চিত্ত গুহঠাকুরতা মার খেয়ে রক্ত ঝরিয়েছে, তবু 'বন্দেমাতরম' ছাড়ে নি! এই বন্দেমাতরম মন্ত্রের শক্তি কতখানি দেখলেন তো? কাগজের নাম বদলে 'বন্দেমাতরম' রাখুন। আর যদি পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন চাইতে রাজী হোন, আমি আপনাকে অর্থ সাহায্য পাবার ব্যবস্থাও করে দেবো।

রাজী হলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' রূপান্তরিত হলো 'বন্দেমাতরম' কাগজে। ১৯০৬ এর ৬ই আগষ্ট বেরুলো ইংরেজীতে লেখা 'বন্দেমাতরম' কাগজ। অরবিন্দ কাগজের মাধ্যমে

চাইলেন পুরোপুরি 'অটনমি ফ্রী ফ্রম ব্রিটিশ কন্‌ট্রোল'। বলা বাহুল্য, 'বন্দেমাতরম' লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়তো। একে শীগগিরই দৈনিকে পরিণত করা হলো। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই সন্ত্রাসবাদের ধারণা নিয়ে মত বিরোধ হওয়াতে বিপিনচন্দ্র সম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিলেন। নিবেদিতা যথারীতি সংশ্লিষ্ট রইলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ণ রিভিউ'তেও তিনি সমানে লিখতেন। মাদ্রাজ থেকে 'বালা ভারত' কাগজের সম্পাদনার ভার নেবার জন্য নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু নিবেদিতা যেতে পারেন নি, তিনি তখন সন্ত্রাসবাদী তরুণদলকে আয়ার্ল্যাণ্ডীয় 'সিনফিন'দের কার্যকলাপ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৩ই আগষ্ট ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর'-দল বোমা তৈরী শেখবার জন্য হেমচন্দ্র দাসকে প্যারিসে পাঠালেন। আর এই সময় ক্ষুদিরাম বসুর কথাও বলা উচিত। সত্যেন বসুর নির্দেশে মেদিনীপুরের এক সভায় ক্ষুদিরাম একটি ইস্তাহার বিলি করেন। তাতে রাজনৈতিক কারণে গুপ্ত হত্যার সমর্থন ছিল। বিপিনবাবু এই গুপ্ত হত্যার ব্যাপারটা সমর্থন করতে পারেন নি। অবশ্য সমর্থন না করলেও তিনি গোখলে প্রভৃতির মত মডারেট পন্থী হয়ে যান নি। আর তাঁর সেই মনোভাবই ফুটে উঠলো কলকাতা কংগ্রেসে। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে, যেখানে লোকমান্য তিলকের বদলে দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করা হলো। বিপিনবাবু 'বিদেশী সরকারকে বয়কট'-এর কথা তুললেন, গোখলে করলেন প্রতিবাদ। অর্থাৎ বাংলার 'বয়কট' প্রস্তাব লোকমান্য তিলক ছাড়া সর্বভারতীয় নেতারা সেদিন সমর্থন করতে পারেন নি।

এসব চলছে একদিকে, অন্যদিকে বারীন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে মানিকতলার বাগানে গুপ্ত ঘাঁটি করে আছেন। নিবেদিতা বোমা তৈরী করতে মোটামুটি জানতেন। সেটাই তিনি উল্লাসকর দত্তকে শেখাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু জিনিসটা অতো সহজও নয়।

হেমচন্দ্র দাস তখনো ওটা শিখে প্যারিস থেকে ফিরে আসেন নি। কিন্তু বারীন্দ্র আর উল্লাসকর আর দেরি সইতে পারছিলেন না। উল্লাসকর হঠাৎ নিজের চেষ্টাতেই বোমা তৈরীর একটি ফরমূলা আবিষ্কার করে ফেললেন। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুকে বলে তাঁর ল্যাবরেটরিতে যাতে উল্লাসকর কাজ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অন্য যুবকদের তিনি নিয়ে গেলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ল্যাবরেটরির চাবি ইচ্ছে করে ফেলে যেতেন। ঐ ছেলেরা কাজ করে চলে যাবার পর তিনি ফিরে এসে সব কিছু আবার ঠিকঠাক করে রাখতেন। অ্যাসিড যে উধাও হয়েছে সেটা দেখেও দেখতেন না। এঁদের নাম এইজন্য করছি যে, বাংলার বিপ্লব-সাধনায় সেদিন এমনিভাবে এঁদের দান কম ছিল না।

বাংলা 'যুগান্তর' ও ইংরাজী 'বন্দেমাতরম'—এই দুটি কাগজ সেদিন তরুণ দলের মর্মবাণীর প্রতীক ছিল বলতে পারা যায়। একে ঘিরে অনেকেই জড়ো হতে লাগলেন। চন্দননগর থেকে এক যুবক শিক্ষক 'বন্দেমাতরম'-এর জন্য একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠি পড়ে অরবিন্দের এতো ভালো লাগলো যে, শ্যামসুন্দরবাবুর মারফৎ তাঁকে আহ্বান জানালেন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেবার জন্য। ইনিই হলেন বারীন্দ্রের বিপ্লব সাধনার অন্যতম সহকর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাইহোক, রাজরোষ অচিরেই এসে পড়লো 'যুগান্তর'-এর ওপর। স্বত্বাধিকারী ও কর্মকর্তা হিসাবে ছাপা হতো অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম, আর মুদ্রাকর হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম। এঁদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। এই গ্রেপ্তার পর্বের আগে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। প্রথম হচ্ছে, পাঞ্জাবে কৃষক-বিদ্রোহের ফলস্বরূপ লালা লাজপত রায় ও অজিত সিং-এর গ্রেপ্তার ও সুদূর বার্মায় মান্দালয় দুর্গে নির্বাসন, যে কথার উল্লেখ বোধহয় আগেই করেছি। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম'-এ

লিখলেন,—'পাঞ্জাববাসীরা যুদ্ধ দাও, একজন লাজপতের জায়গায় একশ' লাজপত উঠে দাঁড়াও!

টাউনহলের সভায় নিবেদিতাও বললেন,—"No more words-words-words. Let us have deeds-deeds-deeds."

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে মৈমনসিংহের জামালপুরের ঘটনা। ব্রিটিশের উস্কানীতে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার বাড়িতে 'মুসলিম লীগ' গঠিত হয়েছিল,এবং তারই ফলশ্রুতিতে এক অন্ধ সাম্প্রদায়িক জনতা হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ব্রিটিশ প্রভুদের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' পলিসির বিষময় ফল ফললো। বিপ্লবী যাঁরা, দেশকে ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁরা কী হিন্দু কী মুসলমান,—এ ব্যাপার দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, মর্মাহত হলেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন এ আগুন থামাবার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—'বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক এক হউক, হে ভগবান!'

কিন্তু তাঁর ঐক্যের আকুতি উন্মত্ত জনতার হৃদয় সেদিন স্পর্শ করেনি। জামালপুরে উন্মত্ত একদল মুসলমান হিন্দুর প্রতিমা ভেঙ্গে ফেললো। হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়ে হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতেও তারা সেদিন দ্বিধা করেনি। বহু নারী ও শিশু অত্যাচারের ভয়ে 'দয়াময়ীর মন্দির'-য়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সতেরো বছর বয়সের এক কিশোর, সুধীর তার নাম। একটি ভাঙ্গা বন্দুক হাতে নিয়ে একা ওখানে রুখে দাঁড়াতে ইংরেজ পরিচালিত প্রমত্ত মুসলমান গুণ্ডার দল ভয় পেয়ে ফিরে যায়। আর মেয়েদের সম্ভ্রম ও শিশুদের প্রাণরক্ষা হয়। এই সব ঘটনার প্রত্যক্ষ তদন্ত করতে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ওখান থেকে ফিরলেন ৫ই জুলাই এবং ফেরা মাত্রই গ্রেপ্তার হলেন। এই সংবাদে নিবেদিতা বিচলিত হলেন। ভূপেন্দ্রকে মুক্ত করবার জন্য বহু চেষ্টা

করলেন, পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দশ হাজার টাকার জামীন হবার জন্য নিজে গিয়ে হাজির হলেন আদালতে, সঙ্গে নিজের সম্বল দশ হাজার টাকা। এর জন্য 'ইংলিশ-ম্যান' কাগজ নিবেদিতাকে 'দেশদ্রোহী' বলতেও দ্বিধা করেনি। বিচারে অবিনাশচন্দ্র অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। 'স্টেট্সম্যান'-এর সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। আর বন্ধু ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। সুরাট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অমৃতবাজারে নিবেদিতা নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতেন। দুই ভাই-বোনের মত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মতিলাল ও নিবেদিতার মধ্যে। প্রতি বছর তাঁকে ভাইফোঁটা দিতেন নিবেদিতা। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের ব্যাপারে প্রকাশ্যে কাজ করার জন্য বৃটিশ প্রভুরা চটে গেল। পুলিশ পিছনে লাগলো। তাঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিলো, আপনি নিজেই স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যান, নইলে যা দেখা যাচ্ছে, যে-কোনো ছুতোয় এসে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে।

নিবেদিতা হেসে বলেছিলেন,—আমি কি তার ভয় করি নাকি?

বন্ধুরা বললেন,—সে কথা নয়। আমাদের স্বার্থেই আপনাকে যেতে হবে। এখানে নজরবন্দী হয়ে থাকার চেয়ে বাইরে গিয়ে সেখান থেকে কাজ করতে পারবেন।

এই কথাটা মনে ধরলো। জগদীশ বসুকে সস্ত্রীক বিলেতে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে কিছুদিন পরে গেলেন। প্রিন্স ক্রপট্‌কিন লণ্ডনে ফিরে এসেছেন খবর পওয়া গেল, এর সঙ্গে দেখা করা তখন অবশ্যই দরকার। সেজন্য আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেলেন নিবেদিতা, ১৫ই আগষ্ট ১৯০৭ সালে।

ব্রিটিশ চণ্ডনীতি ক্রমশই নির্মম হয়ে দেখা দিচ্ছিল। 'যুগান্তর'-এর মুদ্রাকর বসন্ত ভট্টাচার্যের হলো দুই বছরের কারাদণ্ড। 'সন্ধ্যা' কাগজে 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' লেখার জন্য রাজদ্রোহের অজুহাতে

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও আটক হলেন। ব্রহ্মবান্ধব নিজে পুরোহিত ও মুদ্রাকরকে বর সাজিয়ে আদালত কক্ষে হাজির হওয়াতে বিচারক কিংসফোর্ড রেগে তাঁকে কঠিন সাজা দেবার ভয় দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙ্গুল দেখালেন ব্রহ্মবান্ধব, বললেন,—স্বরাজের সাধনায় যা করেছি, কোনো বিদেশীর কাছে তার কৈফিয়ৎ দেবো না। মানি না তোমাদের মামলা।

ইংরেজের আদালতে সত্যিই তিনি কৈফিয়ৎ দেন নি। বিচার চলাকালেই হাসপাতালে 'অ্যাপেণ্ডিসাইটিস' অস্ত্র করাতে গিয়ে মারা যান। ইংরেজ তাঁকে আর দণ্ড দিতে পারে নি। তাঁর কৌসুলী চিত্তরঞ্জন দাসকে তিনি হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে বলেছিলেন,—ইংরেজদের সাধ্য নেই আমাকে জেলে দেয়। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল।

'সন্ধ্যা'র পর এলো 'বন্দেমাতরম'-এর পালা। মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ এবং প্রধান লেখক হিসাবে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন। দেশময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো, আদালত প্রাঙ্গণে লোকের ভীড় আর ধরে না। সাক্ষী হিসাবে বিপিনচন্দ্র পালকেও ডাকা হয়েছিল। ইংরেজ ভেবেছিল, জেরার মুখে বেরিয়ে পড়বে 'বন্দেমাতরম'-এর বিদ্রোহকর লেখাগুলির সত্যিকার রচয়িতা কে। এটি প্রমাণ না হলে অরবিন্দকে সাজা দেওয়া যায় না। কিন্তু বিপিনবাবু আদালতে সোজাসুজি বললেন,—আমি সাক্ষ্য দেবো না।

ফলে, আদালত-অবমানার দায়ে ছ'মাসের জেল। তারিখ হচ্ছে ২৬শে আগস্ট ১৯০৭ সাল। আদালতের বাইরে প্রচণ্ড ভীড়। জনতার কণ্ঠ থেকে থেকে ধ্বনি উঠ্‌ছে,—'বন্দে মাতরম'। কিন্তু এ-ধ্বনি কি লালমুখোদের সহ্য হয়? একদল লালমুখো সার্জেন্ট বেটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো জনতার ওপর, বেধড়ক বেটন চালাতে লাগলো। পনেরো বছরের বালক সুশীল সেন। এ অত্যাচারের দৃশ্য সইতে না পেরে একটা সার্জেন্টকে ধরে প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে দেয়

তার মুখের ওপর। আর যায় কোথায়? ১৫ ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন কিংসফোর্ড, যার কাণ্ডকারখানায় অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালী টিট্‌কারী দিয়ে ছড়া কাট্‌তো তখন,—'মাই নেম ইজ কিংসফর্দ, আই অ্যাম এ গ্রেট মর্দ।'

বিচারকের সামনে সুশীলকে গুনে গুনে ১৫ ঘা বেত মারা হয়েছিল। বেত মারছে, আর সে চেঁচিয়ে উঠছে,—'বন্দেমাতরম' বলে। মারতে মারতে আধমরা করে দিয়েছিল তাকে।

২৮শে আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে বিরাট সভা হলো। শোভাযাত্রা করে জনতা সুশীলকে নিয়ে গেল সেই জনসভায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সোনার মেডেল সুশীলকে দেবার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন সেই সভায়। কালীপ্রসন্ন বিদ্যা বিশারদ লিখলেন,—'আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি, আমি কি মার সেই ছেলে? দেখে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি, কে পালাবে মাকে ফেলে?'

এই সুশীল সেনের কথা পরে আসবে। এই অসমসাহসিক, বীর্যবান ছেলেটি সেদিনকার তারুণ্যের প্রতীক, একে কোনোক্রমেই ভোলা যায় না। আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে, সুশীল এক ইতিহাসের স্রষ্টা, অথবা ইতিহাসের স্রষ্টা সুশীল তার দেশের আন্দোলনকে দ্রুত অন্য এক ধারায় প্রবাহিত করেছিল।

ওদিকে অরবিন্দের বিচারের দিন পিছিয়ে গেল। অরবিন্দ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিলেন। তা না হলে তার জন্য কলেজটাকে ইংরেজ বন্ধ করে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত এবার কাজ করতে হবে প্রকাশ্যে, পিছন থেকে নয়। কিন্তু 'অরবিন্দ ধৃত' এই সংবাদ দেশ জুড়ে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি লিখেছিলেন 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

কিন্তু বিচারক কিংফর্দ কিছুতেই আইনের কবলে আনতে পারলেন না অরবিন্দকে। প্রমাণাভাবে অরবিন্দকে মুক্তি দিতে

হলো। আর মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ এসে দাঁড়ালেন চরমপন্থীদের প্রকাশ্য নেতৃত্বে, বিপিনচন্দ্র তখন জেলে।

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ললিত ঘোষাল প্রভৃতিদের নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ গেলেন মেদিনীপুরের প্রাদেশিক কংগ্রেসের কন্‌ফারেন্সে। কিন্তু এই সূত্রে চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের কথা একটু বলা দরকার। যদিও আগে কিছু বলা হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শুনে বারীন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে চন্দননগরে এসে চারুবাবুর সঙ্গে পরিচিত হলেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতিকে নিয়ে চারুবাবু আগেই 'বিপ্লব সংহতি' গড়ে তুলেছিলেন। বারীন্দ্র এঁদের দলে টানলেন, যেমন করে টেনেছিলেন শ্রীরামপুরের গোঁসাই-পরিবারের নরেন গোঁসাইকে, নাড়াজোলের রাজাকে এবং উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। ১৯০৭-এর অক্টোবরে ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন উল্‌টে দেবার চেষ্টা হয়েছিল মানকুণ্ডু স্টেশনের কাছে, কিন্তু তাতে বিপ্লবীরা সফলকাম হতে পারে নি। এর পর ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সের দিনে নারায়ণগড়ের কাছে ফ্রেজার সাহেবের স্পেশাল ট্রেনে বোমা ছোঁড়া হলো, কিন্তু এবারেও লাটসাহেবের কিছু করা গেল না।

মেদিনীপুর কংগ্রেসে চরমপন্থীদের ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিভেদ স্পষ্টতররূপ ধারণ করলো। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অরবিন্দের কর্ম-ধারার বিচ্ছেদ ঘটলো কার্যত এইখান থেকে। পরে সুরাট কংগ্রেসে তা চরম আকার ধারণ করলো। এই কংগ্রেসের তিন দিন আগে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যালেন পিঠে গুলি খেয়ে আহত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য মরেন নি, বেঁচে উঠেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের দমন নীতি আরও কঠোর ও ব্যাপক হয়ে দেখা দিলো। তখন লালাজী অর্থাৎ লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং-এর খুব নাম, কারণ তাঁরা তখন নির্বাসন থেকে সবে ফিরে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে সুফি অম্বাপ্রসাদেরও নাম মুখে মুখে ফিরছিল। কিন্তু তা হলে হবে কী,

চরমপন্থীরা চাইছিলেন তিলককে সভাপতি করতে আর নরমপন্থীরা চাইছিলেন বাংলার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করতে। চরমপন্থীরা অরবিন্দের 'absolute autonomy-তে বিশ্বাসী, সুতরাং তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে কিছুতেই চরমপন্থীরা নেতা হতে দেবেন না, এরাও ছাড়বেন না, এই নিয়ে বিরোধ। কংগ্রেস-অধিবেশন শেষ না হয়েই ভেঙ্গে গেল।

এই কংগ্রেসের পর অরবিন্দ বোম্বাইতে জনসভায় ভাষণ দিয়ে পুণা, বরোদা প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। বরোদায় অরবিন্দ উপস্থিত হলে ছাত্ররা ঘোড়া খুলে নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগলো 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে। বরোদা রওনা হবার আগে বারীন্দ্র লেলে-কে তার করে দিয়েছিলেন। সে অনুসারে লেলে এসে দেখা করলেন। অরবিন্দকে তাঁর বাড়িতে কয়েকদিন রেখে যোগাভ্যাস করিয়েছিলেন।

এই লেলে বারীন্দ্রের অনুরোধ মতো ১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলায় এলেন। লেলে বারীন্দ্রদের বললেন, ভারত স্বাধীন হবেই, কিন্তু ও-পথে নয়। ভারত বিনা রক্তপাতেই মুক্তি পাবে। তবে তোমাদের বিপদ আসছে, মৃত্যুর থেকেও সে বিপদ ভীষণ।

লেলে বারীন্দ্রকে ও উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পারলেন না বলে প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিচ্ছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্র অনেক করে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রফুল্ল চাকী যদি সেদিন লেলের সঙ্গে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন, তাহলে তার জীবনের ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হতো। এই সময়কার কথা বারীন্দ্র বলেছিলেন,—'এক একটা জায়গায় বোমা ফেলবার ফরমাস আসে, আর কে এই কাজ করবে বা মরবে, তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যে যেতে পারে না, সে মুখ ভার করে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী একটা কাজে যেতে পারেনি বলে আমার ওপর উপর অভিমান করেছিল। কিন্তু তার অভিমানও রণচণ্ডী রাখলেন।

সে-কাজে মরবার কথা নয়, তবু আমাদের সব থেকে মনস্বী, বীর, মহৎ-চরিত্রের ছেলে প্রফুল্লই সে-কাজে আচম্বিতে নির্জন পাহাড়ে বোমা ফেটে মারা পড়লো।'

এই প্রফুল্ল চক্রবর্তী-সম্পর্কে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতেন,—'তার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, যে তাকে দেখেছে, সে-ই ভালো না বেসে থাকতে পারে নি।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। উল্লাসকর দত্তের তৈরী বোমা কেমন হয়েছে, তা ফাটিয়ে পরীক্ষা করতে ওঁরা গিয়েছিলেন দেওঘরের নির্জন দীঘাড়িয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে। বোমাটা পরীক্ষা করার ভার নিয়েছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী নিজে। কিন্তু বোমা ফাটলো, বোঝা গেল এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তীও চলে গেল। ওঁরা সবাই ফিরে এলো দেওঘর থেকে, ফিরলো না শুধু একজন।

কলকাতার বিপ্লবীদের তখনকার দিনে দুটি আস্তানা ছিল। 'যুগান্তর'-এর অফিসবাড়ি আর মাণিকতলার মুরারিপুকুরের বাগান। যুগান্তরের ম্যানেজার ও ছাপাখানার কর্তা অবিনাশ, আবার শ্রীঅরবিন্দের ঘরদোর সাম্‌লাবার কাজও তাঁর। স্বল্পভাষী এই নীরব কর্মী মানুষটির সঙ্গে বারীন্দ্রের বিপ্লবী দলের সম্পর্ক ঘটে যাচ্ছে কাজকর্মের মাধ্যমেই। অরবিন্দ ওঁকে ঐসব কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনবার কথা যখন ভাবছিলেন, তখন মনোরঞ্জন তাঁর 'নবশক্তি'-পরিচালনার জন্য একজন যোগ্য লোক খুঁজছিলেন। অরবিন্দ 'যুগান্তর' থেকে ছাড়িয়ে এনে অবিনাশকে দিলেন 'নবশক্তি'র ভার। 'যুগান্তর'-এর ভার নিলেন তারানাথ রায়। অরবিন্দ ও অবিনাশ উঠে এলেন 'নবশক্তি'র অফিস, ৪৮নং গ্রে স্ট্রিটে। সাল হচ্ছে ১৯০৮, এপ্রিল মাস। অরবিন্দের সহধর্মিণীও এখানে থাকতেন। থাকতেন অরবিন্দের ভগ্নীও।

ঐ সময় চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভেল স্বদেশী প্রচার

প্রভৃতির ব্যাপারে খড়গহস্ত হওয়ায় তরুণ দল ক্ষেপে গিয়েছিল। মতিলাল রায়, ননীলাল দে ও সাগরকালী ঘোষ তার্দিভেলকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেবার সঙ্কল্প করে কানাইলাল দত্তকে খবর দিলেন অস্ত্র সংগ্রহ করে দেবার জন্য। এরই ফলশ্রুতি ১৯০৮-এর ১১ই এপ্রিল রাত্রে তাঁর খাবার ঘরে তাঁর ওপর বোমা পড়লো। যদিও সে বোমা ফাটলো না, সাহেব প্রাণে বেঁচে গেলেন। হৈ-হৈ পড়ে গেল চন্দন নগরে, তার্দিভেল তল্পিতল্পা বেঁধে অচিরেই ফ্রান্সে পালালেন।

এইসব বোমাকেই ব্রহ্মবান্ধব বলতেন 'কালীমায়ীর বোমা'। বাংলার বিপ্লবীদের তখন লক্ষ্যস্থল ফ্রেজার ও ফুলার, আর কুখ্যাত বিচারক কিংসফোর্ড। মোটা একখানা বইয়ের মধ্যে বোমা পুরে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বই খুলবেন আর বোমা ফাটবে। কিন্তু সে কৌশল খাটে নি। কর্তৃপক্ষ সতর্ক ছিলেন, কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে পাঠালেন দায়রা জজ করে।

এইরকম সময়েই কানাইলাল মতিলাল রায়ের সঙ্গে দেখা করে কলকাতা রওনা হলেন নেতাদের আহ্বানে। সেবারই সে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, তখনো ফল বেরোয় নি। তার বিধবা মা, দাদা ডাঃ আশুতোষ দত্ত আর ছোট তিনটি বোন, অবিবাহিতা। 'চাকরির চেষ্টায় যাচ্ছি,'—বলে কানাইলাল কলকাতা চলে এলেন চন্দননগর ছেড়ে।

কথা হয়েছিল কিংসফোর্ডকে ধরাধাম থেকে সরাতে হবে। প্রথম এ-ভার পড়েছিল বিপ্লবী দলের অন্যতম প্রধান কর্মী নরেন গোঁসাইয়ের ওপর। কিন্তু ধনীর দুলাল শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। ডাক পড়ে কানাইলালের। কিন্তু তখনো বোমার ব্যাপারে প্রস্তুত নয় কানাইলাল। তাকে হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর কাছে বোমা তৈরির কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হলো। বলা বাহুল্য, প্যারিস থেকে হেমচন্দ্র ততদিন ফিরে এসেছেন। মজঃফরপুরের কাজের ভার দেওয়া হলো শেষ পর্যন্ত দুই তরুণের ওপরে। বিশ বছরের প্রফুল্ল

চাকী, আর সতেরো বছরের ক্ষুদিরাম বসু। ১৯০৮-এর ৩০ শে এপ্রিল। কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি মনে করে যে-গাড়িতে ওরা বোমা মারে, তাতে ছিল মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি, মা ও মেয়ে। নেহাৎ দুর্ঘটনাই বলতে হবে, নইলে কিংস্‌ফোর্ডের বদলে এরা মারা পড়বে কেন ?

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী তৎক্ষণাৎ পালালেন। কিন্তু দ্রুত পালাতে সুবিধা হবে বলে জুতো খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। কিছু দূর এসে দুজনে দুটি ভিন্ন পথ ধরলেন। একজন চললেন রেললাইন ধরে, অন্যজন সমস্তিপুরের দিকে।

সমস্তিপুরে এসে প্রফুল্ল টিকিট কাটলেন মোকামা ঘাটের, তারিখ হচ্ছে ১৯০৮ এর ১লা মে। ইতিমধ্যে নতুন জুতো পরে নিয়েছেন। দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জী ছুটির শেষে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিল, প্রফুল্লর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো। সে গোপনে টেলিগ্রাম করে দিলো কর্তাদের কাছে। পুলিশবাহিনী কর্তাদের আদেশে মোকামাঘাট স্টেশনে তৈরি থাকলো। প্রফুল্ল ট্রেন থেকে নামতেই তাকে গ্রেপ্তার করলোনন্দলাল। প্রফুল্ল নিজের নাম বলেননি নন্দলালের কাছে, বলেছিলেন—আমার নাম দীনেশচন্দ্র রায়।

দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল অবাক হয়ে নন্দলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,—বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দিলেন ?

কিন্তু ধরা দেবার পাত্র প্রফুল্ল নয়। এক ঝট্‌কায় কনষ্টেবলদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলেন। ওরা পিছনে পিছনে ছুটে আসছে দেখে রুখে দাঁড়িয়ে পিস্তলের গুলি ছুঁড়লেন। কারও গায়ে অবশ্য লাগল না! তারপর সে পিস্তল নিজের দিকে ঘুরিয়ে গুলি করলেন পর পর দুটো। লুটিয়ে পড়লো প্রাণহীন দেহ। কিন্তু কে এই দীনেশ রায় ? ইংরেজের আদেশে প্রফুল্লর মাথা কেটে স্পিরিটে ডুবিয়ে কলকাতায় আনা হলো সনাক্তকরণের জন্য।

জানা গেল দীনেশ নয়, বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রথম শহীদের নাম প্রফুল্ল চাকী, রঙ্‌পুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। বারীন্দ্রই এর স্বাস্থ্য বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে ওকে রঙ্‌পুর থেকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

ক্ষুদিরাম ওদিকে এসে পৌঁছেচে 'উইনি' স্টেশনে। সকাল হয়েছে সবে। এক দোকানদারের কাছ থেকে চিড়ে কিনে নিয়ে খেলেন। তারপরে সবে জলটি মুখে ঠেকিয়েছেন, এমন সময় পুলিশ এসে ধরে ফেললো। অকথ্য অত্যাচারে সতেরো-আঠারো বছরের বালক হয়ত কিছু স্বীকারোক্তি করে ফেলেছিলেন। তারই সূত্র ধরে পরদিন, অর্থাৎ ২রা মে মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করেছিল। বারীন্দ্রকুমারের মুখে শোনা যায়, 'মুরারীপুকুর বাগানে আমরা ধরা পড়ি চৌদ্দ জন। আমি, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন্দ্রকুমার সেন, বিজয়কুমার নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, শিশির ঘোষ, পরেশ মৌলিক, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন আর হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আগের দিন মজঃফরপুরের বোমা-ফেলার সংবাদ পেয়েই অরবিন্দ অবিনাশকে বারীন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে তাকে সাবধান হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো অনেকে গা ঢাকা দিলো। কয়েক বাক্স বোমা নিয়ে উল্লাসকর হ্যারিসন রোডের এক মেসে গিয়ে উঠলেন। হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) কানাইলাল দত্তকে নিয়ে নিজের বাসায় চলে গেলেন। কিন্তু এতেই শেষ রক্ষা হলো না। মতিলাল রায় বলেছিলেন—ব্যারিস্টার বি-সি-চ্যাটার্জী বিপ্লবের কাজে সাহায্যও করতেন। তাঁরই চেষ্টায় ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা হয়েছিল সেদিন। ক্ষুদিরাম সেই মতো আদালতে সব-কিছু অস্বীকার করলো। সেই থেকে অত্যাচারে বা প্রলোভনে কিছুই আর তার কাছ থেকে বার করা যায় নি। মামলা চলার

সময় ক্ষুদিরাম বলেছিল,—আমি মেদিনীপুরের ছেলে। আমার কেউ বেঁচে নেই, এক দিদি ছাড়া।

এই ক্ষুদিরামের বিপ্লব-পথের গুরু দুজন, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো আর অরবিন্দের মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই সত্যেন্দ্র বসুকেও মেদিনীপুর থেকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

মেদিনীপুরের কথা আর একটু বলি। হেমবাবুর কয়েকটি বোমা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে একটি ট্রাঙ্কে ছিল, সেগুলি খানাতল্লাশীর আগেই ক্ষুদিরাম বসু ও সহকর্মী যোগজীবন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রর বোনেরা সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল। আলিপুর বোমা মামলায় কয়েকজনের স্বীকারোক্তি থেকে ইংরাজরা বুঝতে পারে যে কলকাতার মতো মেদিনীপুরেও রয়েছে বিপ্লবীদের একটা ঘাঁটি। সুতরাং যেমন করে পারো মেদিনীপুরের মেরুদণ্ডকে চুরমার করো। পুলিশের লোক লুকিয়ে ঘরের মধ্যে বোমা রেখে পরে খানাতল্লাশী করে সেই বোমা বার করে বাড়ির লোককে ধরে নিয়ে গেছে, এ-দৃষ্টান্তও প্রচুর। ঐ ১৯০৮-এরই ৮ই জুলাই প্যারীমোহন দাসের মেজো ছেলে সন্তোষ দাসকে ঐ ভাবে ধরে নিয়ে যায়। একইভাবে ধরে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বেশ কয়েক জনকে। এদের বিরুদ্ধে যে মামলা সাজানো হয়েছিল, তা ঐ দুটি বোমা আর দুখানা দলিলের ওপর। এই ঘটনার নায়ক ছিল রাখালচন্দ্র সাহা বলে মাতাল একটা লোক, যাকে পুলিশ ইনফরমার নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলায় জিততে হলে রাজসাক্ষী চাই। পুলিশ ঐ সন্তোষ দাসকেই রাজসাক্ষী করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুতেই যখন কথা বার করা গেল না, তখন সন্তোষবাবুর পিতা প্যারী মোহন দাসকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে গিয়ে ছেলের সামনেই অকথ্য প্রহার শুরু করে। একদিন-আধদিন নয়, দিনের পর দিন। এই নির্মম অত্যাচারের দৃশ্য সইতে না পেরে ২৯শে জুলাই সন্তোষ পুলিশের নির্দেশমতো একটা স্বীকারোক্তিতে সই দিলেন। কিন্তু

৩১শে আগষ্ট সন্তোষ আর সুরেন দুজনেই আদালতে দরখাস্ত পেশ করে ঐ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এবং এ-মামলার চরম নাটক ঘটেছিল ৪ঠা নভেম্বর, যখন ঐ মাতাল রাখাল সাহা সমস্তই সাজানো আর মিথ্যা বলে আদালতে বিবৃতি দিলো। ফলে মামলা ফেঁসে যায় দেখে ব্রিটিশ প্রভুরা কলকাতা থেকে এডভোকেট জেনারেল সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে পাঠালেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বুঝলেন এ মামলা টেঁকার নয়, তাই ২৪ জনের ওপর থেকে মামলা উঠিয়ে নিলেন। বাকী রইলেন শুধু তিনজন, যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষ কুমার দাস আর সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এদের মামলার রায় বেরিয়েছিল ১৯০৯-এর ৩০শে জানুয়ারি। তিনজনেরই দশ বছরের দ্বীপান্তর। রায়ের বিরুদ্ধে অবশ্য আপীল করা হলো হাইকোর্টে। স্যার লরেন্স জেংকিন্স ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই আপীল শুনেছিলেন। তাঁদের বিচারে তিনজনেই মুক্তি পেয়েছিলেন। এদের পরে পুলিশের রাগ গিয়ে পড়লো রাখালচন্দ্র সাহার ওপরে। মিথ্যাসাক্ষ্য দানের মামলা সাজানো হলো। জেল হয়ে গিয়েছিল তিন বছরের।

কিন্তু ক্ষুদিরামের কথা বলতে বলতে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছিলাম। যাকে নিয়ে ভিখারীরা গান গাইতো সেদিন, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি,—তার কথা বাঙালীর বিস্মৃত হবার নয়। তার ফাঁসির তারিখ হচ্ছে ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সালের ভোর ছ-টা।

কিন্তু সে চলে যাবার আগে-পরে বহু ধরপাকড় হয়েছে, সাজানো হয়েছে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। তার সঙ্গে লেজুড় ছিল মেদিনীপুর বোমার মামলা। দ্বিতীয়টির কথা আগে বলা হয়েছে, এবার প্রথমটির কথা বলি। মুরারিপুকুর থেকে যাদের ধরা হয়েছিল তাদের কথা বলেছি। তারই জের টেনে পুলিশ ধরে নিয়ে এলো হেমচন্দ্র দাস কানুনগোকে আর উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, নিরাপদ রায় প্রভৃতিকে। আর গ্রেপ্তার করে আনলো স্বয়ং

শ্রীঅরবিন্দকে, সঙ্গে অবিনাশ ভট্টাচার্য্য শৈলেন্দ্রনাথ বসু। এ-খবরে গ্রে-ষ্ট্রীট লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মণীষীরা ছুটে এলেন। পুলিশ কমিশনার নিজেও এসেছিল। দেশনেতারা অনেক অনুরোধ করলেন, তবু পুলিশ অরবিন্দের হাতের হাতকড়া ও কোমরের দড়ি খুললো না। এতে মডারেটরা অতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদিন।

আর যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কবিরাজ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ধরণীনাথ গুপ্ত এবং নড়াইলের মতিলাল রায়, বর্ধমানের বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত ও কালিগঞ্জের অশোক নন্দী। বার্লি সাহেবের আদালতে বিচার হয়েছিল। বিজয় ও মতি ছাড়া পান, কিন্তু আর সবাই জেলেই থেকে যান। চন্দননগরের শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায়কেও ধরে আনা হয়েছিল, পরে অবশ্য সরকারই এঁর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিয়ে একে খালাস করে দিয়েছিলেন। ধৃতদের মধ্যে আরও নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই অন্যতম। এঁকে হাত কড়া দিয়ে নিয়ে না আসায় লোকের মনে খুব সন্দেহ হয়েছিল। আর ধরে আনা হয়েছিল যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামীকে। ইনিও অবশ্য বিচারে খালাস পেয়েছিলেন।

মিঃ বার্লির কোর্টে বিচার। অরবিন্দ বলেছিলেন,—'স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি প্রধান অপরাধী।

ওদিকে বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উল্লাসকর দত্ত নিজেদের কাঁধে সব দোষ নিয়ে জবানবন্দী দিয়েছিলেন আদালতে, উদ্দেশ্য, অন্যেরা যাতে সাজা না পান। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। বারীন্দ্র পুলিশের কাছে যা বলেছিলেন, তাতে নরেন গোঁসাইয়ের নামও এসে পড়েছিল। বারীন্দ্ররা সেদিন ভেবেছিলেন, প্রধান কয়েকজনের নাম শুধু বলবো, তাতে বাকিরা বাঁচবে। কিন্তু নরেন্দ্রকে ধরায় নরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত রাজসাক্ষী হয়ে সবার কথা

বলে দেয়। অবশ্য যতটা সে জানতো। শ্রীঅরবিন্দের ধরা পড়ার অন্যতম কারণ নরেন্দ্রের জবানবন্দী।

এই সব ঘটনায় বাংলা যখন তোলপাড়, তখন মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক গর্জন করে উঠলেন তাঁর 'কেশরী'তে। ফলে, তাঁকেও গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অপরাধে ছয় বছর নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবর নেতারা পেলেন জেলের মধ্যে বসে। ব্রহ্মবান্ধব নেই, শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে, বিপিনচন্দ্র পাল বকসার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিলেত চলে গেছেন, নিবেদিতাও বিলাতে তাই চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব এসে পড়লো শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ওপর। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহযোগিতায় শ্যামসুন্দরবাবু 'শ্রীঅরবিন্দ ডিফেন্স ফণ্ড' খুললেন, অনেক চেষ্টায় যোগাড় হলো চল্লিশ হাজার টাকা। শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মামলা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর ফি দৈনিক এক হাজার টাকা। একুশ দিনেই তার পিছনে একুশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। আর টাকা না থাকায় ব্যোমকেশ বাবু মামলা ছেড়ে দিলেন। তখন বিনা পারিশ্রমিকে যিনি এ-ভার কাঁধে তুলে নিলেন, তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর এই ত্যাগে প্রেরণা লাভ করে অন্য সব আসামীদের পক্ষ সমর্থনে যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্র (পি-মিত্র), ঢাকার নামকরা উকিল আনন্দমোহন রায়, বি-সি-চ্যাটার্জী, দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি শরৎচন্দ্র সেন, রজত রায়, নরেন্দ্রকুমার বসু ও বিজয়কৃষ্ণ বসুর নাম উল্লেখ করা উচিত।

মাস তিনেকের পর মামলা চলে গেল আলিপুরের দায়রা কোর্টে। বিচারক ছিলেন বীচক্রফ্‌ট্ সাহেব, যিনি আই-সি এস পরীক্ষায় অরবিন্দের ঠিক নিচেই ছিলেন। সরকার পক্ষে তিন জন ইংরেজ ব্যারিস্টার ছিল, তাঁদের সহকারী ছিলেন সরকারী উকিল আশু

বিশ্বাস। পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা তদ্বির করতেন, সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর সামস্থল আলম। দীর্ঘ এক বছর বার দিন এই মামলা চলেছিল। কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু ঘটনা ঘটেছিল। ঐ সময়ে চন্দননগরে বিপ্লব-প্রচেষ্টা দানা বাঁধছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায় আর সখারাম দেউস্করের ভাগ্নে বাবুরাম পরারকর। এঁদের মধ্যে শ্রীশই জেলের মধ্যে কানাইলালের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে। তারপরে শ্রীশ ও মতিলাল দুজনেই দেখা করেন। কানাইলাল চুপি চুপি সুযোগ বুঝে বললেন,—দুটি রিভলবার জোগাড় করে দিতে হবে, যেমন করে পারো। একজন বিশ্বাসঘাতককে খতম করতেই হবে।

এখানেও বাহুল্য বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। রিভলবার দুটি শ্রীশচন্দ্রই কানাইলালের হাতে কৌশলে দিয়ে আসেন। নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হওয়ায় তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। আসলে পুলিসের কাছে সে শ্রীঅরবিন্দের নাম করেছিল মাত্র, বেশী কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু জেলে গিয়ে সহবন্দীদের কাছ থেকে সে খুঁটিনাটি জানতে চেষ্টা করতো। কোর্টে এজাহার দিতে গিয়ে কী সর্বনাশ যে সে করে ফেলবে, কে জানে! তাই কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিরা তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাঁরা দুজন জেলের হাসপাতালে অসুস্থ বলে জায়গা নিয়েছিলেন, এর মধ্যে কানাইয়ের সত্যি সত্যি জ্বর হয়েছিল। তাঁরা নরেনের কাছে খবর পাঠিয়েছিল যে, তারাও রাজসাক্ষী হবে আর সেজন্য তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। এবং সেই মতো নরেন এসে বিছানায় বসেছে, সত্যেন্দ্র উঠে কথা বলতে বলতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি নরেনের উরুতে লেগে মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেল। সেই অবস্থায় নরেন হাসপাতাল ছেড়ে

দৌঁড় দিলো, কানাইও পিছু নিলো। তাড়া করতে করতে একসময় সুযোগ মতো পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করলেন, নরেন লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তারিখ হল ১৯০৮ সালের ৩১ শে আগস্ট। বিচারে দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়। কানাইয়ের ফাঁসি হয় ১৯০৮-এর ১০ই নভেম্বর সকাল প্রায় সাতটায়। বারীন্দ্র এ-সম্পর্কে বলতেন,—ফাঁসির আগে ওজনে সে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। মরবার দিন ভোরবেলা যখন তাঁকে ফাঁসি-মঞ্চে নিয়ে যেতে এলো সেপাইরা তখন সে অকাতরে ঘুমুচ্ছিল।

তার আগের দিন রাত্রে, অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর আরেকটি ঘটনা ঘটে গেছে। প্রফুল্ল চাকীকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই নন্দলাল ব্যানার্জীর হত্যা। কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, ও ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তি সংঘ'-এর যোগাযোগে এটি ঘটেছিল। হেমবাবুর প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীশচন্দ্র পাল। একাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন আত্মোন্নতির রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। একটা পুরাণো শিবমন্দিরের কাছে বসে শ্রীশ আর রণেন চিনেবাদাম খাচ্ছিল আর লক্ষ্য রাখছিল নন্দলালের বাড়ির দিকে। তাকে বাড়ির বাইরে আসতে দেখেই ওঁরা পিছু নিলেন। রাত তখন সাতটা হবে। সার্পেনটাইন্ লেনের পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসতেই তাকে গুলি করলেন শ্রীশ পাল। পড়ে গেল নন্দলাল। রণেন গাঙ্গুলী এবার গুলি করলেন তার মাথায়। কাজ শেষ, নন্দলাল আর উঠবে না। ওঁরা দুজন তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিলেন। এঁদের ধরা তো দূরে থাক, এঁদের নামও জানতে পারে নি পুলিশ।

যাই হোক, কানাইলালের দেহ জেল থেকে নিয়ে দাহ করবার জন্য এসেছিলেন তাঁর দাদা আশুতোষ দত্ত, সঙ্গে মতিলাল রায়। আলিপুর জেলগেট লোকে লোকারণ্য। জেল গেট থেকে ক্যাওড়াতলা শ্মশানে। বিশাল শোভাযাত্রা। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন। জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন বন্দেমাতরম।

এরপর ২১শে নভেম্বর ফাঁসি হলো সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। রাজনারায়ন বসুর ভাই অভয়াচরণ বসুর পুত্র, এবং অরবিন্দ-বারীন্দ্রদের মাতুল। এরপরে ঐ মাসেরই ডিসেম্বর মাসে বাংলার নেতাদের বন্দী করে নির্বাসনে পাঠানো হলো, এঁরা হলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, পুলিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পুলিনদাসের সহকারী ভূপেশচন্দ্র নাগ।

এরপরের ঘটনা সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসের হত্যা। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। যে তরুণ বিপ্লবী এই দুঃসাহসিক কাজ করেছিল, তার নাম চারুচন্দ্র বসু। একটা হাত ছিল তাঁর পঙ্গু। সেই পঙ্গু হাতে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল রিভলবার, বাঁ হাত দিয়ে ট্রিগার টিপেছিলেন। একেবারে দিনের আলোয়, আদালত-প্রাঙ্গণে। ধরা পড়লো চারু। অকথ্য অত্যাচার, কিন্তু তাঁর মুখে একটি কথা,—'দেশের শত্রু ঐ আশু বিশ্বাস, ওকে আমি সেজন্যই খতম করেছি। আপনারা দেরি করছেন কেন ? পারলে আজই ফাঁসি দিন, কাল নয়।'

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চারুচন্দ্রের ফাঁসি হয়েছিস ১৯০৯-এর ১৯শে মার্চ।

আলিপুর মামলার ব্যাপারে আরেকজন ব্যক্তিকে খতম করেছিল বিপ্লবীরা। ইনি সামসুল আলম। মিথ্যাসাক্ষী যোগাড় করা ইত্যাদি ষড়যন্ত্র করে বিপ্লবীদের বিনাশ করার চেষ্টায় ইনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের ডান হাত। ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী প্রকাশ্য দিবালোকে কোর্টের প্রাঙ্গণেই একে রিভলবারের গুলিতে খতম করেছিল বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত। বয়স তখন উনিশও পেরোয়নি, ঢাকার বিক্রমপুরের ছেলে। বাঘা যতীনেরই প্রেরণালব্ধ তরুণ এই বীরেন্দ্র। তাঁর ফাঁসির তারিখ ১৯১০-এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি।

এবার আর একটু পিছিয়ে আলিপুর বোমার মামলার কথাতেই ফিরে আসি। বীচ্ক্রফ্টের আদালতে শ্রীঅরবিন্দ আসেন, তাঁর সৌম্য-মূর্তি, মুখে-চোখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। চিত্তরঞ্জন দাশের অসামান্য আইন প্রতিভা প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে এ-ই দাঁড় করালো যে 'যুগান্তর' 'বন্দেমাতরম"-এ দেশাত্মবোধক নিবন্ধ লিখলেও সক্রিয় বিপ্লব বিশ্বাসী বলে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং গ্রে-স্ট্রীটের 'নবশক্তি'র অফিসে বাসা-বদল, এই সূত্র ধরে চিত্তরঞ্জন এমন যুক্তিগ্রাহ্য-সওয়াল করলেন যে, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক প্রমাণ করা গেল না। সওয়ালের শেষে চিত্তরঞ্জন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো বলে উঠেছিলেন Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-choed not out in India, but over the distant seas and distand lands.

১৯০৯-এর ৬ই মে রায় বেরুলো। শ্রীঅরবিন্দ, দেবব্রত বসু, দীনদয়াল বসু, নলিনী গুপ্ত, শচীন্দ্র কুমার সেন প্রভৃতিরা বেকসুর খালাস পেলেন। আদালতের বাইরে ধ্বনি উঠলো,—বন্দেমাতরম!

কিন্তু বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের হলো মৃত্যুদণ্ড। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, ইন্দুভূষণ রায়, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতির হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। পরে অবশ্য আপীলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল। হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্র বাদে আর সবার দণ্ডও কিছু কিছু কম হয়েছিল।

এইভাবে শেষ হয়ে গেল বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। কিন্তু তার পরের কথা বলতে গেলে আবার আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে গিয়ে বলতে হবে আরেকটি মানুষের কথা। হিতবাদী-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই মানুষটির নাম প্রথম বাংলাদেশে প্রচার করেন। সে হচ্ছে ১৯০৫ সালের গোড়াকার

কথা। হিতবাদীতে বেরুলো ছোট্ট একটি খবর,—'অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণ-বর্মা লণ্ডনে 'ভারতীয় হোমরুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

১৯০৬ সালের মে-মাসে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় সভা করতে গিয়েছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন উল্লাসকর দত্ত। সেইখানেই সুরেশচন্দ্র দেব তরুণ দলকে গোপনে দেখালেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট'। জানা গেল, এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯০৫ সাল থেকে পত্রিকাটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকার মধ্যে অটোক্রেসি, ব্যুরোক্রেসি, প্যাসিভ রেসি-স্টেন্স, প্যারালাল গভর্ণমেন্ট-প্রতিষ্ঠা,—প্রভৃতি কথাবার্তা ছিল, যা তখনকার দিনে একেবারে নতুন। সবারই কৌতূহল হলো জানতে, কে এই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ?

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। ১৮৯১-৯২ সালে অরবিন্দ বিলাতে প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন করলেও, তাঁর যথার্থ কর্মক্ষেত্র ছিল বরোদা ও পরে কলকাতা। কিন্তু বিদেশেই যাঁরা প্রথম বিপ্লবের কর্মধারা গড়ে তোলেন,—তাঁরা হলেন তিনজন, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিং রাওজী রাণা এবং শ্রীমতী ভিকাজী রুস্তম কামা। এঁদের তিনজনের কথা না বললে বিপ্লব সাধনার ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যায়।

কৃষ্ণবর্মার কথা থেকেই শুরু করি। ১৮৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর এঁর জন্ম কচ্ছ-রাজ্যের মান্দাভি গ্রামে। দরিদ্র ভাঁসালী পরিবারের ছেলে। মান্দাভির পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কচ্ছ-রাজ্যের রাজধানী ভুজের ইংরাজী স্কুলে পড়াশুনা করেন। দশ বছর বয়সে মা মারা গেলে পিতা পুত্রকে বোম্বাই নিয়ে গিয়ে পড়াতে চাইলেন, কিন্তু সামান্য চাকুরে তিনি, পড়াবার টাকা কোথায় পাবেন ? লাভাজী বলে এক ভাটিয়া ব্যবসায়ীর অর্থ সাহায্যে শেষ

পর্যন্ত তিনি ছেলেকে বোম্বাই নিয়ে এসে উইলসন হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন কৃষ্ণবর্মা। ইংরেজী স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পাঠশালাতেও সংস্কৃত শিখতে লাগলেন। অচিরেই একটি বৃত্তি লাভ করে এলফিনস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। ধনকুবের শেঠ ছাবলদাসের ছেলে রামদাস ছিল শ্যামাজীর সহপাঠী, সে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, বললো—আমাদের স্কুলের সেরা ছেলে।

ওর গুণপনা শুনে এবং ওঁকে দেখে শেঠজী ও তাঁর স্ত্রীর সাধ জাগলো ওঁকে জামাতা করার। ফলে, যখন তাঁর মাত্র আঠারো বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হলো ষোলো বছরের শেঠজী-কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে। অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ামস প্রথমবার ভারতে আসেন ঠিক ঐ সময়। তিনি ওঁর সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন, বললেন,—'বছর দুয়েকের মধ্যেই আমি তোমাকে অক্সফোর্ডে নিয়ে যাবো আমার সহকারী করে।'

এরপর আমরা তাঁকে দেখি, তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ'-এর হয়ে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন সংস্কৃত ভাষাতে বক্তৃতা দিয়ে, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। মণিয়র উইলিয়ামস্ এবার তাঁকে আহ্বান জানালেন। শ্যামাজী বিলাত গিয়ে পৌঁছলেন ১৮৭৯ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি। শ্যামাজী অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট হয়ে ঐ অক্সফোর্ডেই মারাঠী, গুজরাটি ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে মাত্র তিন মাসের জন্য দেশে এসে আবার বিলেত ফিরে গেলেন ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেবার জন্য। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এরপরে ব্যারিস্টারি পাশ করে তাঁর দেশে আগমন। রাটলামের রাজার দেওয়ান-পদে যোগদান। কিন্তু স্বাস্থ্য সেখানে না টেঁকায় চাকরি ছেড়ে আজমীর কোর্টে আইন-ব্যবসা শুরু করলেন। এখানেই তাঁর

পসার জমলো, যশ ছড়ালো, উপার্জিত অর্থ নানান ব্যবসায়ে নিয়োগ করে রীতিমত ধনী হয়ে উঠলেন। এরপরে উদয়পুরের ও পরে জুনাগড় স্টেটের দেওয়ানীর কাজ। কিন্তু নানারকম কারণে কাজটা না পোষায় ১৮৯৭ সালের মধ্যভাগে সস্ত্রীক আবার বিলেত পাড়ি দিলেন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মের সূচনা। বিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সর্দার সিং রাণা কাথিওয়াড় থেকে বিলেত গিয়েছিলেন আইন পড়তে। ১৮৯৮ সালে তিমি শ্যামাজীর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৭০-য়ে জন্ম, বিখ্যাত মল্ল রাজপুত বংশের সন্তান। এঁর এক পূর্বপুরুষ রাণাপ্রতাপের সৈন্যদলে ছিলেন। একবার মোগলবাহিনী রাণা প্রতাপকে ঘিরে ফেললে, ইনি নিজে রাণার পোশাক ও পাগড়ি পরে রাণা প্রতাপকে সাধারণ সৈনিকের বেশে অবরোধ থেকে চলে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এজন্যই 'রাণা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা।

ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল, হয়েছিল দুটি ছেলে। কিন্তু লণ্ডনে তিনি একটি জার্মাণ ছাত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। এই মেয়েটি ছিল অতি বুদ্ধিমতী এবং মেধাবিণী। তাছাড়া, দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয়দের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অসীম।

এই সর্দারসিং রাণা ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাশ করেই প্যারিসের এক ভারতীয় মুক্তা ব্যবসায়ীর আগ্রহে তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। ব্যারিস্টারি করা আর হলো না। এই ব্যবসা-সূত্রেই তিনি প্যারিস লণ্ডন যাতায়াত করতেন অনবরত। শ্যামাজীর 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির' তিনি ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি, আবার দাদাভাই নৌরজীর 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'রও সভ্য ছিলেন। লণ্ডনে ভারতীয়দের 'বিপ্লবী কেন্দ্র' ইণ্ডিয়া হাউস-এরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি, আবার বীর সাভারকর প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত সংঘ' ও 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি'রও সভ্য ছিলেন। একদিকে তাঁর বিপ্লব

সংগঠনের কাজ, অন্যদিকে ব্যবসা। ব্যবসায়ে তিনি ক্রমে অতুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ও মাদাম ভিকাজী কামা মিলে প্যারিসে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন, অবশ্য লণ্ডনের সঙ্গে এই কেন্দ্রের যোগাযোগ ছিল।

শ্যামাজীর 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' পত্রিকার কথা আগেই বলেছি। তাঁর হোমরুল সোসাইটির লক্ষ্য ছিল, 'দেশবাসীর জন্য, দেশবাসী কর্তৃক দেশীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা।' এই আদর্শকে সামনে রেখে তিনি তাঁর পত্রিকা চালাতেন। আর দৃষ্টি রাখতেন দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার ওপর। ১৯০৫-এর শেষাশেষি কাশীর কংগ্রেস-অধিবেশনের কথা বলেছি, যাতে তিলককে না করে গোখ্‌লেকে সভাপতি করা হয়েছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যামাজী তাঁর পত্রিকায় তিলক ও গোখলের তুলনামূলক সমালোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে, তিলক দেশভক্তি ও আত্মত্যাগে বহু উর্ধ্বের মানুষ। তারপরে দেখা যায়, বরিশাল কংগ্রেসের পর সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হলে শ্যামাজী 'ইণ্ডিয়া হাউস'-য়ে সভা করে প্রতিবাদ জানান। লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-এর নির্বাসনেও অনুরূপ প্রতিবাদ-সভা করেছিলেন শ্যামাজী। এইসব কারণে ওখানকার কাগজগুলি শ্যামাজীর পিছনে লাগলো। তিনি বুঝলেন লণ্ডনে আর থাকা যাবে না। তাঁকে শ্রীরাণা ও মাদান কামা প্যারিসে চলে আসবার জন্য বার বার চিঠি দিয়েছিলেন। এবার তিনি ওঁদের চিঠিতে সাড়া দিয়ে প্যারিসে চলে গেলেন, স্ত্রীও স্বামীর অনুগামী হলেন কয়েকদিন পরে। ওঁরা আর লণ্ডনে ফিরে আসেন নি।

প্যারিসে ওঁদের তিনজনের বিপ্লবী-কেন্দ্র যখন বেশ সংগঠিত হয়ে উঠেছে, তখন ঘটলো মজঃফরপুরের ঘটনা, প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের আত্মদান। শ্যামাজী তাঁর পত্রিকায় আমেরিকান সাংবাদিক মিঃ লেররস্কটের 'টেররিস্ট' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপলেন, যাতে জনৈক তরুণ রাশিয়ানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ

ছিল। শ্যামাজী নিজেই লিখেছিলেন,—Did not Mazzini send Banderie brothers with bombs to awaken Italian people to heroism and courage during this period of its deepest doom and despair ?

১৯০৯ সালে শ্যামাজী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই চারজন শহীদের নামে চারটি বৃত্তি ঘোষণা করলেন। এরকম বৃত্তি তিনি আগেও ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি রাণাজীও করেছিলেন। রাণাজীও ১৯০৪-৫ সালে ভারতে আসেন তাঁর এক ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে। ফিরে আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর বড়ো ছেলে রণজিৎ সিংকে। এখানে বলা উচিত, ১৯০৬ সালের জুন মাসে শ্রীদামোদর বিনায়ক সাভারকর লণ্ডনে পেঁাছেছিলেন ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য। এই সালে আবার আমাদের পূর্ব-কথিত হেমচন্দ্র দাস কানুনগো লণ্ডন হয়ে প্যারিসে এলেন বোমা প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী শিখতে। শ্রীরাণা এঁকে একটা ল্যাবরেটরি করে দিলেন। রুশ ও পোল বিপ্লবীদের কাছ থেকে পাওয়া বোমা তৈরির ফরমূলা-সমন্বিত বই প্রথমে ফরাসী ভাষায় ও পরে ফরাসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র দক্ষ রাসায়নিক নন, তবু কোনোরকমে বোমা-তৈরি শিখে দেশে ফিরে যান, যাঁর বোমাকে 'কালীমায়ীর বোমা' নাম দিয়ে ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। আর এই সর্দার সিং রাণাই কায়দা করে ভারতের নানা জায়গায় রিভলবার পাঠাতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২০টি পিস্তল আর গুলি তিনি লণ্ডনে সাভারকরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সাভারকর আবার সেগুলি একটা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ইণ্ডিয়া হাউসের পাচক ছত্রভুজ আমিনের সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন বোম্বাইতে। এই পিস্তল দিয়েই নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে মারা হয় ঐ সালেরই ২১শে ডিসেম্বর তারিখে। কিন্তু জ্যাকসন-হত্যার কথা বলার আগে

ইয়োরোপে ভারতের প্রথম শহীদ মদনলাল ধিংড়ার কথা বলে নিই। এ-ও ঐ ১৯০৯ সালের ঘটনা।

বাইশ বছরের ছেলে মদনলাল, অমৃতসর থেকে আই-এ পাশ করে ছোটখাটো দুটো চাকরি করেছিল পর পর কিন্তু সে-সব ছেড়ে বছর তিনেক আগে বিলেতে যায় ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে, এই বছরই অক্টোবরে তার দেশে ফেরার কথা ছিল।

মদনলাল ইণ্ডিয়া হাউস-এর প্রায় প্রত্যেকটি সভাতেই যেতো। একবার ক্লাসে সে এসেছিল একটা ব্যাজ প'রে। ব্যাজটি দেওয়া হয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউস থেকে, ভারতের শহীদদের স্মরণেই ঐ ব্যাজ। ক্লাসে তাকে বলা হলো—ব্যাজটা খুলে ফেলো।

মদনলালের দৃঢ় উত্তর,—না।

ফলে সহপাঠীরা 'র‍্যাগিং'-এর অছিলা করে মারধর করতে লাগলো। মদনলাল রুখে দাঁড়ালো। যে ছেলেটা বেশি মারধর করছিল, তাকে ধমকে বললে—তোর গলা কেটে নেবো।

দেশে মদনলালের বাপ আর দাদার কাছে খবর পৌঁছলো যে মদনলাল সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মিশছে। তাঁর বাবা ছিলেন ডাক্তার, দাদা ব্যারিস্টার। দাদা কার্জন ওয়াইলিকে লিখলেন,—'আপনি একটু ওকে দেখবেন। ওকে ঠিক পথে আনবেন।'

কিন্তু এই ঠিক পথে আনার ব্যাপারে ওয়াইলি সাহেব বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। এই ওয়াইলি সাহেব ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ছিল। রিটায়ার করবার পর সেক্রেটারি অব স্টেটের রাজনৈতিক এ-ডি-সি হয়ে কাজ করছিল। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের দেখাশোনা করার দায়িত্বও ছিল তার ওপর।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউটের জাহাঙ্গীর হলে, ১লা জুলাই তারিখে। গানের প্রোগ্রাম সবে শেষ হয়েছে, ওয়াইলিও মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। মদনলাল এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো, পকেটে তার হাত।

কেউ কিছু সন্দেহ করে নি। হঠাৎ পিস্তল বার করে ওয়াইলির মুখের ওপর পর-পর পাঁচটা গুলি করলো, প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো সাহেবের। কাওয়াস লালকাকা বলে এক পার্শী ভদ্রলোক ওকে জড়িয়ে ধরে পাকড়াতে গিয়েছিল, ষষ্ঠ গুলিটি তার ওপর খরচ করলো মদনলাল। লালকাকা পরে হাসপাতালে মারা যায়।

এর পর আর কী? যথারীতি বিচার ও ফাঁসি। ফাঁসির তারিখ ১৭ই আগস্ট, ১৯০৯ সাল। মৃত্যুকালীন জবানবন্দী যা তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল, তাতে সে লিখেছিল,—'ভগবানের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমি যেন একই মায়ের কোলে এসে জন্মাই। আর একই পবিত্র কাজে যেন আমি মরি, যতক্ষণ না আমাদের সাফল্য আসছে।'

এর পরে ওয়াইলির জন্য শোক সভায় হত্যাকারীর নিন্দাসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন সাভারকর। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও 'টাইমস' পত্রিকায় সাভারকরকে সমর্থন করে একটি চিঠি লেখেন। এই সাভারকর সর্দার সিং রাণা কর্তৃক ঘোষিত 'শিবাজী বৃত্তি' নিয়ে ১৯০৬-এর জুলাই মাসে লণ্ডনে এসেছিলেন। ওঁর দাদা গণেশ সাভারকর ওদের গুপ্ত সমিতির কাজ করে যেতে লাগলেন দেশে থেকে। ঐ ১৯০৯ সালেরই ২১ শে ডিসেম্বর নাসিকের অত্যাচারী জেলা-শাসক জ্যাকসন নাসিক থেকে পুণা বদ্‌লি হচ্ছেন বলে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। তিনি হলে ঢুকে নিজের আসনে বসতে যাবেন, এমন সময় পিস্তল গর্জে উঠলো। বিপ্লবী অনন্ত লক্ষ্মণের পিস্তল থেকে গুলির পর গুলি এসে জ্যাক্‌সনকে ঝাঁঝরা করে দিলো।

অনন্ত লক্ষ্মণ কান্‌হেরে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়লেন। ধরা পড়লেন কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বিনায়ক দেশপাণ্ডে। এঁদের তিন জনেরই ফাঁসি হয় ১৯১০-এর ১৯ শে এপ্রিল, বোম্বাইতে। এঁদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল রামচন্দ্র সোমান, নারায়ণ যোশী, গনেশ বৈদ্য ও শঙ্করের। পাণ্ডুরাম যোশীর হয়েছিল ছু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

যে পিস্তল দিয়ে জ্যাক্সনকে মারা হয়, পুলিশের মতে, সেটি নাকি পাঠিয়েছিলেন বীর সাভারকর বিলেত থেকে। সুতরাং সাভারকরকেও বিলেতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁকে বন্দী করে জাহাজে করে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন জাহাজ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে পৌঁছতেই সাভারকর বাথরুমের গবাক্ষ দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতরে তীরে এসে ওঠেন। কিন্তু ফরাসী পুলিশ তাঁকে ধরে ইংরেজদের হাতেই সঁপে দিয়েছিল। এ-নিয়ে মাদাম কামা খুব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো সুফল ফললো না, ৩০শে জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে সাভারকর বিচারে যাবজ্জীবন দীপান্তর লাভ করলেন। তাঁর আগে তাঁর দাদা গনেশ সাভারকরকে দেশাত্মবোধক কবিতা লেখার অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ড দিয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দাদার দেখা পান ছোট ভাই।

প্রসঙ্গক্রমে মাদ্রাজের কথা একটু বলে নিই। বিবেকানন্দের আত্মিক প্রভাবে মাদ্রাজ জেগে উঠেছিল। তারপরে তাঁদের কাছে তখন প্রিয় ছিল বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে ওখানকার বহু স্থানে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। বিপ্লবী তারক নাথ দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন চিদাম্বরম পিল্লাই। এঁর সঙ্গে আরও একটি নাম যোগ করতে হবে, তিনি সুব্রহ্মান্যশিবম্। এঁরা দুজনে গ্রেপ্তার হতে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। গুপ্তসমিতি গড়ে উঠছিল নানান জায়গায়। কৃষ্ণ বর্মার লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে বিপ্লব-মন্ত্র নিয়ে ছুটে এসে-ছিলেন ভি-ভি-এস আয়ার ১৯১০ সালে। পণ্ডিচেরিতে তিনি ছেলেদের গোপনে পিস্তল ছোড়ার শিক্ষা দিতে থাকেন। আরও দুজন বিপ্লবী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন, নীলকান্ত ব্রহ্মচারী ও শঙ্কর কৃষ্ণ আয়ার। শঙ্করকৃষ্ণের আত্মীয় হচ্ছেন ওয়াঞ্চি আয়ার। বনবিভাগের কর্মচারী এই ওয়াঞ্চি আয়ার পণ্ডিচেরিতে গিয়ে ভি-ভি-এস আয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। ওদিকে টিনেভেলি জেলার মেজিস্ট্রেট

মিঃ অ্যাসকে খতম করার কথা হয়। ১৯১১র ৭ই জুন ট্রেনের মধ্যে রিভলবারের সাহায্যে তাকে খতম করেন ওয়াঞ্চি আয়ার। তারপরে কিছু দূরে ছুটে গিয়ে নিজের রিভলবার নিজের গলার কাছে বসিয়ে ফায়ার করলেন। প্রফুল্ল চাকীর মতোই তিনি আত্মবিলোপ ঘটিয়েছিলেন। এর ফল সহজেই অনুমেয়। ধরপাকড়। আসামীদের মধ্যে ধর্ম্মরাজ আয়ার ও ভেঙ্কটেশ্বর আয়ার বন্দী অবস্থাতেই আত্মহত্যা করেছিলেন।

এইবার মাদাম ভিকাজী রুস্তম কামা সম্বন্ধে বলা যাক। বোম্বাইয়ের বিত্তশালী পার্শী ব্যবসায়ী সোরাবজী ফ্রামজী প্যাটেলের কন্যা এই ভিকাজী, জন্ম ১৮৬১ সালে। নয়টি ভাইবোনের মধ্যে ভিকাজী ছিলেন সব থেকে উজ্জ্বল। চব্বিশ বছর বয়সে এক বছরের বড়ো পার্শী সলিসিটার রুস্তম কে-আর-কামাকে বিবাহ করেন। তাঁর স্বামীও ছিলেন আবার তাঁর নয়টি ভাইবোনের অন্যতম। ভিকাজীর শ্বশুর ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিদ্যা ভিকাজীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তাঁর কাছ থেকে আলোচনাক্রমে অনেক কিছু শিখতেও পেরেছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে নীতিগত বিরোধ বেঁধে গেল স্বামীর সঙ্গে। রুস্তম কামা ১৯০৮ সালে 'বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকা যখন বার হতে শুরু করে, তখন তিনি ফিরোজ শা' মেটার সহকারী ছিলেন। পরে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রুস্তমজীর বিশ্বাস ছিল, ইংরেজকে আরও অন্ততঃ একশ বছর না রাখলে দেশের মঙ্গল নেই। কিন্তু ভিকাজীর মত ছিল বিপরীত। তিনি ভাবতেন, দেশের মঙ্গলের জন্য এখুনি ইংরেজ শাসনের অবসান চাই। এই মতপার্থক্য ক্রমে বিরোধের আকারে দেখা দিলো। স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ। এমন সময় বম্বে অঞ্চলে দারুণ প্লেগ দেখা দেয়। ভিকাজী সাদা এপ্রন পরে পার্শী পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত প্লেগ হাসপাতালে রোগীদের সেবা করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে এ কাজ থেকে সরাতে শত চেষ্টা করেও পারেন নি;

তিনি তপস্বিনীর মতোই মনপ্রাণ ঢেলে রোগীর সেবা করতে লাগলেন। এইখানে, কলকাতার বুকে প্লেগের সময় সিস্টার নিবেদিতা যা করেছিলেন, তার সঙ্গে ভিখাজীর মিল পাওয়া যায়।

এরপর ১৯০১ সালের এপ্রিল মাস, ভিকাজী বিলাত চলে যান। লণ্ডনে হোবর্ণ এলাকায় একটি সভ্রান্ত পরিবারে দুটি ঘর নিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের কাজে আত্ম নিয়োগ করলেন। এই নৌরজীর মাধ্যমেই তাঁর আলাপ হলো সর্দার সিং রাণার সঙ্গে। সর্দ্দার সিং তখন ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন। এই সর্দার সিং-ই তাঁর সঙ্গে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্যামাজীর 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট' পত্রিকায় ভিকাজী নিয়মিত লিখতেন, হোমরুল সোসাইটিরও উৎসাহী সদস্যা ছিলেন। সাভারকর শিবাজী বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনে এলে শ্যামাজী তাঁকে 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এঁদের সম্মিলিত রাজনৈতিক কর্মজীবন এভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু লণ্ডনে থাকা সম্ভব হলো না দেখে ওঁরা প্যারিসে চলে যান, সেখানে ওঁদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম্ম চলতে লাগলো। অজিত সিং ও লাজপৎ রায়ের নির্বাসনে প্যারিসে তারা প্রতিবাদ সভা করলেন। মাদাম কামা 'প্রতিহিংসা' নেবার জন্য দেশের লোকের কাছে উদ্দীপন মূলক আবেদন জানালেন। এই আবেদন নিউইয়র্কের আইরীশ মুখপত্র 'গ্যালিক আমেরিকান' পত্রিকা এবং ফ্রান্স জার্ম্মাণী, সুইশ ও অন্যান্য দেশের সাম্যবাদী পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়ে হৈ হৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। ১৯০৭ সালের ১৮ই আগষ্ট জার্মাণীর স্টুটগার্ট শহরে যে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন হয়েছিল, তাতে প্রচুর বাধা সত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে পেরেছিলেন মাদাম কামা, সর্দ্দার সিং রাণা এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাদাম কামা তাঁর বহুদিনের পরিকল্পিত নিজের হাতে তৈরি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এক আবেগমথিত ভাষণে সভাস্থ সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেলে লণ্ডনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু সেই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য ১৯০৮ এর ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে জাতীয় কন্‌ফারেন্স ডাকলেন মাদাম কামা ও সাভারকর। তখন বিলাতে বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত রায়, খাপার্দে, গোকুল চাঁদ নারাং, স্যার আগা খাঁ,—এরা উপস্থিত ছিলেন। কন্‌ফারেন্সে এরা সবাই যোগ দিলেন। খাপার্দে হলেন সভাপতি। মাদাম কামা ওজস্বিনী ভাষণের মাধ্যমে 'বয়কট' প্রস্তাব তুললেন, সমর্থন করলেন জ্ঞানচাঁদ শর্ম্মা। পণ্ডিত প্রবর ডঃ আনন্দ কুমার স্বামীও ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে অতি সুন্দর ভাষণ দেন। তাঁকে সমর্থন করে ভাষণ দেন সাভারকর।

জ্যাকসন হত্যা বা নাসিক হত্যার মামলায় সাভারকরকে আসামী করার কথা আগেই বলেছি। মার্সাই বন্দরে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেও তাঁকে ধরে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেয় ফরাসী পুলিশ, সে-কথাও বলেছি। তাঁকে আসামী করে ভারতে নিয়ে এলে বোম্বাইতে তাঁকে সমর্থন করার জন্য মাদাম কামা ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেন। লণ্ডনে সাভারকরের সলিসিটার মিঃ ভনের কাছে প্রচুর টাকা পাঠিয়ে বোম্বাইতে মিঃ ব্যাপটিস্টার কাছে মামলার নথিপত্র পাঠানোর নির্দ্দেশ দেন। মামলা চলতে লাগলো। অন্য আসামী ছত্রভুজ আমীন রাজসাক্ষী হয়ে বিপদ বাঁধালো। কী ভাবে সে সর্দ্দার সিং রাণার প্যারিসের বাড়ি থেকে পিস্তল শুদ্ধ বাক্স নিয়ে বোম্বাই পৌঁছলো, সে কথা বলে ফেললো আদালতে। মাদাম খবর পেয়ে শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন, এবার রাণাকেও জড়াবে, সাভারকরকেও বিপন্ন করবে। সুতরাং এক্ষুণি প্রতিকার দরকার। তিনি সাতপাঁচ না ভেবে, কারুর সঙ্গে পরামর্শ না করে সোজাসুজি ব্রিটিশ রাজদূতের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। রাজদূত উৎফুল্ল। এবার বুঝি বিপ্লবিনী আত্মসমর্পণ করবেন, স্বীকারোক্তি দেবেন। মাদাম বললেন—পিস্তলের বাক্স সর্দ্দার সিং রাণার বাড়িতে ছিল বটে, কিন্তু তিনি বা সাভারকর এর

বিন্দু-বিসর্গ জানতেন না। ওরা দুজনেই নির্দোষ। পিস্তলগুলো জোগাড় করেছিলাম আমি, বাক্সে রেখেও ছিলাম আমি। আমিই বোম্বাই পাঠিয়েছিলাম ছত্রভুজের সঙ্গে। সব দায়িত্ব আমার, আমিই দোষী।

এই ধরণের বিবৃতিতে মাদাম চরম শাস্তিও পেতে পারতেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, তাঁর বা রাণার নামে কোন ওয়ারেণ্ট বার হলো না। বোধ হয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ-নিয়ে আর অগ্রসর হতে চান নি। কারণ সাভারকরের ব্যাপার নিয়ে বেশ ভালরকমই আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল।

মাদাম কামার কথা এখানেই শেষ নয়, প্যারিস-প্রবাসিনী এই মহিলার সঙ্গে অবিনাশ ভট্টাচার্য যখন ১৯১৩ সালে দেখা করেন, তখন মদনলাল ধিংড়ার কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। সাভারকর সম্পর্কে বলতে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। বলেছিলেন,—'সাভারকরের মধ্যে যে কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি আছে, তা খুব দুর্লভ বস্তু। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত গিয়েও কিছু করা গেল না। এটাই দুঃখ। ইংরেজ যে আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তা কখনো ভাবিনি।'

মাদাম কামা ১৯০৮ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা চালাচ্ছিলেন রাণাজী আর কৃষ্ণবর্মার সহায়তায়। আরও একখানি পত্রিকা চালাতে শুরু করেছিলেন, তার নাম 'তলোয়ার।' কিন্তু ১৯১১ সালে দুটিই বন্ধ করে দিয়ে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম' বলে একখানা পত্রিকা চালিয়েছিলেন। মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর তাঁকে ও শ্রীরাণাকে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে বন্দী করে রেখেছিল ইংরেজের অনুরোধে ফরাসী সরকার। যুদ্ধ বাঁধবার কিছু আগে কৃষ্ণবর্মা প্যারিস ছেড়ে জেনিভা চলে যান বলে তাঁকে আর বন্দী করা যায়নি। কৃষ্ণবর্মা এর পরে গণেশ দামোদর সাভারকর ও হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর নামেও দুটি বৃত্তি ঘোষণা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির কথাও আসে। তিনি কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামার কাছ থেকে দুটি লেখা চান রাশিয়ার

পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য। মাদাম লেখা পাঠিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণ-বর্মা পাঠিয়েছিলেন অনেক কিছু তথ্য ও তাঁর ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকা। এই তথ্যের ভিত্তিতেই গোর্কি সেদিন লিখেছিলেন,—"ঐ শাসনের আসল রূপ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে সাভারকরের ওপর অত্যাচারে। তাঁর বিচার হয়েছে খুব গোপনে, সে বিচারের খবর পর্যন্ত কাগজে ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল। তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ৫০ বছরের। বছরে একবার মাত্র তিনি চিঠি লেখতে পারবেন তাঁর স্ত্রীর কাছে।"

মাদাম কামা সাভারকরের লেখা একটি বইও পাঠিয়েছিলেন গোর্কির কাছে। বইটা ছিল ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত। এই বিনায়ক সাভারকর জন্মেছিলেন নাসিক শহরের কাছে ভাগুর বলে এক গাঁয়ে। পিতা দামোদর পন্ত, মাতা রাধাবাঈ। বিনায়ক দ্বিতীয় পুত্র, জৈষ্ঠপুত্র গণেশ। দুজনেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করে আন্দামানে যান। বিনায়ক সাভারকরের জন্ম ২৮শে মে ১৮৮৩ সালে। এঁরা চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। নানাসাহেব, ফাড়কে, তিলক, চাপেকর ভাইরা,—এরাও সবাই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। বিনায়ক স্কুলে পড়বার সময় মাত্র দশ বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেন, সেই কবিতা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতো। দশবছর বয়সেই তাঁর মা মারা যান। চাপেকর ভাইদের আত্মত্যাগের কাহিনীতে উদ্দীপিত হয়ে তিনি দুর্গামূর্তির সামনে প্রতিজ্ঞা করেন, মাতৃভূমি থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবেনই, তা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন।

সাভারকর তরুণ বয়সেই কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯৯ সালে প্লেগে তাঁর বাবা ও কাকা মারা যান, ছোট ভাই নারায়ণ বেঁচে ওঠেন। বিনায়ক নাসিকে তরুণ কর্মীদের নিয়ে 'মিত্রমেলা' গড়ে তোলেন, পরে এটিই 'অভিনব ভারত সংঘ' নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

তখনকার রীতি অনুসারে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই বিনায়কের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এরপরের শিক্ষা পুণার ফার্গুসন কলেজে।

লোকমান্য তিলকের সান্নিধ্যেও আসেন এই সময়। বি-এ পাশ করার পর ১৯০৬ সালে বোম্বাই যান। সেখানে তাঁর গুপ্ত সমিতির সদস্য যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বি-জি খের ও জে বি কৃপালনী। বিনায়ক সাভারকর আইন পড়ছিলেন, প্রাথমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ঘোষিত বৃত্তির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে গেল কাগজে। দরখাস্ত করলেন। বৃত্তিও পেলেন অচিরে। স্ত্রী ও শিশুপুত্র প্রভাকরকে রেখে এবং দাদা গণেশ সাভারকরের ওপর সমিতির সকাল কাজের ভার অর্পণ করে ১৯০৬ সালে লণ্ডন যান। তার পরের কথা তো আগেই বলেছি। ব্রিটেনে রাজরোষে তিনি নিরাশ্রয় হয়ে পড়লেও, সেখানে জনৈক জার্মাণ-ল্যাণ্ডলেডির আশ্রয়ে কয়েকদিন থেকে ব্রাইটনের সমুদ্র তীরে চলে যান। এই সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র নিরঞ্জন পাল। এখানে তিনি তাঁর সহকর্মী জ্ঞানচাঁদ বর্মাকে আনিয়ে তার হাতে মদনলাল ধিংড়ার বিবৃতির কপি দিলেন। মাত্র আর দুদিন বাকী আছে ধিংড়ার ফাঁসি হতে। এটা যদি ছাপা হয়, আর সেই ছাপা-কপি যদি ধিংড়া দেখে যেতে পারেন, তাহলে কতোই না খুশি হবেন তিনি! বর্মা প্যারিসে গিয়ে এটা ছাপিয়ে ইউরোপের নানান জায়গায় পাঠালেন। ফাঁসির আগের দিন ছাপানো একখানা কপি ধিংড়ার হাতে লুকিয়ে পৌঁছিয়েও দেওয়া হয়েছিল।

সাভারকর এরপর গেলেন প্যারিসে, ১৯১০ এর জানুয়ারিতে। মাদাম কামার ফ্ল্যাটে একটি ঘর নিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই খবর পেলেন, আমেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্রাণ নেবার চেষ্টায় কারা যেন বোমা ফেলেছে! ইংরেজ দোষীদের ধরপাকড়ের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলো। বিনায়কের বড়ো ভাই গণেশ আন্দামানে বন্দী, ছোট ভাই নারায়ণ রাও সাভারকর গ্রেপ্তার হলেন। এর পরই ঘটলো জ্যাকসন হত্যার ঘটনা। এসব শুনে সাভারকর স্থির থাকেন কী করে? দেশে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। মাদাম কামা, রাণাজী, বীরেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়,—এঁরা সবাই বোঝালেন, ফরাসীদেশের বাইরে পা দেওয়া মাত্রই ইংরেজরা ধরবে, সুতরাং যেও না। সাভারকর শুনলেন না, লণ্ডনে যাওয়া মাত্রই গ্রেপ্তার হলেন। তারপরে জাহাজে করে মার্সাইতে আসা, সাভারকরের সমুদ্রে ঝাঁপ, আবার বন্দী। ভারতে যারবেদা ও পরে ডংগ্রি জেলে। কোর্টে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। তার ছ-মাস জেল হয়েছিল। ডংগ্রি জেলে সাভারকরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাঁর স্ত্রী। পুত্র প্রভাকর আগেই মারা গিয়েছিল। স্ত্রী স্বামীর দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পঞ্চাশ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড। আর কি জীবনে দেখা হবে? চোখে জল। স্বামীর উদ্দেশে নত হয়ে প্রণাম জানালেন। এবার বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলি। ঢাকা জেলার তারপাশা বা লৌহজং ষ্টীমার স্টেশনের কাছে ছিল একটি গ্রাম, ব্রাহ্মণগাঁও। এই গাঁয়ের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান। মা হচ্ছেন বরদাসুন্দরী দেবী। এঁদের চার সন্তান, বীরেন্দ্রনাথ, সরোজিনী, হারীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী। অঘোরবাবু ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, জার্মাণ ভাষায় তাঁর গবেষণার তত্ত্ব প্রকাশ করে ডি-ফিল পান। হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া কলেজে বহুকাল প্রিন্সিপাল হিসাবে অতি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। কন্যা সরোজিনীর বিবাহ হয় মাদ্রাজী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, সেজন্য তাঁর নাম হয় সরোজিনী নাইডু।

কিন্তু সরোজিনীর কথা নয়, বীরেন্দ্রনাথের কথাই বলা যাক। গ্রাজুয়েট হয়ে ১৯০৩ সালে বিলাত যান, আই-সি-এস-এ সুবিধা করতে না পেরে ব্যারিস্টারি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু পড়ার থেকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপই তাঁকে টানলো বেশি। বীরেন্দ্র ইংরেজী ও ফরাসী ছাড়া হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলে মাদাম কামা, শ্যামাজী ও সাভারকর তাঁকে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার-পত্র লেখার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ হায়দরাবাদে বাস করার সময়ই বন্দুক ছুড়তে, তরোয়াল চালাতে ওস্তাদ হয়ে ওঠেন।

লণ্ডনের গুপ্তসমিতিগুলিতে এই শিক্ষাই দিতে লাগলেন তিনি। পরে প্যারিসে মাদাম কামা 'বন্দেরমাতরম' ও 'তলোয়ার' পত্রিকাও পরিচালনা করেছেন। এরপরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হবো-হবোর মুখে, তখন তিনি জার্মাণীতে চলে যান। ১৯১৪ সালের এপ্রিলে হালি নামক শহরে গিয়ে সেখানকার এক পাব্‌লিশারের সঙ্গে কনট্রাক্ট হলো, তাঁদের হয়ে জার্মাণ, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় প্রাথমিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করবেন। এই সময় তিনি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে 'ডক্টরেট' পাবার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হয়েছিলেন। এই বীরেন্দ্রের কথা পরে আরও বলতে হবে।

আগে নিবেদিতার বিলাত যাত্রার কথা বলেছি, ১৯০৭-এর ১৫ই আগস্ট তিনি রওনা হয়েছিলেন। প্রায় দুটি বছর তাঁকে পশ্চিমে থাকতে হয়েছিল। লণ্ডনে এসে স্টেটসম্যানের সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। র‍্যাটক্লিফ আর 'এম্পায়ার' কাগজের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিবেদিতা আবার কলম ধরলেন। এ-সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র জন্যও কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, স্বাক্ষর করতেন 'নীলাস'--এই ছদ্মনামটি। লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয়দের সমিতির সঙ্গেও তাঁর যোগসাধন হয়েছিল, তবে তিনি এ সময় যে কাজের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে ইয়োরোপ, আমেরিকায় যে সব জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। মিসেস বুল এবং সস্ত্রীক জগদীশ বসুকে নিয়ে জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডে গেলেন প্রথমে, সেখান থেকে আমেরিকা। মিসেস বুলের সাহায্যে যে সব ভারতীয় ছেলে ওখানে পড়াশুনা করছে, তাদের মায়ের স্থান নিলেন নিবেদিতা। বিগত বছরখানেকের মধ্যে রাজনৈতিক নির্বাসিতেরাও এসে জুটেছেন সেখানে, তার মধ্যে জেল-ফেরৎ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একজন। এঁদের জন্য কাজ করে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় ইংল্যাণ্ড থেকে জরুরী খবর এলো, মা মৃত্যুশয্যায়। অতএব, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে ফিরে আসা। মেয়ের সামনে মা শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপরে জগদীশচন্দ্র বসুদের

সঙ্গে জার্মাণী প্রভৃতি জায়গায় চললেন। জেনেভায় 'বন্দেমাতরম'-এর কার্যালয়ে এসে নিবেদিতা জানতে পারলেন মদনলাল ধিংড়ার কথা। আর দেরি নয়, ভারতে যেতে হবে। নিবেদিতা ছদ্মবেশে বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নামলেন জুলাইয়ের মাঝামাঝি, ১৯০৯ সালে। তার আগে ৬ই মে তারিখে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এবার তাঁর অন্যরূপ মূর্তি। যোগে আত্মস্থ থাকতেন জেলখানায়। এই অবস্থাতেই তাঁর বাসুদেব-দর্শন হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে ৬ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' কার্য্যালয়ের বাসায় এসে উঠেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কৃষ্ণবাবু তখন নির্বাসিত। তাঁর একমাত্র পুত্র সুকুমার মিত্র অরবিন্দের স্ত্রী ও বোনের দেখাশোনার ভার বহন করছিলেন। অরবিন্দ দেখলেন, বিপিনচন্দ্র পাল বিলাত গিয়ে 'স্বরাজ' বলে একখানি মাসিকপত্র সেখান থেকে বার করছেন, মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেখানে গিয়ে নতুন শাসন সংস্কার দাবি করছেন। সন্ধ্যা, যুগান্তর, ও নবশক্তি নেই, 'বন্দেমাতরম' ও নেই। অরবিন্দ কী করবেন ভাবছেন, এমন সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ছোট ভাই গিরিজাসুন্দর এসে একখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক বার করবার প্রস্তাব জানালেন তাঁর কাছে। রাজী হলেন অরবিন্দ। এইভাবে শুরু হয়েছিল তাঁর 'কর্মযোগীন' পত্রিকা। ইতিমধ্যে উত্তরপাড়ায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সে এক নতুন আদর্শের ইঙ্গিত। তিনি তাঁর দিব্য অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে তার পরে বলেছিলেন, 'ভারত চিরকালই সমগ্র মানবজাতির জন্য কাজ করেছে, নিজের জন্য নয়। তাকে যে বড়ো হতে হবে, সে-ও নিজের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য।'

'কর্মযোগীন' প্রথম বার হলো ১৯০৯-এর ২৬শে জুন। এ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রামচন্দ্র মজুমদার, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, সুরেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি। মুদ্রাকর সেই 'বন্দেমাতরম' এর দণ্ডিত মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ। এই পত্রিকার মাধ্যমে

শ্রীঅরবিন্দ দেশাত্মবোধকে সাময়িক উত্তেজনার পথ থেকে সরিয়ে ভিন্ন দিকে চালনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। এক নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'ইয়োরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজ তৈরী করলে তাতে আমাদের সমাজের গ্লানি দূর হবে না।'

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলার আবর্তকে মূলধন করে রাজনৈতিক জীবন গ'ড়ে তুলতে পারতেন, হতে পারতেন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা, কিন্তু সে-সব তথাকথিত 'উচ্চাশা' অরবিন্দের ছিল না।

যাই হোক 'কর্মযোগীন' আদৃত হয়েছিল। লোকে চাইতেন, এর একটা বাংলা সংস্করণও হোক। এ-আহ্বানটা এলো উত্তরপাড়ার শ্রমজীবী সমবায়ের স্রষ্টা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অরবিন্দ দ্বিমত করলেন না, বাংলা কর্মযোগীনও বার হতে লাগলো। ইতিমধ্যে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারের একটি খসড়া বিলাতের প্রভুরা ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, মডারেটরা তার একটু রদবদল করে গ্রহণ করতেও রাজী হয়ে গেলেন। অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন,—'এতে দেশের খুবই ক্ষতি হবে। ইংরেজ যা এখন দিতে চাইছে, তা পাকা গোলামী ছাড়া আর কিছু নয়।'

এই সঙ্গেই তিনি করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উক্তি: Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control'.

এই সময় গিরিজাসুন্দরের আগ্রহে অরবিন্দ আর একখানি বাংলা সাপ্তাহিক বার করলেন, তার নাম হলো, 'ধর্ম'। এতে অরবিন্দ নিজের হাতে বাংলা ভাষাতেই লিখতেন। একটি নিবন্ধে জেলখানার সহরাজবন্দীদের বিষয় লিখতে গিয়ে বললেন,—'রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলেছিলেন,—এখন তোমরা কী দেখছো, এ কিছুই নয়। দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলেরা তিনদিন সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করবে। ঐ ছেলেদের দেখলে তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণীর সফলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।'

আরেকবার তিনি লিখলেন: 'স্বদেশ থাকলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী, এক দেশে তুই জাতি থাকতে পারে না, মিলিত হবেই।'

এই সময় মডারেট-দল, বিশেষ করে গোখলের মুখে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সুর যখন ধ্বনিত হয়ে উঠছে, তখন পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট সামসুল আলম বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের হাতে নিহত হলেন। এ-সম্পর্কে নিবন্ধ লিখলেন অরবিন্দ। কর্তৃপক্ষ অরবিন্দকে সরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটতে লাগলেন। ওদিকে নির্বাসন থেকে ফিরে শ্যামসুন্দর 'কর্মযোগীন' আর 'ধর্ম'-এর সহকারী সম্পাদকের কাজ করবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, কিন্তু 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষের অনুরোধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'তেই যোগদান করতে হলো তাঁকে। অবশ্য তিনি লেখা দিতেন 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগীন'-এর জন্য। এতে নিবেদিতাও লিখতেন মাঝে মাঝে।

এই সময় নিবেদিতা একটি খবর শুনতে পেলেন হঠাৎ। রামকৃষ্ণ মঠের যোগীন-মা, তাঁর এক আত্মীয় গোয়েন্দা-পুলিশের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, অরবিন্দকে ধরতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে। এটা শুনেই তিনি মঠের সারদানন্দকে খবরটা দিলেন। সারদানন্দ গণেন মহারাজকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন অরবিন্দের কাছে। অরবিন্দ সব শুনে স্থির হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপরে বললেন, 'নিবেদিতা যেন কর্মযোগীনের ভার নেন, আমি চন্দননগর যাবো।'

লিখলেন, Open letters to my fellow citizens, my political testament. আর ঐ রাত্রেই গেলেন নিবেদিতার বাসায়। দেখাসাক্ষাৎ করে এলেন দক্ষিণেশ্বরে, সেখান থেকে নৌকায় করে চন্দননগর, সঙ্গে ছিলেন নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ আর সুরেশ চক্রবর্তী। চন্দননগরে মতিলাল রায় তাঁকে তাঁর কাঠের গোলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। এ খবর মতিলাল রায় ব্যতীত আর যাঁরা জানতো, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীরায়ের স্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীলাল দে। পুলিশ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায় নি

সেদিন। চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী যান তিনি জাহাজে করে। কলকাতার প্রিন্সেপঘাট থেকে সে জাহাজ ছেড়েছিল। এ-ব্যাপারে যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন, সুকুমার মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যয়, নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দের যাত্রার সংবাদ পণ্ডিচেরীতে নির্বাসিত ডি-এস-আয়ার, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও তামিলনাড়ুর প্রখ্যাত জাতীয় কবি ভারতীকে জানানো হয়েছিল। তাঁরাই শ্রীঅরবিন্দকে জাহাজ থেকে নামিয়ে সন্তর্পণে পণ্ডিচেরীতে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জাহাজে ছদ্মনাম নিতে হয়েছিল অরবিন্দকে। পণ্ডিচেরীতে তার পৌঁছোবার তারিখ—৪ঠা এপ্রিল ১৯১০ সাল। কিন্তু তাঁর এই অন্তর্ধান নিয়ে দেশে জল্পনা-কল্পনার সীমা পরিসীমা ছিল না সেদিন।

কিন্তু জানতেন নিবেদিতা। তিনি যেদিন খবর পেলেন, শ্রীঅরবিন্দ নিরাপদে পণ্ডিচেরীতে পৌঁছেছেন, সেদিন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। 'কর্মযোগীন'-য়ে লেখা তিনি বন্ধ করেন নি। শ্যামসুন্দর বাবুও ছিলেন। কিন্তু একদিন পুলিশ এসে ছাপাখানায় তালা দিয়ে চলে গেল। রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ বার করার জন্য মামলাও হয়ে ছিল। এককথায়, পত্রিকা দুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নিবেদিতা এই ঘটনার পরে সস্ত্রীক জগদীশ বসুর সঙ্গে হিমালয় ভ্রমনে গেলেন। ফিরে এলেন যখন কলকাতায়, বারীন্দ্ররা তখন 'মহারাজা' জাহাজে আন্দামান চলে গেলেন। মনে শান্তি পাবার জন্য শ্রীমা (সারদাদেবী)-র কাছে যেতে লাগলেন নিবেদিতা। এই সময় জগদীশ বসু ও শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাছে খুবই আসতেন। আসতেন আরও অনেকে। আসতেন রামানন্দ চট্টোপাধায়। তাঁর মডার্ণ রিভিউতে নিবেদিতা এই সময় কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৯১০ সালের ডিসেম্বরে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন।

স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ সভাপতি। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সভাপতির উক্তি : 'এতে কোনো ফল হয়নি। Much personal sufferings ছাড়া দেশের উন্নতি একটুও হয় নি।'

নিবেদিতা অন্য সময় হলে এর উত্তর দিতেন, কিন্তু তাঁর অতি স্নেহের বারীন্দ্ররা দ্বীপান্তরে, মন তাঁর ভালো ছিল না। অন্তরে এক অদ্ভুত উদাসীনতার সুর! তার ওপর জানুয়ারীতেই খবর এলো আমেরিকা থেকে, স্বামীজীর 'ধীরামাতা' (মিসেস ওলিবুল) মৃত্যুশয্যায়। তিনি নিবেদিতাকে একবার দেখতে চান। নরওয়ের অধিবাসিনী এই ধনী মহিলার বহু দান আছে এই দেশের জন্য। সুতরাং আর দেরী না করে নিবেদিতা আমেরিকা রওনা হয়ে গেলেন। দেখা হলো অবশ্য শেষ মুহূর্তে। তাঁকে হারিয়ে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরলেন ১৯১১ সালের মার্চ মাসে। তখন তাঁর শরীর-মন দুই-ই ভেঙে পড়েছে। সস্ত্রীক জগদীশ বসু তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ সালে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছিলেন,—'যেদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম, সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার কাছে একটা মহাশূন্যের মতো মনে হচ্ছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করে তিনি অনেক কবিকেই তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসা দিতেন। কিন্তু তিনি নিধিবাবুর গানের যত প্রশংসা করতেন, এতো আর কারো নয়।'

নিবেদিতার শেষ কথা খাতা থেকে পড়তে পড়তে শেফালীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কণ্ঠও হয়েছিল রুদ্ধ। এ-রকম ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু আমি যে আরও জানতে চাই ওর কাছ থেকে! সেজন্য আবার শুরু হলো ওর সাধনা। দাদুর ঘর, বইপত্র ইত্যাদি নিয়ে দিন পনেরো ধরে একনাগাড়ে ও লিখে চললো, কোনোদিকে তাকালো না।

আমি ততদিনে ভালো হয়ে গেছি বলা যায়। উঠে হেঁটে বেশ বেড়াতে পারি, যদিও জখম হাতটা তখনো কাঁধ থেকে ঝোলানো রয়েছে সলিল ডাক্তারের নির্দেশে। একদিন বললাম, আর কতদিন থাকবো ? ভালো ত হয়ে গেছি।

কী যে হলো ওর মধ্যে, হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরলো, বললো, অন্ততঃ আমার লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার যাওয়া চলে না। এ-সহজ কথাটা বোঝেন না কেন ?

এ-প্রসঙ্গ এ-সূত্রে বেশি তুলতে চাই না। আমি থেকে গেলাম, শেফালীরও কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেল। আবার বসলো আসর। শেফালী পড়তে লাগলো।

রাসবিহারীর মুখ থেকে তন্ময়চিত্তে তোসিকো সব শুনতেন, খুব কম কথাই বলতেন। একদিন বলে উঠলেন,—আচ্ছা, এখানে, এই জাপানে, বরকৎউল্লা বলে একজন ছিলেন বলে কাগজে পড়েছি। শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বোধ হয় বিপ্লবী ছিলেন। একটা কাগজ বের করেছিলেন, 'নয়া ইসলাম'। ফলে পুলিশ তাঁর পিছনে লাগে। তাঁকে জাপান ছাড়তে হয়। শুনেছি আমেরিকা চলে গেছেন।

রাসবিহারীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন,—বা ! কতো খবরই না রাখো ! আমি সবে ওদের সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেতে শুরু করেছি। বরকৎউল্লাকে বিপ্লবীরা 'ইন্দো-জার্মাণ-টার্কিশ-মিশন'এর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠালেন, ইসলাম-ধর্মী দেশগুলোকে যাতে ব্রিটিশ-বিরোধী করে তোলা যায়, তার চেষ্টা করতে। ১৯১৫ সালের কথা। ইস্তাম্বুলে এসে তিনি মিশনের সভ্যদের সঙ্গে যোগ দেন। এখান থেকে মিশনের সভ্যরা যান কাবুল শহরে। মিশন অনেক চেষ্টার পর প্রতিষ্ঠা করলেন অস্থায়ী 'আজাদ সরকার'-এর। এই সরকারের তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট হলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। এই মহেন্দ্র-প্রতাপের কথা শুনবে ?

তোসিকো আগ্রহভরে মাথা হেলিয়ে উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই শুনবো।

রাসবিহারী বলতে লাগলেন,—আমাদের দেশের উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায় 'মুরসাল' বলে একটা জায়গা আছে। মোগল বাদশাদের সময়েই মহেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষরা 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। এঁদের শেষ স্বাধীন বংশধর ইংরেজের বিরুদ্ধে যাওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন বটে, কিন্তু 'রাজা' খেতাবটি থেকে যায়। এই রাজা এবার খাবেন কী? তাই অনুগ্রহ করে দু'শো গ্রাম দেওয়া হয় তাঁকে। ১৮৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর এই বংশেই মহেন্দ্রপ্রতাপ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার তিনি তৃতীয় পুত্র। তিন বছর যখন তাঁর বয়স তখন তাঁকে হাত্‌রাসের নিঃসন্তান রাজা দত্তক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। রাজার দুই রাণী। এই দুই রাণীরই চোখের মণি ছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। এই দুই মায়ের আকর্ষণেই তিনি বারবার বৃন্দাবনে আসতেন। হাতরাস রাজবংশও রাজ্য হারিয়ে জমিদার শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়।

দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো ১৯০৬ সালে, তখন তিনিও কলকাতায় এলেন অধিবেশন দেখতে। ফলে, উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জনের নীতি নিলেন তিনি। ওদিকে, বিয়ের সূত্রে তিনি নাভার রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। নাভার রাজাও ইংরেজের বিরুদ্ধে যাওয়ায় গদিচ্যুত হন।

ইতিমধ্যে ভারতকে ভালো করে দেখবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৯০২ সালে এই জাপানেও তিনি এসেছিলেন জাপান ও চীন। থেকে দেশে ফিরে গিয়ে স্থাপন করলেন, 'প্রেম মহাবিদ্যালয়'। বিনা খরচে ছাত্রদের কারিগরি বিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা হলো এখানে। মনে রাখতে হবে, তিনি ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর তখনকার 'জাত-পাত-তোড়ক' আন্দোলন সাড়া এনে দিয়েছিল দেশে। মেথর-মুর্দাফরাসদের

নিয়ে এসে সভা ক'রে তাদের হাতের জল খেয়ে ঐ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এক কথায়, জাতিভেদ-প্রথার প্রবল বিরোধী ছিলেন তিনি। এই আদর্শেই তিনি বার করেছিলেন তাঁর 'প্রেম' পত্রিকা। ১৯১৪ সালে দেরাত্বন থেকে বার করেছিলেন আর একখানা কাগজ, 'নির্মল সেবক'। আমি শুনেছি, যুদ্ধ বাঁধলে পরে জার্মাণদের স্বপক্ষে তিনি কিছু লিখেছিলেন, ফলে কাগজটাকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। তাঁর 'প্রেম মহাবিদ্যালয়'ও পুলিশের বাঁকা চোখ এড়াতে পারে নি। রাজা এই সময় চলে গেলেন ইয়োরোপে। প্রথমে গেলেন জেনেভায়, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁর প্রেম মহা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক আরেক বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর চলে গেলেন আমেরিকায়। রাজা গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে, সেখানে পাঞ্জাবের আর এক বিপ্লবী লালা হরদয়ালের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপরে এই সেদিন ১৯১৫ সালে গেলেন বার্লিনে, ভারতীয় বিপ্লবীদের 'ইণ্ডিয়া কমিটি' রাজাকে তাঁদের মধ্যে বরণ করে নিলেন। রাজা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য স্বয়ং কাইজারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফল, জার্মাণ-দপ্তর থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে আফগানি-স্থানের আমীরের কাছে তাঁর উপস্থিত হওয়া। সঙ্গে ছিলেন বরকৎউল্লা ও একজন জার্মাণ প্রতিনিধি। ইস্তাম্বুলে তুর্কির যুদ্ধ-দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা সেরে তাঁরা রওনা হলেন কাবুলে। তুর্কি তখন জার্মাণীর পক্ষে। আফগানিস্থানের আমীর হাবিবুল্লা যাতে ইংরেজের বিপক্ষে যায়, সেটাই ছিল জার্মাণী বা তুর্কির লক্ষ্য। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে কাবুলের আমীরকে সে-কথা বোঝাতে লাগলেন। ব্রিটিশের অনুরোধে হাবিবুল্লা সে সময় মৌলানা ওয়েবুদ্দোল্লা সিন্ধি ও আরও কয়েকজন ভারতীয়কে বন্দী করে রেখেছিল। রাজার চেষ্টায় তাঁরা মুক্তি পান। হাবিবুল্লাকে স্বপক্ষে টেনে আনার কৃতিত্ব মহেন্দ্রপ্রতাপের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে ভালো ভাবে পরিচালনা করা যায়, তার জন্য কাবুলে তৈরী হলো স্বাধীন ভারতের

অন্তবর্তীকালীন সরকার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৫ সালে। রাষ্ট্রপতি হলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী বরকৎউল্লা। এই সরকারকে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিয়েছে তুর্কি, জার্মাণী, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ। তবে সম্প্রতি খবর পেয়েছি, অবস্থাটা বদলে গেছে। ১৯১৭-তে তুর্কি হেরে গেছে, তুমি জানো। আমীর ভয় পেয়ে ইংরেজদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। মহেন্দ্রপ্রতাপকে বাধ্য হয়ে তাই কাবুল ছাড়তে হলো। শুনেছি, তিনি রাশিয়া হয়ে রাশিয়ার ট্রাস্কি প্রভৃতি প্রথম সারির কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে জার্মাণীতে চলে গেছেন।

এই পর্যন্ত বলে রাসবিহারী হয়ত একটু থেমে গিয়েছিলেন, অবশ্য কল্পনা করেই একথা বলছি। তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তোসিকো দুটি পিপাসিত চোখ মেলে চেয়ে আছেন স্বামীর দিকে। বললেন,—আরও বলো। আমি যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি!

হয়ত সেটা গভীর রাত। রাসবিহারী জানালার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন,—ঘুমোবে না?

তাঁর হাতখানার ওপর হাত রেখে তোসিকা হয়ত ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেছিলেন—না-না-ঘুমুবো না—তুমি বলো, তোমার দেশের কথা। ও যে এখন আমারও দেশ।

স্ত্রীর হাতে একটু চাপ দিয়ে রাসবিহারী বলতে শুরু করলেন,—এবার তাহলে একটি মানুষের কথা শোনো, যার সঙ্গে আমার সম্পর্কও এক সময় কম ছিল না! ইনি হচ্ছেন পাঞ্জাবের লোক। দিল্লীতে বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা, ইত্যাদি। নিম্নমধ্যবিত্ত অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। সাত ভাইবোনের মধ্যে ষষ্ঠ। মায়ের নাম ভোলিরাণী, বাবার নাম গৌরীদয়াল মাথুর। এঁর নাম হচ্ছে লালা হরদয়াল, জন্ম তারিখ ১৪ই অক্টোবর, ১৮৮৪ সাল। ছাত্র হিসাবে দারুন ভালো বললেই সব কথা বলা হয় না, শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মূর্তিমান বিস্ময়। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। একবার পড়লেই সব মুখস্থ হয়ে যেতো। স্মৃতির

সঙ্গে ছিল মেধা। দিল্লী থেকে জলপানি পেয়ে যখন লাহোর সরকারী কলেজে পড়তে গেলেন, তার আগে থেকেই ছাত্রমহলে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে। ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ পাশ করে, পরের বছর আবার ইতিহাসে রেকর্ড নম্বর পেয়ে এম-এ হলেন। ভারত সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে তিন বছরের পোস্ট-গ্রাজুয়েট পড়তে গেলেন বিলাতে। বয়স তখন কতো? কুড়ি-একুশের বেশী নয়। বিলাতে গিয়েই তিনি প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী হলেন। পরে তিনি বন্ধুদের কাছে বলতেন —ইংরেজদের অসাধারণ দেশপ্রেম দেখেই আমি দেশকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম। আমরা দেশকে ভালোবাসলে ওরা বলে—রাজদ্রোহ, কিন্তু সেই ভালোবাসা ওদের মধ্যে প্রকাশ পেলে, সেটা হয় মহত্ত্ব। ওদের চরিত্রের এই ধাঁধা বা বিপরীতমুখীনতা আমি বুঝতে পারি না।

যাক্ এখন ওঁর নিজের কথায় ফিরে আসি। বিলেত যাবার বেশ কিছুদিন আগেই ওঁর বিয়ে হয়েছিল। অক্সফোর্ডে সেন্ট জন্‌স্ কলেজে ভর্তি হলেন গিয়ে। খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। ভাই পরমানন্দ তখন লণ্ডনে কিংস কলেজে পড়তেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখতে লণ্ডন আর অক্সফোর্ডে ছোটাছুটি করতেন। তাছাড়া আর একটা কাণ্ড করলেন হরদয়াল। কলেজ ছুটি হতেই হঠাৎ না বলে কয়ে দেশে এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। সে-ও ভারী মজার কাণ্ড, না বলে পারছি নে। ওঁর স্ত্রীর নাম সুন্দররাণী, বয়স তার তখন খুবই কম। তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর বাড়ি মীরাটে নিয়ে যাবেন কথা আছে, কিন্তু হরদয়াল বললেন,—বায়োস্কোপ দেখতে যাবো। বায়োস্কোপ ত ও কখনো দেখেনি, আমি দেখিয়ে তারপরে মীরাট নিয়ে যাচ্ছি।

—ওমা! মেয়েমানুষ বায়োস্কোপ দেখবে!- সে আবার কী?

এই সব কথা উঠলো। কিন্তু হরদয়াল ছাড়লেন না। স্ত্রীকে পুরুষের বেশ পরিয়ে সঙ্গে নিলেন। তাঁর আসল মতলবটা জানলো

তাঁর এক বন্ধু খুদাদাদ। সেও সঙ্গে রইলো। আর সঙ্গে রইলো মহাবীরচাঁদ, সুন্দররাণীর আত্মীয়, যিনি তাঁকে মীরাটে নিয়ে যাবেন। কী আর করা, জামাইয়ের আবদার। সদলবলে গেলেন সব বায়োস্কোপ নামধারী নতুন পদার্থ দেখতে। দেখার পর দলটা রওনা হলো মীরাটের দিকে। কিন্তু গাজিয়াবাদে পেঁাছে হরদয়াল হঠাৎ স্ত্রীকে নিয়ে উঠে বসলেন বোম্বাইয়ের ট্রেণে। মহাবীরচাঁদ হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলো। খুদাদাদ শক্ত করে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরলো।

– এর মানে কী!

হরদয়াল গাড়ির কামরা থেকে চেঁচিয়ে বললেন,—প্রেমে আর যুদ্ধে কিছুই বেঠিক নয়।

কিন্তু হলে হবে কী? মহা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। সুন্দর রাণীর পিতৃপক্ষ পুলিশ পর্যন্ত ছুটলেন। 'খুঁজে বার করো ওদের দুজনকে'—সুন্দররাণীর বাবার আদেশে দিকে দিকে লোক ছুটলো। কিন্তু আসামী তখন পগার পার। বোম্বাই থেকে জাহাজ ধ'রে সোজা বিলাত!

শুনলে অবাক হবে, এই নিয়ে কাগজে বড়ো বড়ো করে খবর বেরিয়েছিল,—স্বামী কর্তৃক স্ত্রী অপহরণ!

যাই হোক, বিলাতে তিনি শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর "সোশ্যালিস্ট" কাগজে লিখতে লাগলেন, স্ত্রীকে নিজে পড়াতে লাগলেন। এমন ভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন, যাতে তিনি ভারতে গিয়ে মেয়েদের মধ্যে সমাজ-সেবার কাজে লাগতে পারেন। এই সময় ভাই পরমানন্দের মতো সাভারকরের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হলো। ভারতে এক একটি ঘটনা ঘটে, আর এঁরা জ্বলে জ্বলে ওঠেন! তিলকের কারাদণ্ড এইরকম একটি ঘটনা। তারপরে লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-এর নির্বাসন। হরদয়াল প্রায় ক্ষেপে গেলেন। ইংরেজদের দেওয়া বৃত্তি নেবো না, ইংরেজের শিক্ষাও নেবো না—এই হলো তাঁর পণ। বৃত্তি ছাড়লেন, শিক্ষাও ছাড়লেন, কায়ো

কথা শুনলেন না,—স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। অবশ্য তাঁর শ্যালকের বিয়ে স্থির হয়েছিল, সেই সূত্রে তাঁর স্ত্রীর পক্ষে অন্ততঃ আসা দরকার ছিল। সুন্দররাণীকে আবার হিষ্টিরিয়া রোগে ধরেছিল এই সময়। কিন্তু তাঁর ঐ বৃত্তি ছেড়ে দেওয়া, বিলিতি-ডিগ্রী-কোর্স ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে কম হৈ-চৈ হয়নি সেদিন, কাগজে পর্যন্ত খবর বেরিয়েছিল। লালাজীর নির্বাসনে আরও একজন ঐরকম ক্ষেপে গিয়েছিলেন, তিনি হ'লেন পাণ্ডুরঙ্গ। 'মহাদেব বাপাত' স্কলারশিপ নিয়ে বোম্বে থেকে গিয়েছিলেন বিলেতে পড়তে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক থাকার দরুণ ঐ বৃত্তি তিনি হারান। লোকমাণ্য তিলকের চিঠি পেয়ে শ্যামাজী ওকে সাহায্য করতে লাগলেন। ইণ্ডিয়া হাউসে জায়গা করে দিলেন। বাপাত তখন টগবগ করে ফুটছেন। বোমা প্রস্তুত-প্রণালীর বই আনবার জন্য প্যারিসে ছুটলেন, বললেন,—'বোমা তৈরি শিখে পার্লামেণ্টের মধ্যে ফাটাবো।'

সাভারকররা ওঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করেন। বাপাত তখন দেশে ফিরে এসে বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটিতে বোমা তৈরির শিক্ষা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর কথা আগেই বলেছি, ঐ বোমা-শিক্ষার বই আরও একজন ভারতে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর নাম হোতিলাল বর্মা। ১৯০৮ সালে সাভারকরও তাঁর দাদাকে এক কপি পাঠিয়েছিলেন। মানিকতলার মুরারীপুকুরের মতো বোম্বাই অঞ্চলের বেসিনেও বোমার কারখানা করা হয়েছিল।

ভারতে এসে হরদয়াল প্রথমেই দেখা করলেন তিলকের সঙ্গে। তিলক বললেন,—'একটা আশ্রম তৈরি করো। বাইরে চলবে আশ্রমের কাজ, ভিতরে সন্ত্রাসের প্রস্তুতি। তোমাদের ওদিকে বিপ্লবীদের একটা শক্ত ঘাঁটি থাকা দরকার।

হরদয়াল পুণা থেকে দিল্লী এলেন। দিল্লী থেকে পাতিয়ালা। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। স্ত্রীকে বললেন,—এবার বিদায় দাও।

আমি সন্ন্যাসী হবো, তিলক মহারাজ যা বললেন, সেইভাবে আশ্রমের কাজ করবো।

সুন্দররাণী তখন সন্তান-সম্ভবা। কিন্তু অজস্র কান্নাকাটিতেও হরদয়ালকে ফেরানো গেল না, তিনি পাতিয়ালা ছাড়লেন। জীবনে আর দেখা হয়নি স্ত্রীর সঙ্গে। এমন কী, তাঁদের একমাত্র সন্তান, একটি কন্যা, নাম তাঁর শান্তি, তাঁরও মুখ তাঁর দেখা হয়নি কোনোদিন। মেয়েও দেখতে পায়নি কোনোদিন বাবাকে।

শুধু স্ত্রী নয়, নিজের মা-ও আটকে রাখতে পারলেন না ছেলেকে। ততদিনে হরদয়ালের বাবাও চলে গেছেন পরপারে। ইতিমধ্যে তরুণ সঙ্গী যাঁদের মধ্যে তিনি দেশপ্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে গিয়েছিলেন বিলেত যাবার আগে, তারা ব্রিটিশদের দমন-পীড়নের খবরে বিশেষ উত্তেজিত। তার ওপরে সেই সময় পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে কবি লালাচাঁদ ফলকের কবিতা 'পাগড়ি সাম্‌হাল ও জাত্তা,—বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। হরদয়াল আবার এদেরই মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। জিতেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী, দ্বারকানাথ বোস আর হরজুওয়ারি সিং,—এরা বাড়ি থেকে পালিয়ে হরদয়ালের সঙ্গ নিলেন। চললেন কানপুর। এই কানপুরে চেনা একজনের বাড়িতে আস্তানা নিলেন ওঁরা। মনে হচ্ছিল কানপুরই হবে বুঝি হরদয়ালের সেই 'আশ্রম'। একুশ দিন এখানে একসঙ্গে ছিলেন ওঁরা। হয়ত আরও থাকতেন, কিন্তু আহ্বান এলো লাহোর থেকে। লালা লাজপৎ রায় ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, হরদয়ালের আশ্রমটা ওখানেই হোক। তাছাড়া, দৈনিক 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার জন্য হরদয়ালকে দরকার লালাজীর। হরদয়াল সেইমতো লাহোরে এসে ডেরা বাঁধলেন। এ-সময় শুধু 'পাঞ্জাবী' কেন, রামানন্দ বাবু 'মডার্ণ রিভিউ'তেও লিখতে লাগলেন। আশ্রমও চলছিল। এর মধ্যে একদিন দ্বারকানাথ বোসের বাবা টের পেয়ে লাহোরে এসে উপস্থিত। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে,অনেক কাণ্ড করে ছেলেকে তিনি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ঐ সময় আবার যুক্ত-

প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেবার জন্য আরেক শিষ্য তারাচাঁদকে পাঠালেন। তারাচাঁদ সেবার কাজ সেরে আর গুরুর কাছে ফিরে আসেন নি। বাকি রইল চ্যাটার্জী। এই চ্যাটার্জী সাহারাণপুরের লোক, ওঁর বাবা ওখানকার সব থেকে বড়ো উকিল। এই চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় দেরাদুনে, একটা বিয়ে-বাড়িতে। তুমি তো জানো তোসিকো, আমি তখন দেরাদুনে চাকরী করছি, আর যোগাযোগ রাখছি খুব গোপনে বাংলার সঙ্গে। আমি জানতাম এই অঞ্চলে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী কী কাজ করে গিয়েছিলেন ! এই চ্যাটার্জীদের বাড়িতেই তিনি ছিলেন কয়েকদিন। যতীন্দ্রনাথ থেকে হরদয়াল, চ্যাটার্জী এখন হরদয়ালের দলের লোক। হরদয়াল তখন খুবই নাম করেছেন, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ ব্রিটিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, বাংলায় একটা করে ঘটনা ঘটছে, আর তিনি প্রবন্ধের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন। ফলে একদিন গোপন খবর এলো লাজপৎ রায়ের কাছে,—'হরদয়ালকে নিয়ে কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামাচ্ছে। ওকে যেমন করে পারেন দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিন।'

কিন্তু হরদয়াল কি সহজে যাবার পাত্র ? লাজপৎ রায় ও অন্যান্য বন্ধুরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁকে রাজী করালেন। কিন্তু যাবেন যে তিনি, তাঁর কাজ কে করবে ? চ্যাটার্জী তো রইলই,কিন্তু আরও একজন একটু বয়স্ক লোক দরকার। দিল্লীর 'মাস্টার আমীর চাঁদ'কে এই ভার দিয়ে গেলেন তিনি। লাহোরে তাঁর প্রতিবেশী হনুমন্ত সিং-ও কাজের ভার নিলেন। এসব ঘটনার পরে হনুমন্ত কলকাতায় গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসেছিলেন। ওরা ছাড়া, আরও একজনকে পাওয়া গেল, তাঁর নাম 'অবোধবিহারী'।

যাইহোক, এই সময় চ্যাটার্জী একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে মাস্টার আমীরচাঁদের চেষ্টায় সাহারানপুরে পাঠানো হলো। গেরুয়া পরতেন চ্যাটার্জী। বাড়িতে মা ওর গেরুয়া ছাড়ালেন। এখানে মাস দুই

শয্যাশায়ী থাকার পর চ্যাটার্জী গেলেন দিল্লী, লাহোর ও আম্বালা। এইখানকার হোমিওপ্যাথ-ডাক্তার হরিনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মাধ্যমে মানিকতলা বোমার মামলার এক পলাতক আসামীর সঙ্গে আলাপ হলো তাঁর।

তারপরে আবার লাহোর। লাহোরে চ্যাটার্জী আলাপ-আলোচনা করলেন অজিত সিং আর সুফী অম্বাপ্রসাদের সঙ্গে। কিছুদিন পরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ভাইপো চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ঐরকম ভাবে পালিয়ে এসেছিলেন। এই বিপ্লবীটি খুব ভালো ফরাসী জানতেন। এঁকে বিপ্লবীরা অনেক কাণ্ড করে দেশের বাইরে পাঠাতে পেরেছিলেন। কাইজারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন উনি, পরে তাঁকে 'ব্যারণ' উপাধি দিয়েছিলেন কাইজার, বলা হতো, 'ব্যারণ ফন চক্রবর্তী'। ভারতীয়দের 'বার্লিন' কমিটি'র একজন সভ্যও হয়েছিলেন। পরে এঁর কথা আরও বলবো। এর পরে আরেকজন বিপ্লবী এলেন বাংলা থেকে, ওঁদের কাজে সাহায্য করতে, তাঁর নাম হরিশ ঘোষ। এইভাবে যখন ঐ অঞ্চলে বিপ্লব-কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠছে, তখন আমি আসি সাহারাণপুরে, ১৯০৮ সালে। পিস্তল আমি যোগাড় করেছিলাম, কিন্তু বোমা যে তৈরী হবে, তার খোল কোথায় পাই? হরিশ ঘোষ বললো—'ভাবনা নেই রাসবিহারীদা, আমি যোগাড় করে আনছি।'

জানি না কোথা থেকে সে এক ট্রাঙ্কভর্তি খোল নিয়ে এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো লাহোরে। সেখানে অজিত সিং ওগুলি নিয়ে নেবে কথা হলো। তার বাড়ীর কাছাকাছি একটা দোতলায় ওটা রাখবার কথা ছিল। অজিত সিং-এর পাঠানো লোকের হাতে ট্রাঙ্কটা জিম্মা করে দিয়ে চ্যাটার্জী আর হরিশ অজিত সিং আর সুফি অম্বাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সবাই মিলে কথা বলছে, এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে সেই লোকটা এসে হাজির। কী ব্যাপার? সর্বনাশ হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরে হানা দিয়েছে। ট্রাঙ্কটা নিয়ে গেছে, আপনাদের দুজনকে খুঁজছে।

চ্যাটার্জী আর হরিশ তৎক্ষণাৎ রওনা দিলো। তখুনি সাহারাণপুরে না গিয়ে শিয়ালকোটের ট্রেন ধরে অমর দাস বলে একজনের বাগান-বাড়িতে লুকিয়ে রইলো কয়েকদিন।

সে সময় আরও কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী বাংলা থেকে চলে এসেছেন এখানে। তাদের নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম। হরিদ্বারের কংখল ছিল ঐরকম একটা গুপ্ত ঘাঁটি। সেখানে তৈরী বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে বোমা ফেটে যায়, আমাদের লোকেরা আহত হয়।

এই সময় আমীর চাঁদের মাথা থেকে বেরোয়, বড়লাটের ওপর বোমা ছুড়লে কেমন হয়? ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছে, ১৯১২-র কোনো সময় রাজকীয় জাঁকজমকে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লী প্রবেশ করবে, কারণ দিল্লী তখন রাজধানী, কলকাতা নয়। কিন্তু তার আগে আমরা সম্মিলিতভাবে একটা বিদ্রোহ গড়ে তুলতে চাইছিলাম। এর মধ্যে সৈন্যদেরও চাই, বন্দুকধারী পুলিশও চাই। এ-বিষয়ে কী কী করতে হবে, তার একটা প্ল্যান একটা খাতায় ছকে ফেললো চ্যাটার্জী। অজিত সিং আর সুফি অম্বাপ্রসাদ খাতাখানা নিয়ে গেলো, ওরা মুখস্থ করে খাতাখানা একেবারে ছিড়ে ফেলবে কথা ছিলো। খাতাখানা ওরা রাখতো 'থঙ্গসাল' বলে একটা কাগজের সম্পাদক বাঁকে দয়ালের কাছে। কিন্তু পত্রিকার অফিস খানাতল্লাসী করতে গিয়ে পুলিশ ঐ খাতাখানাও পেয়ে যায়। পুলিশ ওদের তিনজনকে খুঁজতে থাকে। সুফি আর অজিত সিং পারস্যের দিকে চলে যায়, ছদ্মবেশ ধরে। আর, চ্যাটার্জীর বাবার পরামর্শক্রমে চ্যাটার্জী চলে যায় বিলেতে। ওদের সমস্ত কাজকর্ম এসে পড়লো আমার ঘাড়ে। আমার সঙ্গে তখন ছিল বলরাজ ভালা, বসন্তকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছেলে। এই বসন্তকুমারকে কীভাবে পেয়েছিলাম বলি। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রমজীবি সমবায়'-এর কথা বলেছি। এইখানে দুটি তরুণ বাস করতো, বসন্তকুমার বিশ্বাস আর মন্মথ নাথ

বিশ্বাস। মতিলাল রায় ওদের নিয়ে এসে রাখে চন্দননগরে, তার নিজের কাছে। দিল্লীতে আমাদের কাজ করতো আমীরচাঁদ আর অবোধবিহারী। আমি এদের সঙ্গে পরামর্শ করে চন্দননগর থেকে ঐ ফুটফুটে ছেলে বসন্তকে সঙ্গে করে দিল্লী নিয়ে আসি। আর একজন সহকারী পেয়েছিলাম, সে হচ্ছে বিষ্ণু গণেশ পিংলে। এ-ছাড়া ছিল কাশীর শচীন সান্যাল। আর ছিল বালমুকুন্দ।

যাই হোক, আমি আসবার সময় চন্দননগর থেকে একটি বোমাও নিয়ে আসি। মতিলাল রায় এটি পাঠিয়ে দিয়েছিল তার এক কর্মী নলিনচন্দ্র দত্তের হাত দিয়ে। হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলা হবে, এই প্ল্যান মতিলাল জানতো, আর জানতো স্বয়ং বাঘা যতীন। কিন্তু হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলার ঘটনার আগে সুফি অম্বাপ্রসাদের কথা বলে নিতে হবে। ১৮৫৮-তে তার জন্ম। জন্ম থেকেই তার ডান হাতটি ছিল না। বন্ধুদের বলতো, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যুদ্ধ করতে করতে মারা যাই, ডান হাতটা খুইয়েছি সেই সময়। এ-জন্মে তাই ডান হাতখানাই নেই।

এই মানুষটি গরম গরম লিখতো তার নিজের কাগজে। উর্দু কাগজ বার করতো তার নিজের জায়গা মোরাদাবাদ থেকে। ঐরকম লেখার জন্য তার তিনবার জেল হয়। এ হলো তার জীবনের গোড়ার কথা। অজিত সিং আর সে গিয়ে উপস্থিত হয় পারস্য থেকে তুর্কিতে। অস্থায়ী আজাদ সরকারের কথা আগেই বলেছি। তার সঙ্গে যোগ দেয়, কিন্তু আমীরের মতিগতি বদলে যাওয়ায় ওঁদের সরে পড়তে হয়। অম্বাপ্রসাদ পারে নি, ধরা পড়ে যায় ব্রিটিশের হাতে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এমনভাবে তাকে মারা হয় যে, তার সেলের মধ্যেই সে মরে কাঠ হয়ে থাকে।

কিন্তু যা বলছিলাম। ভাই বালমুকুন্দ আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। তার খবর আর কেউ জানতো না। জানতো তার সুন্দরী স্ত্রী, রাসরাখী। এই রাসরাখীর কথাও পরে বলতে হবে।

চ্যাটার্জী বিলেত থেকে লুকিয়ে দুটি রিভলবার পাঠিয়েছিল আমায়। সে ব্যারিস্টারী পাশ করলো। ব্রিটিশ গায়নায় যাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভাই পরমানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়াই সে তা করতে দেয়নি, সঙ্গে করে দেশে নিয়ে আসে। দেশে এসে এলাহাবাদ কোর্টে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছে।

ওদিকে হরদয়াল কলম্বো হয়ে একটা ইটালিয়ান জাহাজে করে ইয়োরোপে পৌঁছেছেন। প্যারিসে শ্যামাজী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। হরদয়াল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় কাজে লাগলেন মাদাম কামা ও রাণাজীর কথায়। ধিংড়ার ফাঁসি, সাভারকরের বিচার,—সবই হরদয়ালের লেখণীর মুখে অগ্নি বর্ষণ করেছিল সন্দেহ নাই।

মাদাম কামাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী-চক্র আবর্তিত হতো, এ-কথা আগেই বলেছি। ১৯১০ সালের কথা, মাসটা আগস্ট। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরদয়াল, রাণাজী ও মাদামের সঙ্গে ছিলেন আরেক বিপ্লবী ভি-ভি-এস আইয়ার। আইয়ার মিশরের বিপ্লবী ফরিদবের সাহায্যে মিশরে গিয়ে মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে থাকেন। সেখান থেকে সুযোগ বুঝে যান সিংহলে, সিংহল থেকে থেকে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে। কিন্তু পণ্ডিচেরী থেকে বার হওয়ামাত্রই পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে।

মাদাম কামা ভারত ও মিশরের বিপ্লবীদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করছিলেন। এই কাজে ফরিদ বে ছিলেন মাদামের ডান হাত। এই সূত্রে আরেকটি মহিলার কথা আমরা শুনতাম। তিনি হচ্ছেন কুমারী পেরিন নওরোজী। সাভারকরকে যখন লণ্ডনে গ্রেপ্তার করে, তখন উনি সাভারকরের সঙ্গে ছিলেন। পেরিন হরদয়ালকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। থাকতেন মাদাম কামার কাছে, তার আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯১০-এর ডিসেম্বরে মহিলাটি ভারতে ফিরে গেছেন।

হরদয়াল প্যারিস ছেড়ে আফ্রিকার উত্তর উপকূলের অ্যালজিয়ার্সে

গেলেন। কারণ, এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে জাতীয় চেতনা না জাগাতে পারলে মুক্তি নেই,—এই ধারণা তাঁরও মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু অ্যাল্জিয়ার্সে কাজ করার ক্ষেত্র তখনো প্রস্তুত হয় নি, বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন প্যারিসে, তারপরে যান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের 'লা-মার্তিনিক' দ্বীপের প্রধান শহর ফোর্ত দ্য ফ্রাঁস-এ। সাভারকরকে রক্ষা করতে না পারায় তিনি এ সময়ে খুব মুষড়ে পড়েছিলেন।

ভাই পরমান্দের কথা বলেছি। ১৯০৮ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে লাহোরের দয়ানন্দ কলেজে পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ভাই পরমানন্দ তাই আর কী করবেন। বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। আফ্রিকা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে মরিসাল এবং ফিজি দ্বীপে যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বাস করেন, তাদের কথা জানতে পারলেন। এর পরে চললেন তিনি আমেরিকায়। যাবার পথে প্যারিসে হরদয়ালের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলেন তিনি 'লা মার্তিনিক' দ্বীপে চলে গেছেন। পরমানন্দ নিউ ইয়র্কে পোঁছে ব্রিটিশ গায়েনার জর্জ টাউনে যাবার জাহাজ ধরলেন। পথে পড়বে লা মার্তিনিক দ্বীপ। কিন্তু লা-মার্তিনিকের 'ফোর্ত দ্য-ফ্রাস'-এ হরদয়ালকে কি খুঁজে বার করা অতোই সহজ? অনেক কষ্টে বার করলেন। কুঁড়ে ঘরে যাযাবরের মতো বাস। দেখে, চোখে জল আসে।

—এভাবে মানুষ থাকে?

হরদয়াল হাসলেন, বললেন,—ছেলে পড়াই। চলে যায় কোন রকমে। জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা। দশ টাকায় মাস চলে যায়।

ভাই পরমানন্দ মাস খানেক রইলেন হরদয়ালের সঙ্গে। বললেন, এইসব দ্বীপে ভারতীয়দের অবস্থা দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে আমেরিকায়। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ কী করে গেছেন জানো তো? ক্ষেত্র প্রস্তুত। ওঁকে আদর্শ করে কাজ শুরু করে দাও। আজ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাই আমাদের সব থেকে প্রয়োজন।

এর পরে ভাই পরমানন্দ চলে গেলেন ব্রিটিশ গায়েনায়। সেখানকার ভারতীয়রা যেন হাতে চাঁদ পেলো। তাদের আগ্রহে মাস দশেক ভাইজীকে থাকতে হয়েছিল তাদের মধ্যে। চাঁদা তুলে তিনি একটি হিন্দু পাঠশালা গড়ে দিয়ে আসেন। এসব কাজও খুব তুচ্ছ করার মতো নয়।

১৯১১-র জানুয়ারীতে 'লা-মার্তিনিক' ছেড়ে হরদয়াল চলে গেছে আমেরিকার বোস্টনে ভাইজীর কথায়। বোস্টনে দিন কয়েক থেকে গেলেন হার্ভার্ডে। এখানে তেজা সিং বলে এক পাঞ্জাবী এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কালিফোর্ণিয়া থেকে। এই কালিফোর্ণিয়া রাজ্যে কয়েক হাজার শিখও অন্যান্য পাঞ্জাবী শ্রমিক অথবা মিস্ত্রীর কাজ করে দিন গুজরাণ করে। এদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে বিপ্লবের কাজে লাগানো যেতে পারে। ওদিকে ভাই পরমানন্দ ত্রিনিদাদে গেছেন ভারতীয়দের মধ্যে। এখান থেকে নিউইয়র্ক হয়ে তিনি এলেন স্যানফ্রান্‌সিস্কোয়। কিন্তু কোথায়, হরদয়াল ? হরদয়াল এখান থেকে গেছেন হনলুলু। তুমি বোধ হয় জানো না তোসিকো, সান ইয়াৎ সেন কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিয়ে হনলুলুতে গিয়েছিলেন, আমাদের তোয়ামারই সাহায্যে। সেখানে হরদয়ালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আমি তাঁর কাছ থেকেই হরদয়ালের কথা শুনেছি।

যাই হোক, ভাই পরমানন্দ চিঠিপত্র লিখে অনেক করে হরদয়ালকে ফিরিয়ে আনলেন আমেরিকায়। স্যানফ্রান্‌সিস্কোয় একসঙ্গে রইলেন বেশ কিছুদিন। ক্যালিফোর্ণিয়ায় ভাইজী ছিলেন প্রায় দেড় বছরের মতো। হরদয়াল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াবার কাজ পেলেন। কিন্তু আসল কাজটা ছিল অন্য। স্যানফ্রান্‌সিস্কো ও অন্যান্য জায়গার ভারতীয় শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা। ভাইজীর পরামর্শে দেশ থেকে বৃত্তি দিয়ে মেধাবী ছাত্র আনবার ব্যবস্থা হলো, যারা এখানে উচ্চ শিক্ষা নেবেন। ওখানকার এক ধনী ব্যবসায়ী ভাই জাওলা সিং টাকা দিলেন। মেধাবী ছাত্র

বাছবার জন্য কমিটি হলো, তাতে হরদয়াল ত ছিলেনই, আর ছিলেন তেজা সিং, তারকনাথ দাস ও অধ্যাপক আর্থার হোপ। বৃত্তিটির নাম দেওয়া হলো 'গুরু গোবিন্দ সিং বৃত্তি'। কিন্তু সে যাই হোক, আমেরিকায় কিছু ছাত্রই প্রথম গুপ্ত ঘাঁটি সৃষ্টি করতে থাকে, তাদের মধ্যে তারকনাথ দাস অন্যতম। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু গণেশ পিংলে, কাশীরাম আর পাণ্ডুরঙ্গ খানাখোজের নাম করতে হয়। এঁদের মধ্যে লালা হরদয়াল গিয়ে পড়ায় কাজটা আরও সংহত ও প্রচণ্ডতা লাভ করে। একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে তার নাম দেওয়া হয় 'গদর পার্টি'। এদের মুখপত্রও ছিল ঐ নামে। প্রথমে গুরুমুখীতে বেরুতো। তারপরে বেরুতো উর্দুতে, হিন্দীতে, গুজরাটিতে। কিছু প্রবন্ধ এর থেকে অনুবাদ করে নিয়ে ইংরেজীতেও বার হতো। প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯১৩-এর ১লা নভেম্বর। এতে বলা হলো,—"তোমার নাম কী? গদর বা বিদ্রোহ। তোমোর কাজ কি? বিদ্রোহ। কোথায় এটা ঘটবে? ভারতবর্ষে। সেদিন শীঘ্রই আসবে, যেদিন কলম আর কালির জায়গায় রাইফেল আর রক্ত দেখা দেবে।"

গদর দলের কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এদের কাজে আরও উদ্দীপনা জোগালো বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলার ঘটনা। খুব সাবধানে আমি এগিয়েছিলাম। আমার ওপর যখন ভার তখন আমি কোন খুঁত রাখবো না।

বসন্ত বিশ্বাসকে এনেছিলাম দেশ থেকে। বালমুকুন্দের চেষ্টায় লাহোরে একটা ডিস্‌পেনসারিতে কম্পাউণ্ডারের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। বিপিন দাস নাম দেওয়া হয়েছিল তাকে। অবোধ বিহারী, আমি আর ঐ বিপিন দাস তৈরি হতে লাগলাম 'অ্যাকশন'-এর জন্য। নদীয়া জেলার পোড়াগাছা ছিল বসন্তের বাড়ি। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে, কুড়ি-একুশ বছর বয়স।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর জাঁকজমক সহকারে বড়লাট দিল্লী এসে দরবার করবেন। সেন্ট্রাল স্টেশনে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের

স্পেশাল ট্রেন এসে থেমেছে। বিরাট এক দাঁতাল হাতীর পিঠে রৌপ্য-নির্মিত হাওদায় চড়ে জাঁকজমক সহকারে হার্ডিঞ্জ চলতে লাগলেন সস্ত্রীক। আমি ছদ্মবেশে জনতার ভিড়ে মিশে ছিলাম, কাছেই ছিলেন অবোধবিহারী, আর বসন্ত অর্থাৎ বিপিনকে সালোয়ার-কামিজ-দোপাট্টা পরিয়ে চাঁদনীচকের একটা বাড়ির দোতলায় মেয়েদের মধ্যে শোভাযাত্রা দেখার জন্য বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে একটা ব্যাগ, তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল বোমা। হার্ডিঞ্জ কাছে আসতে সবাই যখন ঝুঁকে পড়েছে তখন বসন্ত সবার অলক্ষ্যে বোমাটা ছুঁড়ে দেয়। বিকট শব্দে বোমা ফাটে। হার্ডিঞ্জ ভীষণভাবে আহত হন। মুহূর্তে বিশৃঙ্খলা। সেই সুযোগে আমরা তিনজনে যে যার পথে ছুটে পালালাম। আমি দেরাদুনে পরদিন বড়লাটের ওপর বোমা ফেলার নিন্দা করে সভা করেছিলাম। পুলিশ মাথা খুঁড়েও অপরাধী বার করতে পারলো না। সারা ভারত কেন, সারা বিশ্ব জুড়ে সাড়া পড়ে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত যেন কেঁপে উঠলো। একলক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো অপরাধীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তার জন্য। কিন্তু কেউ এলো না।

এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে ১৯১৩-র ১৭ই মে লাহোরের লরেন্স বাগে আর একটি বোমা ফাটলো। কিন্তু মরলো এক চাপরাসী, আসল লোকটি নয়। লোকটি হচ্ছে গর্ডন, সিলেটের কুখ্যাত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। সিলেটের অরুণাচল আশ্রমে পুলিশ ঐ লোকটির আদেশে জঘন্য অত্যাচার করেছিল, এমন কি মেয়েদেরও রেহাই দেয় নি। নিরীহ নরনারী ও সাধুসন্তদের ওপর অত্যাচারের জন্য পাঞ্জাবে বদলি হয়ে আসা এই গর্ডনকে মারার সংকল্প করা হয়েছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে বেঁচে গেল লোকটা।

বসন্তকে এই সময় দেশে পাঠাতে হয়। তার বাবা মৃত্যুশয্যায় শুনে। পুলিশ ততদিনে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে অপরাধী ধরবার জন্য। ১৯১৩-র নভেম্বরে কলকাতার রাজাবাজারে পুলিশ হঠাৎ একটা বোমার কারখানা আবিষ্কার করে ফেলে একটি নামের তালিকায়

আমীর চাঁদ, দীননাথ প্রভৃতির নাম পায় খানাতল্লাসীতে। ঐ দিননাথকে খুঁজে বের করে রাজসাক্ষী বানায়। আর এরই ফলে যে মামলা দাঁড় করায়, তার নাম দিল্লী-ষড়যন্ত্র মামলা। বসন্তের বাবা তখন মারা গেছেন। পিতৃশ্রাদ্ধ করছিল ছেলেটা, সে অবস্থায় 'পুলিস আসছে 'খবর পেয়ে পালিয়ে আসে কৃষ্ণনগরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। এখানেই এক আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশ তাকে ধরতে পারে। বসন্ত বিশ্বাস, অবোধবিহারী, আমীর চাঁদ ও বালমুকুন্দের ফাঁসি হয়েছে ১৯১৫ সালের ১২ই মে। বসন্ত ছিল নদিয়ার নীল বিদ্রোহের নেতা দিগম্বর বিশ্বাসের নাতি।

আগে তোমাকে বালমুকুন্দের কথা বলেছি। বলেছি তার স্ত্রী রাসরাখীর কথা। স্বামীর ফাঁসির কথা শোনার পর অন্নজল ত্যাগ করে পড়ে রইলেন। শত চেষ্টা করেও কেউ কিছু মুখে দিতে পারে নি। এই-ভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। একথাও আমাদের ভোলবার নয়।

হরদয়ালের কথা বলার আগে রডার পিস্তল সরানোর একটা কাহিনী আছে। আত্মোন্নতি সমিতির বিপিন গাঙ্গুলি, অনুকূল মুখার্জীর সঙ্গে শ্রীশ মিত্র বা হাবু মিত্তিরের নামও করতে হয়। কাজ করেন 'রডা কোম্পানী'তে। কলকাতার তখনকার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা 'রডা কোম্পানী'। খবর আনলো হাবু মিত্তির দু-এক দিনের মধ্যে আমদানী করা প্রচুর পিস্তল, যার নাম 'মসার পিস্তল', তা এসে পড়ছে কাষ্টম্‌স হাউসে। ঢাকার নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের কলকাতার প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীশচন্দ্র পাল। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াবার জন্য 'নরেন দত্ত' ছদ্মনামে চলাফেরা করছেন। এঁর সঙ্গী ছিলেন হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস। বাঘা যতীনের অনুমতি নিয়ে আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে মিশে এই পিস্তল সরাবার ষড়যন্ত্র করলেন এঁরা। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা তখন কলেজের ছাত্র, তিনি হরিদাসবাবুকে গাড়োয়ানের নিখুঁত সাজে সাজিয়েছিলেন। গরুর গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান গেল হাবু মিত্রের তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর মাল আনতে। অপর ছ-খানা গরুর

গাড়ির পিছনে হরিদাস চালিত গাড়িখানা এসে দাঁড়ালো। হাবু মিত্তির বুদ্ধি করে এই গাড়িতেই মসার পিস্তলের বাক্স ইত্যাদি তুলে দিলেন। মাল তোলা হলে গাড়ি চললো সারিসারি। ছ-খানা গাড়ি একসময় রডার গুদামের দিকে যাবে বলে বাঁক নিলো, আর সপ্তম গাড়িখানা অন্য দিকে চলে গেল। পাশে শ্রীশ পাল, খগেন দাস, এঁরা সব রয়েছেন। গাড়ি ঠিক পৌঁছে গেল মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর বাসায়। হাবু মিত্তিরকে সেইদিনই রংপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ডাঃ সুরেন বর্ধন হাবুর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে হরিদাস দত্ত ধরা পড়ে গেছেন। খবর এলো, সুরেন বর্ধনের বাড়ি সার্চ করতে পুলিশ আসছে। হাবু মিত্তিরকে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জাতি 'রাঙা'দের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এক বন্ধুর মারফৎ। কয়েকটি তরুণ 'রাঙা'ও সুরেন বর্ধনের নেতৃত্বে 'দেশের কাজ' করতো। আমি শুনেছি, এই হাবু মিত্তিরের খোঁজ আর কেউ পায়নি। হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ পাল, সুরেন বর্ধন সবাই আটক হলেন ১৯১৫ সালে। কিন্তু বেরিয়ে এসে ওঁরা আর হাবুর খোঁজ পান নি। এক রাঙা যুবকের সঙ্গে সে উধাও হয়ে গেছে।

বাঘা যতীনের নেতৃত্বে এবং আমার সহায়তায় সারা ভারত জুড়ে যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের পরিকল্পনা গড়ে ওঠে, তাতে এই মসার পিস্তল জোগাড় হওয়ায় আমাদের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। বালেশ্বরের যুদ্ধে যতীন্দ্র যে বীরত্ব দেখিয়ে গেছেন তার হাতিয়ার ছিল ঐ মসার পিস্তল। ও-গুলো পিস্তলও বলে, আবার দরকার পড়লে রাইফেলের মতোও ব্যবহার করা যায়।

এবার হরদয়ালের কথায় আবার আসি। ১৯১৪-এর ২৩শে মার্চ ইংরেজদের চাপে পড়ে আমেরিকার পুলিশ হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু জামিনে মুক্তি পেয়েই বন্ধুদের চেষ্টায় হরদয়াল পালিয়ে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখান থেকে বার্লিন। বরকতউল্লাও এসে গেছেন। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগ' জাঁকিয়ে উঠলো। হেরম্বও

তখন ওদের সঙ্গে আছে খবর পেয়েছি, জার্মাণীতে। আর আছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া তারকনাথ দাস, সুরেন কর, চম্পক রমন পিল্লাই, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, সুরেন বসু প্রভৃতি।

আর ওদিকে 'গদর'-এর ভার স্যানফ্রানসিস্কোতে এসে পড়লো রামচন্দ্রের ওপর। পণ্ডিত রামচন্দ্র। পেশোয়ারবাসী এই তরুণ যোগ্যতার সঙ্গেই 'গদর'-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

গদর-পার্টির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন লালা হরদয়াল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে ডাঃ পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব খানাখোজের নামও করতে হয়। হরদয়াল তাঁর পত্রিকা 'গদর' শুরু করবার চার বছর আগে ডাঃ খানাখোজে ও পণ্ডিত কাশীরাম 'ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগ' তৈরী করলেন। এটাই পরে 'গদরে' মিশে যায়। এই ডাঃ খানাখোজের অবদানও কম নয়। নাগপুরের ছেলে, তিলকের সঙ্গে দেখা করতে যান। তিলক বলেন, 'যুবক, তুমি বুদ্ধিমান, দেখেশুনে কর্মঠ বলেই মনে হচ্ছে। ভারতের বাইরে গিয়ে সামরিক বিদ্যা শিখে আসতে পারো? দেশের কাজ করতে গেলে আজ সেটাই দরকার সবার আগে।'

খানাখোজে তখন অনেক চেষ্টা চরিত্র করে জাপানে চলে আসেন। এ সব আমাদের আগের ঘটনা, নইলে আমার সঙ্গে দেখা হতো ঠিক। জাপানে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে চলে যান আমেরিকায়। যেমন তখন গিয়েছিলেন খগেন দাস, সুরেন্দ্রমোহন বসু ও তারকনাথ দাস। এসব হচ্ছে ১৯০৮ সালের কথা। আমেরিকায় মিলিটারী অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হলেও উচ্চতর বিদ্যাশেখার অনুমতি মিললো না। একটা ডিপ্লোমা পকেটে নিয়ে পোর্টল্যাণ্ডে চলে গেলেন। এখানেই সুফী অম্বাপ্রসাদের শিষ্য পণ্ডিত কাশীরামের সঙ্গে দেখা হয়। ঠিকাদারীর কাজ করে পণ্ডিতজী বেশ কিছু টাকা করেছেন। এঁর অর্থানুকূল্যেই ওঁদের ঐ 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' কাজ করতে থাকে। নানা জায়গায় এর শাখা ছড়িয়ে পড়ে। 'পীর খান' এই ছদ্মনামে খানাখোজে ঘুরে ঘুরে তাঁর কাজ করে বেড়াতেন বহু সময়। পরে ১৯১১-তে বিষ্ণু

গণেশ পিংলে যখন ওখানে যায়, খানাখোজের সঙ্গে তাঁর খুব সখ্যতা হয়েছিল। এই সঙ্গে আটওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুধীন্দ্রনাথ বসুর কথাও আমি শুনেছি পিংলের কাছ থেকে। হরদয়ালের আর এক বিশ্বস্ত সহকারী ছিল, কর্তার সিং। যাকে আমি পরে পেয়েছিলাম দেশে, আমাদের কাজে। হরদয়াল কলকাতার 'যুগান্তর'-এর আদর্শে ওখানে একটি 'যুগান্তর আশ্রমও তৈরি করেছিলেন। তবে হরদয়ালের 'গদর' পত্রিকা সেদিন যে কাজ করেছিল, তাও ভোলবার নয়। আন্দামানে বন্দীদের ওপর নানাণ অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে সে খবর ওঁদের কাণেও এসে পৌঁছতো। বন্দী সাভারকর সেলুলার জেলে ঘানি টানছে, এই রকম ছবির স্কেচও গদরে বেরিয়েছিল। জনসাধারণের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে এসব ছবির মূল্যও কম নয়।

বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে 'গদর' পার্টি তৎপর হয়ে ওঠে, একথা আগেই বলেছি। বার্লিন কমিটি বার্লিনে। জার্মাণ-সাহায্যে অস্ত্র আমদানীর পরিকল্পনার কথা নতুন করে আর বলার কিছু নেই। দরকার ছিল রাজ্যের ভিতরেও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। বাঘা যতীন চেষ্টা করে গেছে, আমরাও উত্তর ভারতে সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা করেছি ; এ-কাজে কাশীর শচীন সান্ন্যালেরও কম অবদান নেই। যুদ্ধ আরম্ভের সময় খানাখোজে বালুচিস্তানে 'স্বাধীন ভারত' সরকার-এর প্রতিষ্ঠা করেছিল, দু-বছর সে সরকার কার্যকরীও ছিল, কিন্তু পরে জেনারেল সাইক্স্ তা ধ্বংস করে দেয়।

১৯৯৪ সালে ক্যানাডা 'ইমিগ্রেশন আইন' করে শিখদের আসা বন্ধ করে দিলো। এমন কি শিখরা যে জাহাজে গিয়েছিল, সে জাহাজ ফিরিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। তারা সব হংকং-য়ে এসে হাজির। পাঞ্জাবে ফিরে যাবার টাকাও কাছে নেই। এইখানে গুরুদিৎ সিং-এর কথা বলতে হয়। আমেরিকায় কিছু দিন ঠিকাদারী করেছিলেন ভদ্রলোক। বললেন,—দাঁড়াও ভাই সব, আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে। আমি গুরু নানক নেভিগেশন কোম্পানী তৈরি

করতে চাই এই মুহূর্তে। এই কোম্পানীর নামে জাহাজ ভাড়া করে আমরা কানাডা যাবো, ব্যাঙ্কে জাহাজ বাবদ জমা দেবো এক লক্ষ ডলার।

গুরুদিৎ হংকং-এর ভারতীয়দের কাছ থেকে এবং যাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে টাকাটা জোগাড় করে সত্যিই জাহাজ ভাড়া করে আনলেন জাপান থেকে। জাহাজের নাম 'কোমাগাতা মারু।' নাম শুনেছো?

তোসিকো বললেন,—হ্যাঁ—হ্যাঁ-শুনেছি। কাগজে পড়েওছিলাম।

—তবে তো জানোই,—রাসবিহারী বললেন,—জাহাজভর্তি লোক হাজির হলো কানাডায় কিন্তু তাদের নামতে দেওয়া হলো না। ৩৭২ জন ভারতীয়,তার মধ্যে ২১ জন মুসলমান ছাড়া আর সব শিখ। কানাডায় তখন প্রচুর শিখ বাস করতো। তারা একযোগে হৈ-চৈ করতে লাগলো। ৬০ দিন জাহাজটি জলে পড়ে ছিল, খাবার নেই, জল নেই, সে এক বীভৎস অবস্থা। লোকগুলো মরীয়া হয়ে পুলিশকে রুখেছিল, কোনো পিস্তল-টিস্তল নয়, জ্বলন্ত কয়লা ছুঁড়ে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত, কোমাগাতা মারুকে ফিরে আসতে হলো। ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতার কাছে বজবজে এসে দাঁড়ালো কোমাগাতা মারু। ব্রিটিশ বাহিনী তৈরি ছিল, ওদের সবাইকে ট্রেনে চড়িয়ে কোনো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করবে এই ছিল মতলব। এটা বুঝতে পেরেই ট্রেনে উঠতে চায় নি। মিলিটারী গুলি চালালো। ১৮-জন শিখ মারা যায়, অনেকে পালিয়ে যায় জঙ্গলে। এতে ভারতের মানুষের মনে যে উত্তেজনা জাগবে, সেটা স্বাভাবিক।

এবার ভাই পরমানন্দের কথা। পরমানন্দ ১৯১৩-র শেষে ভারতে ফিরে আসেন। ফেরার পথে ইংল্যাণ্ড হয়ে প্যারিসে যান। দেখা হয় কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে, অজিত সিং এর সঙ্গে। অজিত সিং তখন হাসান খান নাম নিয়েছেন, পরিচয় দিচ্ছেন রাশিয়ার লোক বলে।

১৯১৪ সালে যখন আমি কাশীতে গা ঢাকা দিয়ে আছি, তখন

ভাই পরমানন্দ তাঁর এক বিশ্বস্ত সহকারীর মাধ্যমে আমাকে একটা চিঠি পাঠান, যা পড়ে আমি আবার উৎসাহিত, উদ্দীপিত হয়ে উঠি।

ওদিকে পণ্ডিত রামচন্দ্র 'গদর'কে উজ্জীবিত রাখছেন আমেরিকায়। 'গদর'-এ বিজ্ঞাপনের আকারে বার হলো,—

"চাই ঃ ভারতে গদর বা বিদ্রোহ করবার জন্য সাহসী সৈনিক।

বেতন ঃ মৃত্যু।

পুরস্কার ঃ শহীদত্ব।

পেন্‌সন ঃ স্বাধীনতা।

যুদ্ধক্ষেত্র ঃ ভারতবর্ষ।"

বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন ভারতে ফিরে গেল ১৯১৪-র নভেম্বরে। পিংলে নিজের বাড়ি পুণায় না গিয়ে সোজা গেল লাহোরে, ভাই পরমানন্দের কাছে। ভাইজী তাকে পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। আমার আরেকজন ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিল, বিনায়ক কাপালে। সবাই মিলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দীপনা জাগাচ্ছি। আমার মাথার দাম ত ইংরেজরা ধার্য করেছেই, এবার পিংলের পালা। ১৮ বছরের তরুণ কর্তার সিং-ও দেশে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় বিদ্রোহ বা বিপ্লবের দিন স্থির হয়। কৃপাল সিং বলে একটি গোয়েন্দা ঢুকে পড়েছিল আমাদের মধ্যে। দেখা মাত্রই নেতা হিসাবে আমি হুকুম দিয়েছিলাম,-'স্যুট্ হিম। কিন্তু আমার লোকেরা ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে না ফেলে দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দেয়। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় পুলিশকে। আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে যায়। ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। মীরাটে বোমাশুদ্ধ ধরা পড়ে পিংলে। কিছুদিন পরে ভাই পরমানন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়। কর্তার সিং প্রভৃতি আরও বহু লোক বন্দী হয়। ভাই পরমানন্দ, কর্তার সিং, পিংলে, জগৎ সিং প্রভৃতি ২৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার মধ্যে বড়লাট পরমানন্দ ও অন্য ৬ জনকে

মৃত্যুর বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেন। কিন্তু পিংলে, কর্তার সিং প্রভৃতি সাতজনের জীবন বাঁচে নি। এই সব কাণ্ডের পর আমাকে যখন জীবিত বা মৃত ধরবার জন্য পুলিশের লোক হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে আমি জাপান চলে আসি। কিন্তু দেশ-বিদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন কি নিভেছে ? না। ওরা যতো মারবে, আমরা তত বাঁচবো !

আরও একজনের কথা মনে পড়ছে শচীন বা পিংলে বা কর্তারের মতো আরও একজন তরুণকে পেয়েছিলাম, তার নাম প্রতাপ সিং। আমীর চাঁদ তাকে আমার হাতে দিয়েছিল। নবদ্বীপে যখন আমি কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিয়ে কাটাচ্ছিলাম, তখন এই প্রতাপ সিং এসে দেখা করে গিয়েছিল। ১৯১৫-তে দিল্লী কেসে ওকে ধরা হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ। পরে কী একটা অজুহাতে ওরা আবার ওকে ধরেছিল। পুলিশ কথা বার করবার জন্য মোটা টাকা ওকে দিতে চেয়েছিল। তার উত্তরে অগ্নিশিশু বলেছিল, 'আমি জানি আমার জন্য আমার মা কতো কাঁদছে ! তোমরা কি বলতে চাও, কারুর নাম বলে দিয়ে তাদের মায়ের চোখের জল ফেলাবো অমন করে ? আমার পক্ষে তা হবে মৃত্যু, আর এতে আমার মায়ের মুখে চূণকালি পড়বে !'

বেরিলি জেলে মাসের পর মাস ওর ওপর অত্যাচার চলে। জেলেই বেচারী মারা যায়, বয়স মাত্র বাইশ।

প্রতাপের কথায় সুশীল সেনের কথাও মনে আসে। সেই যে কিংসফোর্ড যাকে কশাইয়ের মতো বেত মারার হুকুম দিয়েছিল, সেই সুশীল সেন। আর এক অগ্নিশিশু। ১৯১৫-র কথা। এপ্রিলের ৩০শে আর মে-র ২রা তারিখে দুটো ডাকাতি হয়। তারপরেই দেখা যায় দুটি নৌকো করে কয়েকজন তরুণ আসছে, অনেক দূর থেকে। জায়গাটা নদীয়া জেলা। খলিলপুরে ওরা নেমে একটা পরিত্যক্ত গোয়ালঘরে রান্না চাপিয়েছে, এমন সময় একটা লোক ওদের দেখতে

পেয়ে নামধাম জিজ্ঞাসা করে। ওরা নাম বলেনি। লোকটা গিয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে তাড়া দিলে ওরা নৌকায় উঠে পড়ে। পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। নৌকো থেকে ওরাও গুলি ছুঁড়তে থাকে। নৌকোয় দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে একজনের পা ফস্কে যায়। সে গুলিটা লাগে সুশীলের গায়ে। সে জলে পড়ে যায়। বন্ধুরা তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে পালাতে থাকে। রাতের অন্ধকার নেমে আসছিল, ঝড়ও উঠছিল। সেই সুযোগে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়েও ওরা পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সুশীলের আঘাত গুরুতর। সে বললে, শীগগির আমার মাথাটা কেটে ফেলো। তাতে করে ওরা আমার শরীরটা পেলেও সনাক্ত করতে পারবে না।

বন্ধুরা ওর কথা মতো তা-ই করতে বাধ্য হয়েছিল। এই অগ্নিশিশুর কথাও কি ভোলবার ?

বেনারস কন্সপিরেসি কেসের সুশীল চন্দ্র লাহিড়ীর কথাও জানতে পারলাম সেদিন। বি-এস-সি পাশ, দারুণ ছেলে, কাশীর মদনপুরায় থাকতো। তার বাড়িতে যে কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল সার্চ করবার সময়, সেই কার্তুজ পাওয়া গেছে মৃত বিনায়ক রাও কাপ্‌লের দেহ থেকে। বিনায়ক দল ছাড়ায় কেউ তাকে মেরে থাকবে। কিন্তু সে দায় চড়ানো হলো সুশীলের ঘাড়ে। একেবারে মৃত্যুদণ্ড। ১৯১৮র অক্টোবরে তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

বেনারস কন্সপিরেসি কেসের মূলে রয়েছে দামোদর স্বরূপের বিশ্বাস-ঘাতকতা। সে না বলে দিলে শচীন সান্ন্যাল, গিরিজা বা মথুরা সিংকে কেউ ধরতে পারতো না। মথুরা সিং ডাক্তার ছিলেন। কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের অস্থায়ী সরকারের অধীনে তিনি চীপ মেডিকেল অফিসার হয়েছিলেন। ডাক্তারকে কাবুল জার্মাণী ঘুরে বেড়াতে হতো, 'গদর'-এর কাজ করতে হতো। রাশিয়ার জারের সঙ্গেও একবার দেখা করেছিলেন। ফেরার পথে তাসখন্দে বৃটিশের চরেরা তাকে ধরে ফেলে। ভারতে নিয়ে আসে সাভারকরের মতো বন্দী

করে। তাঁকে অবশ্য লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়। ১৭ই মার্চ হচ্ছে ডাক্তারের ফাঁসির তারিখ। শচীনের হয়েছে দ্বীপান্তর।

এইখানে বলে রাখা ভালো, দীর্ঘ আট বছর ধরে রাসবিহারী ভারতের কথা জেনেছেন, আর যা জেনেছেন, স্ত্রীকে তা বলেছেন তৎক্ষণাৎ। দুটি সন্তান হয়েছিল তাঁদের। বড়োটি ছেলে, মাসাহিদে,—আর ছোটটি মেয়ে,—তেতিকো। তারা দিদিমার কাছেই মানুষ হচ্ছিল। ছুটি ছাটাতে আসতো মা-বাবার কাছে। মা-বাবা তখনো এ-পাড়া ও পাড়া করে বাড়ি বদ্‌লে বদ্‌লে বেড়াচ্ছেন।

গদর পার্টির রামচন্দ্রের কথা স্ত্রীকে বলেছিলেন এই রকমই কোনো একটা সময়ে। সানফ্রান্সিস্কো-বিচার চলার সময়েই অপর এক বন্দী রামসিং লুকানো রিভালবার বার করে কোর্টের মধ্যেই ওঁকে গুলি করে। কোর্ট সার্জেন্টও নিশ্চেষ্ট ছিলো না, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে রাম সিংকে। দুজনেই মারা যান। একটা বিশ্রী ঘটনা। মতান্তরের পরিণাম। কারা কি ভাবে রাম সিং-কে উত্তেজিত করেছিল কে জানে, মুহূর্তে একটি মহাপ্রাণ বিনষ্ট হয়ে গেল।

আমাদের অস্ত্র আমদানীর চেষ্টার কথা বলেছি, ম্যাভারিক বা অ্যানি লার্সেন জাহাজের কথা বলেছি। আমাদের গৌরব বাঘা যতীনের বালেশ্বর যুদ্ধের কাহিনী বলেছি। এবার আরও কয়েকজনের কথা বলা দরকার, যাদের কাহিনী অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

ধরো নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। যার নতুন নাম হয়েছিল মানবেন্দ্র নাথ রায়, বা এম-এন রায়। সস্ত্রীক নিউ ইয়র্কে এসে দেখলেন, ভারতীয় বিপ্লবীদের অবস্থা সঙ্গীন। যুদ্ধে আমেরিকা ব্রিটিশ পক্ষে যোগ দেওয়ায় চাকা ঘুরে গেছে। আমেরিকার সরকারের চোখে তারা সবাই এখন জার্মাণীর স্পাই। হেরম্ব তখন রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে পড়াশুনা করছিল। কারণ, বার্লিন কমিটি তাকে সরিয়ে ডঃ চক্রবর্তীকে কমিটির প্রতিনিধি করেছে। চক্রবর্তীকে ধরলেন, তাঁকে বার্লিন পাঠানোর ব্যবস্থা করতে।

চক্রবর্তী বললেন,—কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

কী আর করবেন? পড়াশুনা করতে করতে কার্ল মার্ক্সের দিকে আকৃষ্ট হন রায়।

কিন্তু আমেরিকার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। কোর্ট তাঁকে জামিনে মুক্তি দিলো অবশ্য, কিন্তু তিনি সস্ত্রীক মেক্সিকো পালালেন। মেক্সিকোতে তখন বিপ্লব চলছে। এ-বিপ্লবের পূর্বপট হলো, পোর ফিরিও দিয়াজ পঁচিশ বছর একনায়কত্ব চালান। ১৯১১ সালে বিদ্রোহ হয়, এবার ক্ষমতায় আসেন ম্যাজারো। কিন্তু অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থে ঘা লাগায় তারা জেনারেল সুয়ের্তার নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লব আরম্ভ করে দিয়েছিল। গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য ম্যাদারো প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দেন। কিন্তু সুয়ের্তা দেশ-শাসনে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ফলে, ক্ষমতায় আসবার জন্য দুজন মাথা চাড়া দিলো, জাপাতা ও ভিল্লা। অন্যদিকে জেনারেল কারাঞ্জার অধিনায়কত্বে একদল রাজধানী দখল করে এক সরকার স্থাপন করে বসে আছে। এই রকম জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই রায় গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর নাম আমেরিকার কাগজগুলোর দৌলতে এঁদের কাছে অপরিচিত ছিল না। রায় কারাঞ্জারকে পরামর্শ দিতে লাগলেন। তাঁর পরামর্শে সুফলও পাওয়া গেল। রায় এঁরই সাহায্যে য়ুকাতান প্রদেশে যেতে পেরেছিলেন। ওখানকার একটা কাগজের প্রভাবশালী সম্পাদকের সঙ্গে রায়ের আলাপ হয়ে গেল। এঁদের মধ্যে বহু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয়রা ছিলেন। এইভাবে মেক্সিকোর রাজনীতিতে রায়ের সক্রিয় অংশ গ্রহণ। রায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন। সোশ্যলিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন। রাশিয়ায় তখন বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পুরাতন বলশেভিক মাইকেল বরোদিন। থাকতেন শিকাগোতে। বল্‌শেভিক বিপ্লব সফল হওয়াতে রাশিয়ায় ফিরে যান। রাশিয়া তাঁকেই ট্রেড ডেলিগেশনের জন্য পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের জারের হীরে গোপনে আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্য পাঠায়। দুটি সুটকেশের চামড়ার মধ্যে কৌশলে সেলাই

করে ঐ হীরেগুলি লুকিয়ে রেখে ছদ্মনামে জাল পাসপোর্টের সাহায্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে হল্যাণ্ড পৌঁছান। হল্যাণ্ড তখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পশ্চিম ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল। এঁদেরই সাহায্যে একটা ডাচ্ জাহাজে চড়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। সহযাত্রী এক অস্ট্রীয়ান সামরিক অফিসারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ভদ্রলোক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাইতি দ্বীপে পৌঁছতেই আমেরিকার পুলিশ তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করতে আসে। বোরোদিন পালান স্যুটকেশ দুটো ফেলে। অষ্ট্রীয়ান ভদ্রলোককে বলে যান, স্যুটকেশ দুটো যেন শিকাগোতে তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন।

বোরোদিন নিউইয়র্কে আসে। স্যুটকেশের হদিস নেই। পুলিশ আবার ধরে। জামীনে মুক্তি পেয়ে মেক্সিকেতে পালিয়ে আসেন। রায়কে খুঁজে বার করেন নিঃস্ব বরোদিন। নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হয় দুজনের মধ্যে। রায় অর্থের ব্যবস্থা করে দেন, তাতে ট্রেড ডেলিগেশনের কোনো অসুবিধা হলো না।

অনেক কাণ্ডের পর স্যুটকেশ দুটো অবশ্য পাওয়া যায়। হীরেও খোয়া যায় নি। খোয়া গেলে বরোদিনকে নিজের দেশের সরকারের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিতে হতো।

মানবেন্দ্র মেক্সিকো থেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন লোক মারফৎ। জাপানও একটা বৃহৎ শক্তি, তাকে ভারতীয় জাতীয়তার স্বার্থে না রাখলে চলবে কেন?

মানবেন্দ্র ১৯১৯-এর নভেম্বরে মেক্সিকো ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন বার্লিনে পৌঁছলেন, তখন বছরটা প্রায় শেষের দিকে গড়িয়ে এসেছে। এখান থেকে জাল পাসপোর্টে মস্কো। মস্কোর নেতারা ভেবে রেখেছিলেন, রায় হচ্ছে বরোদিনের বন্ধু, একসঙ্গে মেক্সিকোতে কাজ করেছেন। বরোদিনকে যদি আফগানিস্তানে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়, তাহলে সেখান থেকে ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলতে রায়ের পক্ষে সুবিধা

হবে। লেলিণ দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য 'পরাধীন জাতি ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রাম'—শিরোনামায় যে থিসিস লিখেছেন, লেলিনের ইচ্ছা মতো রায় আসা মাত্রই তাঁকে দেওয়া হলো। অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ। পরদিন লেলিণের সঙ্গে রায়ের সাক্ষাৎ। যা শুনেছি তাই তোমাকে বলছি। রায়কে দেখে লেলিণ অবাক হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'এতো অল্প বয়সী! আমি ভেবেছিলাম প্রাচ্য দেশ থেকে শুভ্র শ্মশ্রু-মণ্ডিত কোনো জ্ঞানী বৃদ্ধ আসছেন!'

কিন্তু যাক এখন রায়ের কথা। আগেকার দিনের কথা একটু বলে নিই। কোমাগাতা মারুর গুরুদিৎ সিং পালিয়ে ছিলেন বজবজ থেকে, পুলিশ ধরতে পারে নি। ভদ্রলোক পালিয়ে পালিয়ে বহুদিন বেড়াবার পর ১৯১৮-তে বোম্বাই গিয়ে একটা জাহাজ নির্ম্মাণ কোম্পানীর ম্যানেজার হয়েছিলেন, অবশ্য ছদ্মনামে। ১৯২১-এ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে সব কথা বলেন। তাঁর উপদেশে তিনি সরকারের কাছে ধরা দিয়েছেন বলে শুনেছি।

তারকনাথ দাসের কথা বলেছি। ১৯০৫ সালে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পালিয়ে শেষ পর্যন্ত এই টোকিওতে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতের মুক্তি সাধনায় রত থাকার জন্য ব্রিটিশ রাজদূত ধরবার চেষ্টা করতে থাকেন, যেমন আমাকে আজও করছেন। ফলে তারকবাবু আমেরিকায় চলে যান। ১৯০৬ সালের কথা, 'ভ্যাঙ্কবারে 'ইন্টার-প্রেটার'এর কাজ করতেন। পলিটিক্যাল সায়েন্স ও ইকনমিক্সে বি-এ পাশ করে পরের বছর এম-এ পাশ করেন। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ-ডি-র ফেলোশিপ জোগাড় করেন, কিন্তু বৈপ্লবিক রাজনীতি তাঁর পড়াশোনার ক্ষতি করতে লাগলো। তবুও ১৯১৪-র ৫ই জানুয়ারি তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।

এইবার আমাদের অবনী মুখোপাধ্যায়ের কথা শোনো। সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে, একথা তো জেনেছিলে। সিঙ্গাপুর দুর্গে ভূপতি মজুমদার ও তাকে রাখা হয়। ধনী শিবপ্রসাদ গুপ্তও তখন ওখানে সন্দেহক্রমে

আটক। তাঁরই অর্থানুকুল্যে কোনো কোনো রক্ষীকে হাত করা হয়েছিল বলে মনে হয়। কোর্টমার্শালে কিন্তু অবনীর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। এই দণ্ড মাথায় নিয়েও সে মুষড়ে না পড়ে পালাবার চেষ্টা করে। রক্ষীদের হাত করিয়ে একদিন সে সমুদ্র-স্নান করার সুযোগ পেয়েছিল। সবাই স্নান করছে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে সাঁতার দিতে দিতে অবনী সরে পড়ে। পাহারাদাররা প্রথমে টের পায়নি। যখন টের পেলো, তখন অবনী ওদের নাগালের বাইরে। সমুদ্রতীরে উঠে গাছপালার আড়ালে আড়ালে পালিয়ে ছিল। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, মশার কামড়, পোকার উৎপাত, এসব সহ্য করে বনের মধ্যে সে কদিন লুকিয়ে থাকে। পরে, অসহ্য হয়ে বেরিয়ে আসে। দেশী নৌকো দেখে চিৎকার করে ডাকে বটে, কিন্তু ক্লান্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, পড়ে যায়। মাঝি দয়া করে ওকে তুলে নেয়। কিছু খাবারও ওকে দেয়। এই মাঝি যেন ভগবানের দূত হয়ে এসেছিল। নইলে সে বাঁচতো না। মাঝি নৌকো বেয়ে এক গ্রামে যায়। সেখানে মাঝিই বলে কয়ে এক বড়লোকের বাড়িতে চাকরের কাজ জুটিয়ে দেয়। অবনী কিছুদিন থাকবার পর মতলব আঁটতে থাকে। তারপরে জাভা হয়ে বিদেশে চলে যায়।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের কথা আগে বলেছি। তিনিও দেখা করেন ১৯১৯ সালের ৭ই মে। বার্লিন কমিটি আর গদর পার্টির মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল তা-ও আগে বলেছি। বার্লিন কমিটি বাগদাদ, সুয়েজখাল, পারস্য ও আফগানিস্তানেও চারটি বিপ্লবী মিশন পাঠিয়েছিল। ১৯১৫-র গোড়াতেই তারকনাথ দাস, ফেরসাম্প ও বরকৎউল্লার নেতৃত্বে একটি দলকে ইস্তাম্বুলে পাঠিয়েছিল কমিটি। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যারা তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদের নিয়ে একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই রকম মিশন বাগদাদেও পাঠানো হয়েছিল ডাঃ মনসুরের নেতৃত্বে। ১৯১৬ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও ইস্তাম্বুলে যায়, সঙ্গে

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বীরেন দাশগুপ্ত সুয়েজখাল মিশনেও যান, তারকনাথ দাস, প্রতিবাদী আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে। পারস্য মিশনে গিয়েছিলেন খানাখোজে, ফেরসাম্প, সুফী অম্বাপ্রসাদ, ঋষিকেশ লাট্টা ও ও প্রমথনাথ দত্ত, যিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন দাউদ আলি। এইসব মিশনে বিপদও ছিল কম নয়। খানাখোজে, দাউদ আলি দত্ত, ঋষিকেশ লাট্টা প্রভৃতি ছাড়া অনেকেই ইংরেজের হাত ধরা পড়ে প্রাণ দিয়েছিলেন সেদিন। কাবুলের অস্থায়ী সরকারের কথা ত আগেই বলেছি। লেলিণের সঙ্গে ভারতীয় যাঁরা দেখা করেন, তাঁদের মধ্যে জব্বার খৈরী ও সাত্তার খৈরীর নাম পাওয়া যায়, এঁরা দুই ভাই। এঁরা ছিলেন দিল্লীর বাসিন্দা, দুই ভাই মিলে ইস্তাম্বুলে ভারতীয় মোসলেম কমিটি স্থাপিত করেছিলেন।

লেলিণের দেশে ১৯১৯ এ আরেক বিপ্লবী উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন রহমৎ করিম জাকারিয়া। পাঞ্জাবের লোক, ১৮৯৪ সালে জন্ম। ওয়েবাতুল্লা সিন্ধির সঙ্গে কাবুলে বন্দী ছিলেন যে ভারতীয় ছাত্ররা ইনি তার মধ্যে একজন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের চেষ্টায় এঁরা মুক্তি পান। মহেন্দ্রপ্রতাপের কাবুলস্থিত অস্থায়ী সরকারের দপ্তরহীন মন্ত্রী ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী, আর প্রচার মন্ত্রী ছিলেন এই জাকারিয়া।

কিন্তু এঁদের কথা বলবার আগে ভারতের এক শোচনীয় ঘটনার কথা বলে নিই। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছো, তবু বলি। ১৯১৯ সাল। আমি জালিওয়ানাবাগের পাশবিক হত্যালীলার কথা বলছি। পাঞ্জাবের বর্বর লাট সাহেব মাইকেল ও-ডায়ার জেনারেল ও-ডায়ারের হাতে রাজ্যের শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। জালিওয়ানাবাগে হাজার হাজার অসহায় নরনারীকে গুলি করে মেরে ফেলে রক্তগঙ্গা বইয়েই ক্ষান্ত হলো না ওরা, মার্শাল ল জারি করে বিভীষিকার সৃষ্টি করে বসলো। শহরের আলো নেভানো, দারুণ গরমের দিনে, খাবার জলটুকুও বন্ধ করে দেওয়া হলো। যাকে ইচ্ছে তাকে ঘরের মধ্য

থেকে বাইরে টেনে এনে বেত মারতে লাগলো। গণ্যমাণ্য লোকদের রাস্তায় বুকে হাঁটিয়ে বা ওঠ্-বোস করিয়ে তৃপ্তি পেতে লাগলো পিশাচ-গুলো। গোরা সৈন্যরা মেতে উঠলো যথেচ্ছ নারী ধর্ষণে।

অসীম ঘৃণায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইটহুড' ত্যাগ করলেন। শঙ্কর নায়ার বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন। তাঁর একখানা বইয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে ও-ডায়ার মোটা টাকার জরিমানার রায় বার করালেন। সে টাকা তুলে দিলেন গান্ধীজী। বস্তুতঃ এই সময় গান্ধীজীর ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এইবার একজন বিদেশিনীর নাম শোনো। আমেরিকায় তারকনাথ দাস, শৈলেন ঘোষ, এঁরা যে কাজ করে যাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হলেন একটি মহিলা, অ্যাগনেস্ স্মেড্‌লি। তাঁর ভারতপ্রেম, ধৈর্য, সাহস ও আত্মত্যাগ তাঁকে সহজেই বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্ম করে দিলো। ১৯১৭-য় আমেরিকা যুদ্ধে নামলে এঁদের কর্ম্মধারায় যে বিপর্যয় নেমে আসে, তার সঙ্গে অংশ নিতে স্মেড্‌লি পিছিয়ে যান নি। শৈলেন ঘোষ, তারকনাথ দাস প্রভৃতির সঙ্গে স্মেড্‌লিও কারাবরণ করেন এবং দু-বছর পরে ১৯১৯ সালে মুক্তি পান। স্মেড্‌লি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ণ রিভিউ'তেও লিখতেন। সুরেন কর, তারকনাথ, শৈলেন ঘোষ, এঁদের সঙ্গে মিশে স্মেড্‌লি 'ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া' সংস্থা ও এর একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র বার করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত নেতা ডি-ভ্যালেরা তখন আমেরিকায় প্রবাস জীবন যাপন করছেন। তাঁর সংস্পর্শেও এঁরা আসেন এ সময়। পত্রিকার নাম হয়, 'গেলিক আমেরিকান।'

১৯২০ সালে বার্লিনে দেখা যায় স্মেড্‌লিকে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২১ সালে স্মেড্‌লি চলে যান মস্কোতে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁদের সঙ্গে থেকেই তিনি ভারতের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

রাসবিহারী তোসিকোকে এইভাবে আট বছর ধরে দেশের কাহিনী বলে যান। ইতিমধ্যে তোসিকো বাংলা শিখেছেন, একটু আধটু পড়তেও পারেন। কিন্তু সে কথা বিস্তৃতভাবে বলার দরকার নেই। রাসবিহারী একদিন একখানা চটি ইংরেজী বই নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমাকে মাহাত্মা গান্ধীর কথা বলতাম না? এই দেখ, তাঁর একখানা জীবনী পেয়েছি। লণ্ডন ইণ্ডিয়ান ক্রনিক্‌লে বেবিয়েছিল ১৯০৯ সালে। বই হয়েও বেরিয়েছে অনেকদিন, আমার হাতে এসে পড়লো আজ। লেখকের নাম জোসেফ জে-ডোক। এ-থেকে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার কাজকর্মের খবর পাওয়া যায়।

গান্ধীজীর জন্ম সালটা এই ফাঁকে বলে নিই। ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। পোরবন্দরে জন্ম। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয় কস্তুরবাদেবীর সঙ্গে। আমেদাবাদ থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ভবনগরে গ্রাজুয়েট হতে গেলেন। কলেজে প্রথম ছুটিতে রাজকোটে বেড়াতে গিয়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ভাবান্তর ঘটলো। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসতে চাইলেন। ইতিপূর্বে পিতার মৃত্যু হয়েছে। অতি কষ্টে মায়ের সম্মতি আদায় করে বিলেত চলে গেলেন। ব্যারিস্টার হয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন মা মারা গেছে। বছর দেড়েক ধরে তিনি রজেকোটের প্র্যাক্‌টিশ, বোম্বাইয়ের হাইকোর্টে ল-পড়া ইত্যাদিতে কাটলো। এমন সময় তাঁর দাদার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার একটা প্রস্তাব এলো। পোরবন্দরের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রিটোরিয়াতে শাখা অফিস ছিল। সেই সংক্রান্ত একটা মামলা, যাতে ওখানকার বহু ভারতীয় জড়িত, তার ভার নিতে হবে ব্যারিস্টার হিসাবে। একেই বলে ভবিতব্য, নইলে তিনি ওখানকার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বেন কেন? ওখানকার ভারতীয়দের মানুষের মধ্যেই গণ্য করতো না ইয়োরোপীয়ানরা, রেলগাড়িতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্বেও কেন একাসনে বসেছেন, এই কারণে কিল-চড়-ঘুষি লাথি তিনি নিজেও খেয়েছেন। তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। দ্বিতীয়বার

তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় গেলেন স্ত্রীপুত্র নিয়ে, বসবাস করতে। অ্যাটর্নির অফিসও খুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল কাজ আরম্ভ হলো তখন, যখন তিনি ওখানকার ভারতীয়দের জড়ো করে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। আমাদের চিন্তার বিপরীত, কিন্তু গোপাল কৃষ্ণ গোখলের মধ্যে যে সুর ধ্বনিত হতো, গান্ধীজীর মধ্যে তা শুধু স্পষ্টই হয়ে উঠলো না, কার্যক্ষেত্রে মূর্ত হয়ে উঠলো। ১৯২১ সালে তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা ভারত জুড়ে একটা উন্মাদনার বন্যা সৃষ্টি করলো।

আর একটি চিত্তজয়ী নামও তোমাকে এবার বলছি। অবশ্য আগেও বলেছি অনেকবার। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির মামলায় যাঁর ঐতিহাসিক সওয়াল যাঁকে রাতারাতি জনচিত্তে স্থিরস্থায়ী আসন পেতে দিয়েছে, আমি সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কথাই বলছি। ভুবনমোহন দাশের কথা আগে বলেছি, ইনি তাঁর ছেলে। চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়েছিল নওগাঁর বিজলি এস্টেটের দেওয়ান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বরদানাথ হালদার (মুখোপাধ্যায়)-এর মেয়ে বাসন্তীদেবীর সঙ্গে। দেশবন্ধুর সওয়ালে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করার পর দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিবেদিতার। ওঁর কোটের কলারে একটা গোলাপফুল পরিয়ে দিতে দিতে নিবেদিতা বলেছিলেন,—তোমাকে মহৎ বলে জানতাম, কিন্তু তুমি এতো মহৎ!

দেশবন্ধুর স্বাদেশিকতার উত্থান এই সওয়াল থেকে বলেই অনেকে জানেন, কিন্তু তা নয়, পি-মিত্রের অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সরলাদেবীর বীরাষ্টমী প্রভৃতি ব্যাপারের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। পরে জাতীয় বিদ্যালয় যখন গঠিত হলো, তার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন গভীরভাবে। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' এর কার্যকরী সভার সদস্য ছিলেন চিত্তরঞ্জন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এঁদের হাতে এক লক্ষ করে টাকা তুলে দিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক,

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর মইমনসিংহের রাজা সূর্যকান্ত রায়। সূর্যকান্ত কলকাতার যাদবপুরে কলেজ গড়ে তোলার জন্য দিয়েছিলেন বিস্তীর্ণ জমি। কলকাতা ও রংপুরে স্থাপিত হলো জাতীয় কলেজ। কলকাতার অধ্যক্ষ হয়ে এলেন শ্রীঅরবিন্দ। এসব কথা আগেই বলা হয়ে গেছে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ যেমন একটি ঘটনা, তেমনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনও একটি বিশেষ ঘটনা। এই সূত্রে গান্ধীজীর নাম যেমন সর্বাগ্রে আসে, তেমনি চিত্তরঞ্জনের কথাও আসে। ব্যারিস্টার হিসাবে যখন তিনি প্রচুর উপার্জন করছেন, সে সময় অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে, ১৯১৭ সালের কথা ; চট্টগ্রাম থেকে ডাক এলো রাজবন্দীদের। বেশ কয়েকজন রাজবন্দীকে কুতুবদিয়া বলে এক নির্জন ছোট দ্বীপে রেখেছিল। সেখানে অসীম দুর্দশায় টিকতে না পেরে তারা চট্টগ্রামে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবার করবে বলে চলে আসে। কিন্তু পুলিশ তাদের পলাতক বলে ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করে। এঁদের হয়ে কোর্টে লড়বার জন্যই দেশবন্ধুর কাছে আহ্বান যায়। ব্যারিস্টার হিসাবে এক পয়সা পাবেন না জেনেও তিনি ছুটে যান ওদের কাছে। কলকাতায় তখন তিনি দৈনিক হাজার হাজার টাকা রোজগার করছেন। সেই রোজগারে ক্ষতি করেও তিনি ছুটলেন চট্টগ্রামে। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যিনি জে-এম সেনগুপ্ত নামে বেশি পরিচিত। আর তাঁকে সহকারিতা করেছিলেন উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্তরঞ্জনের তীক্ষ্ণ সওয়ালের ফলেই বন্দীদের মাত্র দু-মাসের জেল হয়, তা-ও বিচারকের জেদে, যুক্তিতে নয়। এই চিত্তরঞ্জন নাগপুর কংগ্রেসে দীক্ষা নিলেন অসহযোগ ব্রতে, ঘোষণা করলেন,—আইন ব্যবসা ছেড়ে দেবেন। ডুমরাওন আপিল ও মিউনিসন বোর্ডের মামলা দুটি চলছিল, এ-দুটি শেষ হলেই আর তিনি কোর্টের দিকে যাবেন না, পুরোপুরি দেশসেবায় নামবেন। এই ১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু বিলেতে পড়ছিলেন। তিনি একখানা

চিঠি লিখলেন চিত্তরঞ্জনকে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, “আমার পিতা জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন। দাদাদের একজন শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। পাঁচ বছর পূর্বে আমি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুটি বছর নষ্ট হবার পর কলেজে পড়বার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং অনার্সের প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে এসেছি। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি।

এই সুভাষচন্দ্রের জন্ম সালের কথাটাও বলে রাখি,—১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি। জন্মস্থান,—কটক। তিনি আই-সি-এস হয়েও আই-সি-এস এর চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। সুভাষচন্দ্রের কথা শেষ হবার নয়, এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কথাটাও বলে নেওয়া দরকার।

যতীন্দ্রমোহনের বাবার নাম যাত্রামোহন। চট্টগ্রামে ওকালতি করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন, বরমা বলে একটি গ্রামের জমিদারও হয়েছিলেন। যতীন্দ্র হচ্ছেন তাঁর তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় পুত্র। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম। যাত্রামোহন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য হয়েছিলেন ১৮৯৮ সালে। যতীন্দ্রমোহনের জন্ম ১৮৮৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধূলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তেরো বছর বয়সে কলকাতার ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে এসে ভর্তি হলেও এন্‌ট্রান্স পাশ করেন হেয়ার স্কুল থেকে। কলেজের শিক্ষা প্রেসিডেন্সিতে। এরপর বিলেত। সবার ইচ্ছা ছিল তিনি আই-সি-এস পরীক্ষা দেন, কিন্তু পিতা যাত্রামোহন বেঁকে বসলেন,—না, সরকারী চাকরির গোলামী আমার যতীন করবে না।

যতীন্দ্রমোহন তাই ক্যাম্ব্রিজে পড়তে লাগলেন আইন। এই সময় তাঁর বিলাতের বন্ধু ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। ক্যাম্ব্রিজে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয় ১৯০৭ সালে হ্যারো থেকে তখন ক্যাম্ব্রিজে এসেছেন জওহরলাল।

যাই হোক, যতীন্দ্রমোহন ১৯০৯ সালে বি-এ এবং এল-এল-বি ডিগ্রি নিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। সঙ্গে ইংরেজ স্ত্রী, শ্রীমতী নেলী গ্রে। চট্টগ্রামেই তাঁদের বড়ো ছেলে শিশির জন্মগ্রহণ করে ১৯১০ সালে। বছরখানেক দেশে কাটিয়ে যতীন্দ্রমোহন সপরিবারে কলকাতায় এলেন হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করবার জন্য।

কলকাতা কংগ্রেসে অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করা নিয়ে মডারেট আর এক্সট্রিমিস্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন বৃদ্ধ বয়সে যাত্রামোহন সেনগুপ্ত। ঐ সময় চট্টগ্রামে তাঁর এক মেয়ে নলিনী মারা গেছে, আর বিলেতে মারা গেছে তাঁর এক ছেলে, যতীন্দ্রমোহনের পরের পরের ভাই নীরেন্দ্রমোহন। নীরেন্দ্রও বিয়ে করেছিল এক ইংরেজ দুহিতাকে, এভা তার নাম। এদের একটি মেয়েও ছিল, আইলীন। যাত্রামোহনের বড়ো ছেলে মনোমোহন বহুদিন আগেই মারা গিয়েছিল, তাঁর বিধবা স্ত্রীই অতো বড়ো পরিবারের কর্ত্রী, সকলের 'বড়োবৌদি'। যতীন্দ্রমোহনের দিদিও পুকুরে জলে ডুবে মারা যায় ১৮ বছর বয়সে। এখন তাহলে বড়ো ছেলে বলতে ঐ যতীন্দ্রমোহনই। আর সব থেকে ছোট হচ্ছে রণেন্দ্রমোহন।

যাই হোক, ঐ শোক আর বুড়ো বয়সে সহ্য হলো না, ঐ কন্‌ফারেন্সের কয়েকমাস পরেই তিনি মারা গেলেন। যতীন্দ্রমোহনের ঘাড়ে এসে পড়লো সমস্ত দায়িত্ব। কিন্তু পরিবারের থেকে দেশের দায়িত্ব কি কম?

১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেন আমাদের

লালাজী, লালা লাজপৎ রায়। যতীন্দ্রমোহন এই অধিবেশনে অতিরিক্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ করলেন।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদ দেশ থেকে মুছে যায়নি, ১৯১৭ সালে সিরাজগঞ্জের আটঘরিয়া থানার এক গণ্ডগ্রামে গা-ঢাকা-দেওয়া অনুশীলনের কর্মী গোবিন্দ কর আর নিকুঞ্জ পালের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। দু'জনেই গুরুতর আহত হয়েছিলেন। বিচারে নিকুঞ্জর বারো বছর আর গোবিন্দ করের সাত বছরের জেল হয়। এইরকম খণ্ডযুদ্ধ গৌহাটিতেও হয়েছিল ১৯১৮ সালে। গৌহাটির আটগাঁও ও ফাঁসিবাজারে দুটি গোপন আস্তানা ছিল বিপ্লবীদের। প্রথম আস্তানায় রয়েছেন 'দলন্দা হাউস' থেকে পালিয়ে আসা বিপ্লবী নলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত। আর আছেন 'অনুশীলন'-এর প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায় এবং 'যুগান্তর'-এর অমর চ্যাটার্জী। আর দ্বিতীয় আস্তানায় ছিলেন নলিনী বাগচী, তারাপ্রসন্ন দে, আর নরেন বন্দোপাধ্যায়। এদের সঙ্গে সতীশ চক্রবর্তী বা পাকড়াশিও ছিলেন। অমর চ্যাটার্জী সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দশাসই মানুষ, তাঁকে পাদ্রীর ছদ্মবেশে বুকে ক্রশ ঝুলিয়ে থাকতে হয়েছিল। অবশ্য ছদ্মবেশ ছিল সকলেরই।

রাত আড়াইটার সময় লালমুখো পুলিশ ইন্সপেক্টরের সদলবলে আবির্ভাব, প্রথম আস্তানায়। সাহেব চিৎকার করে বলে, open please!

নলিনীকান্ত ঘোষ উত্তরে বলে ওঠেন,—It is open. Enter and be killed.

শুরু হয় উভয়পক্ষে গুলিবর্ষণ। লালমুখো ইন্সপেক্টর সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, দলবল নিয়ে সরে পড়লেন। কিন্তু আস্তানায় থাকাও আর নিরাপদ নয়, বিপ্লবীরা পালিয়ে গেলেন নবগ্রহ পাহাড়ে, শুধু পাদ্রীবেশী অমর চ্যাটার্জীকে গৌহাটির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আর তারপরে যথারীতি পুলিশ এসে বিপুল সংখ্যায় ঘেরাও

করলো পাহাড়। সতীশ পাকড়াশীও আগে বেরিয়ে অন্যদিকে সরে পড়েছে। শুরু হলো লড়াই। নলিনী ঘোষ বন্ধুদের বললেন,—তোমরা পালাও, আমি একা ওদের ঠেকাবো।

কিন্তু কতক্ষণ? সবাই আহত হলো, ধরা পড়লো। মণীন্দ্র রায় শ্মশানের ধারে বসে হাঁপাচ্ছিল, তাকেও ধরে আনলো পুলিশ। শুধু ধরতে পারেনি নলিনী বাগচী আর প্রবোধ দাশগুপ্তকে। নলিনী বাগচী খোট্টা সেজে মজঃফরপুর হয়ে কলকাতায় আসে। প্রবোধ তার আগেই ধরা পড়ে যায়। নলিনী ক্লান্ত, বিপর্যস্ত দেহে কলকাতার মনুমেণ্টের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সতীশ পাকড়াশি খবরটা পেয়ে ছুটে গিয়ে ওঁকে নিয়ে আসে নিজের বাসায়। কঠিন বসন্ত রোগ। অথচ ডাক্তার ডাকার উপায় নেই, এমন কি বাড়িওয়ালা জানতে পারলে বার করে দেবে। বহরমপুর কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র এই নলিনী। আই-এস্-সি পাশ করে কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। সতীশ পাকড়াশি শেষ পর্যন্ত কার্বলিক তেল কিনে এনে নলিনীর সর্বাঙ্গে মাখাতো। যাকে বলে আসুরিক চিকিৎসা। দিন দশেক পরে চোখ মেলে চাইলো নলিনী, তারপরে ধীরে ধীরে ভালো হয়ে আসতে লাগলো। ওদিকে পূর্ব বাংলার নানান্ জায়গা ঘুরে তারিণী মজুমদার কলকাতায় এসেছে। দিন দুয়েক পরে সতীশ পাকড়াশি রাস্তার মধ্যে অতর্কিতে ধরা পড়ে। অর্থাৎ তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে। ১৯১৮-র ফেব্রুয়ারি মাস সেটা। বেচারীর আর নলিনীর কাছে ফেরা হলো না। নলিনী ভালো হয়ে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জুন মাসে ঢাকার ফল্‌তাবাজারের এক বাসায় পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়। তারিণী মজুমদার কুমিল্লার লোক। মজা হচ্ছে এই, পুলিশ "বিপ্লবী আছে বাড়িতে লুকিয়ে,"—এই খবর পেয়েছে, কিন্তু ওদের পরিচয় জানে না। তারিণী মারা যায় প্রথম। পুলিশ যখন ঘরে ঢোকে, ঘর তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে গুলি-বিদ্ধ হয়ে নলিনী বাগচীও প'ড়ে আছে। পুলিশ সেই অবস্থায় তার

পরিচয় জানবার জন্য উত্যক্ত করতে থাকে। নলিনী শুধু বলে,—'বিরক্ত করো না, শান্তিতে মরতে দাও।'

নলিনীর কথায় নগেন্দ্রনাথ দত্ত বা গিরিজার কথা মনে হয়। শ্রীহট্টের ছেলে এই গিরিজাই আমাদের কাশীকেন্দ্রের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ রক্ষা করতো। ১৯১৫ সালের পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয় আর চারদিকে ধরপাকড় চলে, তখন আমি জাপানে চলে আসি, আর শচীন সান্যাল, বিনায়ক রাও কাপলে, নরেন ব্যানার্জী, গোপেন রায়, রমেশ আচার্য, গিরিজা (নগেন্দ্রনাথ দত্ত), অমৃত সরকার, এরা বাংলায় গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নরেন্দ্র যায় আসামে, শচীন ঢাকায়। পুলিশ কাশীর কিছু কর্মীকে ধরে অত্যাচার করে একজনের স্বীকারোক্তি বার করে। পুলিশ খাড়া করে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা। শচীন এ খবর ঢাকায় বসে পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে কাশীতে, কর্মীদের মনোবল ফেরাতে। এতে কাজ হয়, কিন্তু পুলিশ কোনো সূত্র থেকে খোঁজ পেয়ে শচীনকে ধরে ফেলে। শচীনের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অন্যদের পাঁচ বছর, তিন বছর ইত্যাদি। ঢাকার নেতা পুলিন দাস, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বা মহারাজও আটক ছিলেন দীর্ঘ মেয়াদে। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও আরেকটি নাম। কুমিল্লায় পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে এসে গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। পুলিশ তাঁকে পাথুরিয়া-ঘাটায় ধরে ১৯১৭ সালে। এঁর ওপর পুলিশ যা অত্যাচার করেছিল, তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমাদের ঐ নগেন দত্ত বা গিরিজা মারা যায় আগ্রা জেলে বিনা চিকিৎসায়।

অবশ্য মণ্টেগু-চেমস্‌-ফোর্ড-শাসন সংস্কার জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেতে লাগলেন। ১৯২১ সালের মধ্যেই তাঁরা জেলের বাইরে এসে দেখলেন, দেশে অন্য এক জোয়ার, সহিংস নয়, অহিংস প্রতিরোধ।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কথা আবার বলি। বর্মা অয়েল কোম্পানীর চট্টগ্রামের এজেন্ট ছিল বুলক ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী।

এদের শ্রমিকরা অতি দুর্দশার মধ্যে বাস করতো। প্রতিকার করবার জন্য যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে ইউনিয়ন গড়া হয়। এই ইউনিয়ন যে আন্দোলন করে, তাতে কোম্পানীর একজন কেরাণী বিনোদবাবু যোগদান করলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। আর যায় কোথায়! যেন বারুদের স্তূপে আগুন। ধর্মঘট ও হরতাল, ১৯২১-র মে মাসে। একেবারে পুরোপুরি সফল। কোম্পানী নতি স্বীকার করে। এই জয়ে যতীন্দ্রমোহনের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীহট্ট বা কাছাকাছি অঞ্চলের চা-বাগানের কুলিদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। কংগ্রেস-কর্মীরা তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে কাজ করতে থাকে। মালিক পক্ষ বাধা দেয়। ফলে কুলিরা ক্ষেপে যায়। ১৯২১-র ঐ মে মাসেই বিরাট ও ব্যাপক হরতাল হয় চা-বাগানগুলিতে। কুলিরা দেশে ফেরবার জন্য রওনা দেয়। বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কুলিদের ধরে চাঁদপুর ঘাটে এনে রাখা হয়। রাতের অন্ধকারে তারা যখন ঘুমুচ্ছে, তখন তাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। বিদ্যুতের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম থেকে তিনসুকিয়া পর্যন্ত। কুলিদের প্রতি সমবেদনা জানাতে রেলের কর্মীরাও ধর্মঘট করে বসে। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে স্টীমার-খালাসীদের মধ্যেও। ফলে, সব কিছু অচল। চট্টগ্রামেও হরতাল। যতীন্দ্রমোহনের চেষ্টায় সব-কিছু ছিলো শান্তিপূর্ণ। এই ধর্মঘট চলে বহুদিন, আর গরীব ধর্মঘটীদের খাওয়াতে গিয়ে যতীন্দ্র-মোহন রীতিমত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ৪১ দিন চলার পর যতীন্দ্র-মোহন মিছিলের ডাক দেন এবং ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছ-সাত হাজার লোকের মিছিল চলতে থাকে, পুরোভাগে যতীন্দ্রমোহন ও মহিমচন্দ্র দাস। বলা বাহুল্য, এঁরা দুজনও গ্রেপ্তার হলেন, সঙ্গে আরও ১৫ জন। যতীন্দ্রমোহন জামীন চাইলেন না, তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। জেল ফটকে হাজার হাজার উত্তেজিত জনতার ভীড়। আদালতেও তাই। বাইরে জনসমুদ্র। দেশবন্ধু কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন, যতীন্দ্রকে জামীন দিতে বললেন, নইলে

জনতা মারমুখী হয়ে একটা অশান্তি বাধাতে পারে, যার ফলে আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাঁর নির্দেশে বাধ্য হয়ে যতীন্দ্র জামীন দেন ও সহকর্মীদের সঙ্গে জেলের বাইরে আসেন। মুসলিম হলে সভা হয়, ভাষণ দেন যতীন্দ্রমোহন, সভানেত্রী হন তাঁর স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা। যতীন্দ্রনাথ এরপর বরিশালে গেলে অশ্বিনী-কুমার দত্ত তাঁকে আনন্দে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেন। যতীন্দ্র যান কলকাতায় ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলতে।

চট্টগ্রামের কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী গেলেন ওখানে মৌলানা মহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে জনতা যেভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তা অভূতপূর্ব। কিন্তু তারপর? তিন মাস কেটে গেলে যতীন্দ্রমোহন আবার ধৃত হলেন। এবার একেবারে কলকাতায়, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্স ভারতে এলেন ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর। ২৫শে ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় আসবেন। ঐদিন যেন কোনো আন্দোলন বা ধর্মঘট না হয়, সে-কথা নেতাদের জানাতে নিজে কলকাতায় চলে এলেন বড়লাট। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে তিনি পাঠালেন দেশবন্ধুর কাছে আলোচনা করতে। মহাত্মারও নির্দেশ চাওয়া হলো। মহাত্মা বললেন,—আগে সত্যাগ্রহীদের ছেড়ে দেওয়া হোক, তারপরে অন্য কথা।

দেশবন্ধুও ঠিক তাই বললেন। বড়লাট জানতে পারলেন না। ১৯২২-র মার্চে গোলটেবিল-বৈঠক হবার কথা ছিল, তাও ভেস্তে গেল। সুভাবচন্দ্রের নেতৃত্বে কলকাতায় হরতাল হলো সর্বাত্মক, যেদিন প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ এলেন, সেদিন ব্রিটিশরা রেগে গিয়ে ঘোষণা করলেন,—কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী।

সুভাষ পাল্টা ঘোষণা করলেন,—স্বেচ্ছাসেবকরা পাঁচজন করে দল বেঁধে রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করবে। প্রথম দলে থাকবো আমি নিজে।

কিন্তু আর নয়, ব্রিটিশরাজ দেশবন্ধু ও সুভাষকে একই দিনে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ছ'মাসের জেল হলো ওঁদের দুজনের।

ইংরেজের চণ্ডনীতি, দমন-পীড়ন। হাজার হাজার লোক কারাবরণ করতে লাগলো। নেতারাও বাদ গেলেন না। গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলি, সবাই। খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন তখন এক হয়ে চলছিল।

কিন্তু এক জায়গায় জনতা অহিংস রইলো না, থানা ঘেরাও করে থানা জ্বালিয়ে দিলো জনতা। যুক্তপ্রদেশের একটি গ্রাম, চৌরিচৌরা। গান্ধীজী শুনে মর্মাহত হলেন, অনির্দিষ্ট কালের জন্য আন্দোলন মুলতুবী রাখলেন। কিন্তু এটা কি ভালো করেছিলেন তিনি?

এরপর মুক্তি পেলেন দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র। মুক্তি পেয়েছিলেন এর আগে যতীন্দ্রমোহনও। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাস। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন। তাঁর ঘোষণা : কাউন্সিলে ঢুকে ইংরেজ সরকারকে আঘাত করতে হবে।

গান্ধীজী এ-কথা মানলেন না। বিরোধ দেখা দিলো। দেশবন্ধুর দলে ছিলেন মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি। কিন্তু ভোটে তাঁরা হেরে গেলেন। সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন চিত্তরঞ্জন। গড়লেন নতুন দল,—স্বরাজ্য পার্টি। মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসের সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিলেন। গত বছর অর্থাৎ ১৯২৩ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে বাংলায় জিতলেন স্বরাজ্য পার্টি। লর্ড লিটন দেশবন্ধুকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডাকলেন, কিন্তু দেশবন্ধু রাজী হলেন না, তাঁদের নীতি কাউন্সিলে প্রবেশ করে প্রশাসন অচল করে দেওয়া। লিটন তাই এ-কে গজনভী, ফজলুল হক, প্রভৃতিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়লেন। কিন্তু কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের বাধা যে কতখানি বাধা, শাসনকর্তা তা পদে

পদে টের পেতে লাগলেন। ওদিকে কর্‌পোরেশনেও জিতেছে স্বরাজ্য পার্টি। কলকাতার প্রথম মেয়র হলেন দেশবন্ধু, ডেপুটি মেয়র সইদ সুরাবর্দি, আর প্রধান প্রশাসক—সুভাষচন্দ্র। ওদিকে যতীন্দ্রমোহন তখন স্বরাজ্য পার্টির সেক্রেটারী, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, আবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসেরও সেক্রেটারি।

রাসবিহারী তোসিকাকে দেশের কথা কোনো সূত্রে কিছু পেলেই জানাতেন। ততদিনে তিনি জাপানী শিখে জাপানী ভাষায় ছদ্মনামে লিখতেও আরম্ভ করেছেন। একদিন এসে স্ত্রীকে বললেন,—জাপানে কে আসছেন জানো? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ! সাংহাই থেকে আসছেন।

তোসিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, আমি ওঁকে দেখবো।

একটু ভাবলেন রাসবিহারী, বললেন,—দেখি, কী করতে পারি।

আরম্ভ হলো রাসবিহারীর ছুটোছুটি। তখনো ছদ্মবেশ ধরতে হচ্ছে। তখনো বিদেশী গোয়েন্দা ঘুরছে পিছনে পিছনে। রাসবিহারীই এবার কবির থাকার ব্যবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেন নিজে অলক্ষ্যে থেকে। তাঁরই ব্যবস্থায় ইম্পিরিয়াল হোটেলে উঠলেন কবি, সঙ্গে এল্‌ম্‌ হার্স্ট ও ডক্টর কালিদাস নাগ। শিল্পী নন্দলাল উঠলেন শিল্পী আরাইসনের বাসায়, ক্ষিতিমোহন সেন কিয়োতোর মন্দিরে। ভূমিকম্পের ফলে জাপান তখন খুব ক্ষতিগ্রস্ত। আমেরিকার সঙ্গেও সম্পর্ক জটিল হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন, রাসবিহারীর বিপদ তখনো দূর হয়নি। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একাই গিয়ে দেখা করলেন রাসবিহারীর সঙ্গে, রাসবিহারীরই পাঠানো এক জাপানী বন্ধুর সঙ্গে। সেদিন রাসবিহারীর শ্বশুর-শাশুড়ী, আর বাচ্চা দুটোও এসেছে। তোসিকো মহা খুশি। তিনি উৎসাহের আতিশয্যে বাংলা বলে ফেলতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমগ্র পরিবারের একখানা ফটোও তোলা হয়। এতে কবি, রাসবিহারী, তোসিকো ছাড়া আছেন মিঃ ও মিসেস সোমা, বাচ্চা মাসাহিদে ও তেতিকো, রাসবিহারীর ছেলে আর মেয়ে।

প্রায় একমাস কবি ছিলেন জাপানে, দেশে ফিরলেন ২১শে জুলাই তারিখে। রাসবিহারীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বিষণ্ণ। তোসিকোর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে?

রাসবিহারী গম্ভীর মুখে বললেন, খবরটা এখানকার কোনো কাগজে বেরোয়নি, গত ১লা মার্চ আমার দেশের আর একটি তরুণের ফাঁসি হয়ে গেছে!

—আমাকে সব বলো!

রাসবিহারী বললেন,—১২ই জানুয়ারি ঘটনাটি ঘটে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে মারতে গিয়ে 'ডে' বলে এক সাহেবকে ভুল করে গুলি করে বসে তরুণ গোপীনাথ সাহা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রাসবিহারী বলেছিলেন,—যাক্, বিপ্লবের আগুন তা হলে নেভেনি, এখনো জ্বলছে!

ইতিমধ্যে রাসবিহারীর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। আর ১৯২৩ সালের ২রা জুলাই রাসবিহারী জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। ১৯২৪ সালে গুপ্ত আবাস ছেড়ে একটা ভালো বাড়ি দেখে বাস করতে লাগলেন। রাসবিহারী তখন জাপানী তরুণদের কাছে 'সেনসাই' বা 'মাস্টারমশাই'। দেশের সমস্যার কথা লিখে জানান জাপানবাসীদের বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে, ছেলেদের পড়ানও। আর নানান সূত্র থেকে দেশের খুঁটিনাটি খবর রাখবার চেষ্টা করেন। তার একমাত্র আগ্রহী শ্রোতৃ হচ্ছেন শ্রীমতী তোসিকো। কথায় কথায় একদিন বললেন, জানো, আমাদের অবনী মুখুজ্যে লুকিয়ে দেশে গিয়েছিল, ১৯২২ সালে। অবনী কলকাতাতে গিয়েছিল প্রথমেই ভূপতি মজুমদারের কাছে যায়, তারপরে যায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উপেনবাবু তাকে অনুশীলন সমিতিতে আশ্রয় নিতে বলেন।

এই সূত্রে প্রতুল গাঙ্গুলিকেও খবর দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রও সেই পরামর্শ দেন। 'অনুশীলন' সেই মতো ওকে ঢাকায় লুকিয়ে রাখেন। এই সময় রাশিয়া থেকে নলিনী গুপ্তও লুকিয়ে দেশে গিয়েছিলেন এই সময়। ওদের দুজনকেই ঐ ঢাকাতেই ভিন্ন দু জায়গায় রাখা হয়। কিন্তু এভাবে কতদিন কাজ করা যায়? অবনী আবার ছদ্মবেশে কলম্বো হয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাশিয়া গিয়ে পৌঁছেছে নিরাপদে। ওখানে বিয়েও করেছে বলে শুনেছি। স্ত্রীর নাম রোজা সোলেমনা ফিটিংগফ, লেলিনের একজন লেডি সেক্রেটারির সহকারিণী। অবনীনাথ কলকাতায় আরও অনেকের কাছে আশ্রয়ের জন্য ঘুরেছিল, ছোট ভাই তপতীনাথের সঙ্গেও দেখা হয়েছিলো। কিন্তু পলাতক বিপ্লবীকে কলকাতায় আশ্রয় দেবে কে? সেজন্য ওকে ঢাকা পাঠানোই সমীচীন হয়েছিল। আমি তোমাকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাও বলতে পারি। বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতিবাদী আচার্য, এঁরা একে একে দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রকে ফেরবার অনুমতি দেওয়া হলো না। দেশে এসে অবনী চেয়েছিলেন বাংলার গণ সংগঠনের প্রেরিত প্রতিনিধিরূপে একখানা পরিচয় পত্র। মাদ্রাজের বলশেভিক নেতা সিঙ্গারাভেলুর দল থেকে ভারতীয় কৃষক-মজদুর দলের পরিচয়পত্র আনাও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পরিচয়পত্র বোধ হয় তাকে দেওয়া হয়নি। অবনী কলম্বো হয়ে ইরাণ, ইরাণের পথে রাশিয়া ফিরে গেছে।

এইভাবে রাসবিহারী যখন যা জানতে পারতেন, স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে তা বলতেন। কিন্তু বিগত আট বছর লুকিয়ে লুকিয়ে ঘর বদল করে বসবাস আর স্বামীর জন্য ক্রমাগত উৎকণ্ঠায় থাকার দরুণ তোসিকোর শরীর ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে গিয়েছিলো। ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ তিনি মারা গেলেন মাত্র আঠাশ বছর বয়সে। এ যে কতো বড়ো শূণ্যতা, তা রাসবিহারী কাকে বলবেন? আর কে তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাইবে অমন আগ্রহে, অমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তাঁর দেশের কথা।

বাচ্চা দুটির ভার শাশুড়ী গ্রহণ করলেন। আর রাসবিহারী তাঁর কাজে পড়লেন ঝাঁপিয়ে। ১৯২১ সালে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি গঠন করেছিলেন। তিনি বলতেন সারা পৃথিবীর শান্তির জন্যই ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

এই সময় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ জাপানে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন। রাসবিহারী তখন বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে জাপান-ভারত সম্পর্ক দৃঢ়তর করবার চেষ্টায় নামবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছিলেন। এ-কাজে মহেন্দ্রপ্রতাপও তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। ১৯২৬-এর ১লা আগস্ট নাগাসাকিতে ডাঃ ওহ্‌কাওয়া ও পিকিং-এর এশিয়াবাসী সম্মেলন সংঘের সাহায্যে এক সভা করতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু এই সভার আগে গেছে ১৯২৫ সাল। স্ত্রীর মৃত্যু, আর তারপরে দেশের খবর,—১৬ই জুন দেশবন্ধু দার্জিলিঙে মহাপ্রয়াণ করেছেন। যে দার্জিলিঙের শশ্মানভূমিতে নিবেদিতার সমাধি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই দাজিলিঙেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন দেশবন্ধু। সারা দেশের হাহাকার যেন সমুদ্রপার হয়ে রাসবিহারী বুকে এসে বাজলো। সুভাষচন্দ্র তখন বর্মার মান্দালয় জেলে নির্বাসিত। সেই মান্দালয়, যেখানে ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের সোহনলাল পাঠক ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন। সোহনলাল ১৯১৪ সালেও আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে গদর পার্টির সঙ্গে মিশে ১৯১৫তে বার্মায় গেলেন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করতে। ওখানে এক বিভীষণ তাঁকে ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু সে যাই হোক, বাংলার নেতৃত্ব এসে পড়লো যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ওপর। ত্রিমুকুট পড়লেন মাথায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট, স্বরাজ্য পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা করপোরেশনের মেয়র। মনে রাখতে হবে, তখনকার এই ত্রি-মুকুট ছিল কাঁটার মুকুট।

রাসবিহারীর প্রিয় সহকর্মী শচীন সান্ন্যাল কিন্তু বসে নেই। যোগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতিদের সঙ্গে নিয়ে উত্তর ভারতে আবার গড়ে তুলেছে বিপ্লবী সংস্থা। ১৯২৫ এর ৯ই আগস্ট কাকোরী স্টেশনে ট্রেন আট্কে গার্ডের কাছ থেকে টাকা ভর্তি সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল এই সংস্থার কর্মীদল। অতি দুঃসাহসিক কাজ। দেশ সচকিত হয়ে ওঠে এই খবরে। রাসবিহারীও খবর পান। কিন্তু কার কাছে আর তিনি বলবেন? এক-একবার নিজে-নিজেই আর্তনাদ করে উঠতেন,—অসহ্য এই নিঃসঙ্গতা!

এইখানে শেষ হয় শেফালীর পড়া। আমি শ্রীসঞ্জয়, তখন ভালো হয়ে গেছি প্রায়। বললাম, এবার ত আবার আপনাকে লিখতে বসতে হবে। আমি কি সাহায্যে আসতে পারি না? শেফালী বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকালো, বললে,—পারবেন?

—কেন পারবো না?

—শরীরে বল পেয়েছেন কী?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে আসুন। লেগে যাই।

এরপর শুরু হলো আমাদের দুজনের কাজ। কখনো দাদুর কাছে বসছি ওঁর মুখের কথা নোট করে নিতে। কখনো ওঁর ডায়রি ঘাঁটছি, কখনো বা ঘরভর্তি ওঁর বইগুলো হাত্ড়ে বেড়াচ্ছি। লেখার কাজটা অবশ্য শেফালীই করতে লাগলো।

এক-একদিন বলে, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না?

উত্তর নেই,—না। এ যেন এক তপস্যা শুরু হয়েছে।

—কীসের?

—সে তুমি বুঝবে না।

আমার মুখে অতর্কিতে 'তুমি' সম্বোধন শুনে একটু বোধ হয় অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বললো না। কথাটা পরিষ্কার করবার জন্য আমিই বললাম, আমি আমার

প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য এসব জানতে চাইছি। এবার যদি পথে নামতে হয়, তাহলে হাতড়ে বেড়াতে হবে না।

—মানে!

বললাম—নিজের দেশ আর দেশের মহিমা সম্পর্কে যদি ভালোভাবে না জানি, তাহলেই আমাদের তরুণ চিত্তে বাইরের দেশের লোকের কথা সহজে প্রবেশ করে। নাও, আর কথা নয়, কাজ আরম্ভ করো।

শুরু হয় আমাদের সমবেত কাজ।

কাকোরী ট্রেনের ঘটনা নিয়ে ইংরেজরা 'কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলা'র পত্তন করে। ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে একে একে ফাঁসি হয় রাজেন লাহিড়ীর, আসফাকউল্লার, রামপ্রসাদ বিসমিলের, ঠাকুর রোশন সিংয়ের। আর সেই গোবিন্দ করের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্য আসামী পলাতক হয়ে যান, তিনি হলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। এঁকে ধরতে যায় পুলিশ এলাহাবাদে ১৯৩১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি। ধরা দেন নি, সশস্ত্র সংগ্রাম করে আত্মদান করেছিলেন।

১৯২৫ সালের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ধরা পড়েন 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'-এর কয়েকজন যুবক। আলিপুর জেলে আটক থাকেন। এরাই গোয়েন্দা পুলিশের রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে জেলের মধ্যে শাবলের ঘায়ে খতম করে ফেলেন। শুরু হলো মামলা। কিন্তু সাক্ষী কই? এক খুনী কয়েদী মতি দেখেছিল ব্যাপারটা। শত অত্যাচারে বা প্রলোভনেও সে মুখ খোলেনি। শেষ পর্যন্ত মিথ্যা সাক্ষী হাজির করে পুলিশ মামলা জেতে। ১৯২৬-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসি হয়ে গেল। অনন্ত চক্রবর্তী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ও রাখাল দের হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

১৯২৭-এর শেষে আটক বিপ্লবীরা আবার ছাড়া পেলেন সবাই। ১৯২৮-র ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশন। সুভাষচন্দ্র এই অধিবেশনেই

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈরি করে অপূর্ব গঠন-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এই অধিবেশনের আগের দিন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস চাইবার প্রস্তাব ছিল। সবাই সই করলেন, সুভাষচন্দ্রও।

কিন্তু পরের দিনই তিনি কাটিয়ে উঠলেন দুর্বলতা। তাঁর ভাষণে বললেন, সংশোধনী প্রস্তাব আনায় দুঃখিত। আমরা চাই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। এর পরিণাম আমি দেখতে পাচ্ছি, - মহাসমর। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের দাবী উপস্থাপিত করতে হবে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি।

ভোটে অবশ্য তিনি পরাস্ত হলেন। কিন্তু দেশের তরুণ-মনে স্থান করে নিলেন মুহূর্তে। জওহরলাল অবশ্য তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে কোথায় জওহরলাল, তিনি বাপুজীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন। সুভাষ বলতে গেলে, —একা। তিনি বলেছিলেন,—কী করে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে তার উপায় খুঁজে বার করতে হবে। এমন চাপ দিতে হবে, যাতে ইংরেজ আর এদেশে থাকতে না পারে। আয়ার্ল্যাণ্ডের মতো পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সরকার গঠন করুন।

কিন্তু এবারেও তিনি ভোটে হেরে যান। বাংলাদেশে বিপ্লবীদের দুটি প্রধান গ্রুপ হয়ে গেছে তখন। রিভোলিটিং গ্রুপ আর অ্যাডভান্স গ্রুপ। পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশেও তরুণ দল সংগঠিত হচ্ছে। পণ্ডিত রামশরণ দাস ও ভগৎ সিং ১৯২৮এর কংগ্রেসে এসে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বা মহারাজের কাছে বোমা ও পিস্তল চেয়েছিলেন।

ঐ ১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন-কমিশন। দেশের মানুষ চিৎকার করে শ্লোগান তুলেছে,—গো ব্যাক্ সাইমন। সাইমন ফিরে যাও।

লাহোরে বিরাট মিছিল। সামনে লালা লাজপৎ রায় ও আরও অনেকে। পুলিশের লাঠি পড়লো। লালাজী গুরুতর আহত হলেন। হাসপাতালে মারা গেলেন ঐ সালেরই ৩০শে অক্টোবর।

জ্বলে উঠলো তরুণ দলের চিত্ত। লালাজীর মৃত্যুর জন্য দায়ী যে পুলিশ কর্তা, সেই স্কটকে খতম করাই লক্ষ্য হলো ভগৎ সিং প্রভৃতিদের। কিন্তু রাজগুরু স্কট মনে করে গুলি করলেন স্যাণ্ডাসকে। এক সার্জেন্ট আর গার্ড চন্দন সিং ওঁদের তাড়া করলো। ভগৎ সিং স্যাণ্ডার্সের গায়ে আরও কয়েকটা গুলি করলেন। সার্জেন্টকেও তাক করা হলো, কিন্তু তার গায়ে লাগলো না, চন্দ্রশেখর আজাদের গুলিতে মরলো চন্দন সিং।

পরে দিল্লীর অ্যাসেম্বলিতেও বোমা ফাটিয়েছিলেন এঁরা, ইস্তাহার ছড়িয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল যতীন দাসের। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তার দক্ষিণ কলকাতা অংশের নায়ক ছিলেন মেজর সত্য গুপ্ত, আর তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন যতীন দাস। ভগৎ সিংদের নেতা শচীন সান্ন্যাল, যতীন দাসেরও নেতা। তাঁর আদেশ পালন করার ফাঁকে ফাঁকে ঐ ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ায় সাহায্য করেছিলেন। ১৯২৯-এর ১৪ই জুন যতীন দাসকে কলকাতার বাসা থেকে হাতে-পায়ে শেকল পরিয়ে লাহোর জেলে আনা হলো। আরম্ভ হলো ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু আর যতীন দাসের মামলা। মামলায় সেই ইস্তাহারটা পড়া হলো। তাতে লেখা ছিল,—'আমরা মানুষের জীবনকে মহা মূল্যবান মনে করি। কিন্তু যে মহান বিপ্লব মানুষকে মানুষের শোষণ থেকে বাঁচিয়ে স্বাধীনতা এনে দেবে, সে বিপ্লবের বেদীতে বহু প্রাণকেই উৎসর্গ করতে হবে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।'

এই ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তর প্রতি জেলে খুব খারাপ ব্যবহার করায় তারা প্রতিবাদে অনশন করে। ১৯৩০এর ১০ই

জুলাই তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হবার আগে থাকতেই তাঁরা এই অনশন শুরু করেছিলেন। ১৬ই জুলাই যতীন দাস এসে ওদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য অনশন শুরু করে দেন। ৬৩ দিন অনশন করার পর ১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনি ঠিক এইভাবেই জীবনপাত করেছিলেন। তাই সেখান থেকে তাঁর স্ত্রী মেরী সমবেদনা জানিয়ে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী লক্ষ লক্ষ লোকের মৌন শোক-মিছিলের সঙ্গে যতীন দাসের শবাধারটি কাঁধে করে বহন করে নিয়ে এসেছিল হাওড়া থেকে ক্যাওড়াতলা শ্মশানে।

যতীন দাসের পর ভগৎ সিং শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়ে গেল ১৯৩১-এর ২৩শে মার্চ তারিখে, অপর আটজনের হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মহাত্মাজী এঁদের ফাঁসি রদ করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। এদের উদ্ধার করার জন্যও বিপ্লবীরা চেষ্টা করেছিল। ১৯২৯-এর ২ শে ডিসেম্বর ভগবতীচরণের নেতৃত্বে বড়লাট লর্ড আরউইনের ট্রেন উড়িয়ে দেবার প্রয়াস করা হয়, একটুর জন্য ফস্‌কে যায়। লাহোরের রায়বাহাদুর শিবচরণ দাসের পুত্র ভগবতীচরণ। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী হচ্ছেন দুর্গাদেবী। ভগবতীচরণের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, কিন্তু কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে পারেনি। বোমা তৈরী করতে গিয়ে সেই বোমা ফেটে মারা যান। বিধবা দুর্গাদেবী তাঁর যাবতীয় গহনা ইত্যাদি স্বামীর সহকর্মীদের গড়া আর্য-ভাণ্ডারে দান করেন, যাতে ভগৎ সিংদের জেল থেকে বার করে আনা যায়। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

ওদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রেঙ্গুনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ১৯৩০ এর মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হয়ে রেঙ্গুনে যান। বার্মা তখন ভারত

থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল ইংরেজদের কুটনৈতিক চালে। সে বিষয়ে কিছু বলার জন্যই এই অঘটন। ওরা এপ্রিলে ছাড়া পেয়ে যখন কলকাতার আউটরাম ঘাটে এসে নামেন, তখন বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ এই সময়কার চাঞ্চল্যকর ঘটনা। যতীন্দ্রমোহন আবার জেলে গেলেন। করপোরেশনের মেয়র পদে পঞ্চম বারের জন্য আবার তাঁর নাম উঠলো। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিতও হলেন। কিন্তু জেলে থেকে কাজ করবেন কী করে? তাই তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। মেয়র হলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

যতীন্দ্রমোহন ছাড়া পেলেন ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু। কিন্তু তিনি জেলে থাকায় তাঁর জায়গায় যতীন্দ্রমোহন হলেন প্রেসিডেন্ট। যতীন্দ্রমোহন জালিওয়ানাবাগের জনসভায় ভাষণ দিতে উঠলে পুলিশ বাধা দেয় এবং সে বাধা না মানায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লী নিয়ে যায়। এক বছরের জেল হয় তাঁর। অরুণা আসফ আলি ও নেলী সেনগুপ্তা দিল্লীতে বক্তৃতা দিলে তাঁদের দুজনকেও গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করা হয়। এইসব খবরে দেশবাসী বিচলিত। কলকাতায় হরতাল। এরপরে মিঃ জয়াকর ও তেজবাহাদুর শপ্রূর চেষ্টায় গান্ধী-আরউইন চুক্তি হয়। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পান, গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে বসতে রাজী হন।

১৯৩১-এর ২৭শে জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন ও নেলী মুক্তি পান। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা কলকাতায় আসেন। বিরাট সম্বর্ধনা হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে তাঁরা গেলেন চট্টগ্রাম। তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা চলছিল।

কিন্তু সে-কথা লেখবার আগে আরও কিছু প্রাক্-কথন আছে। ভগৎ সিং-দের মামলায় রাজ-সাক্ষী হয়েছিল ফণী ঘোষ। এই

বিভীষণকে খতম করার জন্য বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমা সিংয়ের ফাঁসি হয়, ১৯৩৪ সালে। আমরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথা লিখি নি। খান আব্‌দুল গফ্‌ফর খাঁ-র নেতৃত্বে 'লাল-কোর্তা'-দলের হয়ে পাঠানরা সত্যাগ্রহ করেছেন, বহু লোক গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন, বহু লোক কারাবরণ করেছেন। কিন্তু একটি পাঠান অহিংস সত্যাগ্রহ মেনে নিতে পারেন নি, তাঁর নাম হরিকিষণ। পাঞ্জাবের লাট-কে সে গুলি করে। ১৯৩১-এর ৯ই জুন তাঁর ফাঁসি হয়।

বোম্বাই সরকারের হোম-মেম্বার হট্‌সন সাহেবের অত্যাচারে মহারাষ্ট্র তখন বিপর্যস্ত। মেয়েরাও অত্যাচারের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না। ১৯৩১-এর ২২শে জুলাই এই হট্‌সনকে গুলি ছুঁড়ে ঘায়েল করলেন গোগ্‌টে বলে একটি মারাঠী যুবক। বিচারে হয়েছিল বার বছরের জেল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য সেন বা মাস্টারদা। অস্ত্রাগার পুলিশ-ব্যারাক ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করার নির্দেশ দেন তিনি। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত ৮টা। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কাজ একসঙ্গে করার নির্দেশ। পরণে সবারই সামরিক পোষাক। রেলওয়ে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভার ছিল লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের ওপর। পুলিশ-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করার দায়িত্ব ছিল গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংয়ের ওপর। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-দখল করার ভার ছিল অম্বিকা চক্রবর্তীর ওপর। সাফল্য যে আসে নি এমন নয়, কিন্তু সে হচ্ছে তাৎক্ষণিক সাফল্য। পুলিশ ব্যারাকে পেট্রোলের আগুনে গুরুতর আহত হলে হিমাংশু সেনকে ধরে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং মোটরে করে অন্যদিকে চলে যেতে বাধ্য হন। এবং মাস্টারদার মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯শে এপ্রিল থেকেই চট্টগ্রাম শহরে কড়া পাহারা বসলো, বাইরে থেকে আসা ও বাইরে যাওয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ২২শে এপ্রিল ভোরবেলা বিপ্লবীরা জড়ো হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। বিকেলবেলা সৈন্যদল মেশিন

গান নিয়ে আক্রমণ করে। যুদ্ধ শুরু হয়। সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করে লোকনাথ বলের ছোট ভাই হরিগোপাল বা টেগরা। কিশোর নির্মল সেন মারা যায় তার পরে। মারা যায় নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা সেন, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, জিতেন দাস, পুলিন ঘোষ, মধুসূদন দত্ত। অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতিলাল কানুনগো গুরুতর আহত হয়ে মারা যান পরের দিন। বিনোদ দত্ত ও অম্বিকা চক্রবর্তী গুরুতর আহত হয়েছিলেন। অম্বিকাবাবু রুগ্ন অবস্থায় পটিয়ায় ধরা পড়েন। বিচারে ফাঁসি না হয়ে যাবজীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। জালালাবাদের পর কালারপোলের খণ্ড যুদ্ধ ৬ই মে। চারজন মারা যায়। সমগ্র দলের মধ্যে যাঁরা ধরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নির্যাতন সইতে না পেরে একরার করতে শুরু করলে ফেরারী অনন্ত সিং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯ মাস মামলা চলার পর ১৯৩২ সালে রায় বার হয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ পান লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, ফণী নন্দী, অন্নদা গুপ্ত, সহায়রাম দাশ, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুবোধ রায়, সুবোধ চৌধুরী, রণধীর দাশগুপ্ত, সুখেন্দু দস্তিদার। ঐ সালেরই জুন মাসে চট্টগ্রামের ধলঘাট বলে একটি গ্রামে একটি বাড়িতে সূর্য সেন বা মাস্টারদা কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে আত্মগোপন করে আছেন, এমন সময় পুলিশ এসে বাড়ি ঘিরে ফেলে। মেশিন গান ও পিস্তলে গুলি বিনিময় হতে থাকে। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন মারা পড়েন। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কোনক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এর পরের পরিকল্পনা পাহাড়তলি রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ। সাহেবদের ক্লাব। ২৪শে সেপ্টেম্বর হচ্ছে তারিখ। এই আক্রমণ চালায় প্রীতিলতা ৮জন তরুণ সঙ্গী নিয়ে। দুই পক্ষেই গুলি চলে। প্রীতিলতা গুরুতর আহত হন। আর তখনই পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পকেটের কাগজে লেখা ছিল,—মেয়েরাও যে হাতে-নাতে কাজ করতে

পারে, এটা প্রমাণ করার জন্যই আমার ওপর এই ভার দেওয়া হয়েছিল।

চট্টগ্রামের অপর নারী-কর্মী কল্পনা দত্তকে পুলিশ ধরেছিল পাহাড়তলিতে। দু-মাস জেলে রাখবার জামিনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সে পালিয়ে যায়। মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন ধরা পড়েন ১৯৩৩-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি। গৈরলা গ্রামের গোপন আশ্রয়স্থল। চারিদিক পুলিশ ঘিরে রেখেছিল। তিনি দলবল নিয়ে বার হতেই তাঁকে ধরা হয়। অন্য সবাই অন্ধকারে পালান, তিনি আর ব্রজেন সেন পারেন নি। অকথ্য অত্যাচার। তিন মাস পরে কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার ধরা পড়েন। বিচারে কল্পনার হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তারকেশ্বর ও সূর্য সেনের ফাঁসি, ১৯৩৪-এর ১৩ই জানুয়ারি।

এই প্রসঙ্গে একটি শোচনীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। মাস্টারদা-দের আশ্রয় দেবার অপরাধে বিধবা সাবিত্রী দেবী ও তার কিশোর বয়স্ক রুগ্ন ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে ধরে মেদিনীপুরের স্যাঁতসেঁতে জেলঘরে রাখা হয়। সাবিত্রী দেবী ফিমেল ওয়ার্ডে, আর ছেলে পুরুষের ওয়ার্ডে। রামকৃষ্ণ তখন গুরুতর যক্ষারোগে পীড়িত। তাকে তার ওপরে ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে রাখা হয়েছিল। ছেলে মারা যাচ্ছে, তবু মাকে কাছে আসবার অনুমতি দেওয়া হয় নি। মারা যাবার পর একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে দেওয়া হয়েছিল। তা-ও সেলের দরজায় তালা লাগানো ও পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি আর শিকল পরা অবস্থাতে। ছেলে মরে পড়ে আছে, মা যে তাকে ছুঁয়ে একটু চোখের জল ফেলবে, সে উপায়টুকুও করে দেওয়া হয় নি।

এইসব কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা লেখা হয় নি। সে হচ্ছে ১৯৩১-এর অক্টোবরের ঘটনা। হিজলী বন্দী-শিবিরে রাজবন্দীদের ওপর শখানেক রক্ষী-পুলিশ বেয়নেট-লাঠি-গুলি চালায়। কলকাতার সন্তোষ মিত্র ও বরিশালের তারকেশ্বর সেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯৩১-এর ১৬ই অক্টোবর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জনসভায় এসে ভাষণ দিয়েছিলেন।

অক্টোবরে যতীন্দ্রমোহন ও নেলী বিলেত গিয়েছিলেন। নেলীর সঙ্গে তাঁর মার দেখা হলো বহুদিন পরে। ওঁদের ভ্রাতৃবধূ—নীরেন্দ্র মোহনের বিধবা স্ত্রী এভার সঙ্গেও দেখা হলো। ওদের মেয়ে আইলীনকে নিয়ে প্যারিস ঘুরে দেশে ফিরছিলেন, বোম্বাইতে জাহাজ ভিড়তেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যতীন্দ্রর ছেলে শিশির এসেছিলেন কলকাতা থেকে ওঁদের নিয়ে যেতে। বাবাকে ছেড়ে শুধু মা আর বোনকে নিয়ে সে ফিরে আসে। যতীন্দ্রমোহনকে নিয়ে যাওয়া হয় দার্জিলিঙে। ব্লাড-প্রেসারের রোগীকে পাহাড়ে নিলে ক্ষতি হবে জেনেই কর্তৃপক্ষ ওঁকে দার্জিলিঙ নিয়ে যায়। শরীর খুব খারাপ হতে নিয়ে আসে জলপাইগুড়ি জেলে, সেখান থেকে কলকাতা মেডিক্যাল হাসপাতালে, ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ঐ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নেলী সেনগুপ্তাকে সভানেত্রী করা হয়। তিনিই তৃতীয় মহিলা প্রেসিডেন্ট। আগে হয়েছিলেন অ্যানি বেসান্ত আর সরোজিনী নাইডু। এই সময় নেলীও গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু কদিন অসহ্য জেলবাসের পর আদালতে হাজির করা হলে জজ তাঁকে ছেড়ে দেন। নলিনীরঞ্জন সরকার ও কিরণ শঙ্কর রায়ের চেষ্টায় সরকার শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের বিষয়ে একটু নমণীয় মনোভাব নেন। তাঁর শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ছে দেখে তাঁকে রাঁচীতে অন্তরীণ করে রাখা হয়। সঙ্গে নেলী ও আইলীন থাকেন। কিন্তু ঐ ১৯৩৩ সালেরই ২৩শে জুলাই তারিখে যতীন্দ্রমোহন মারা যান। তাঁর মরদেহ কলকাতা আনলে দেশের শোকার্ত মানুষ ভিড় করে আসে তাঁকে দেখবার জন্য। বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁকে ক্যাওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইংরেজ হঠাৎ যতীন্দ্রমোহনের ওপর অতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল কেন? চট্টগ্রামের লোক বলে? চট্টগ্রামের বীর নায়কদের সঙ্গে

কোন যোগাযোগ রয়েছে,—এই কথা সন্দেহ করে ? হতেও পারে, আশ্চর্যের কিছু নেই।

এবার ঢাকায় পুলিশ-কর্তা অত্যাচারী লোম্যান সাহেবের হত্যা সম্পর্কে, যে বিনয় বসুর নাম শোনা যাচ্ছিল, তার কথা আলোচনা করা যাক। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, মস্ত বড়লোকের ছেলে। বাবা রেবতীমোহন বোস থাকেন জামসেদপুরে। আদি বাড়ি বিক্রমপুর।

হড্‌সনকে নিয়ে লোম্যান এসেছিল হাসপাতালে এক অসুস্থ সহকর্মীকে দেখতে। প্রহরীর দল চারিদিকে ছেয়ে আছে। তবু তারই মধ্যে গাছের আড়াল থেকে বিনয় গুলি ছুঁড়েই পালালেন। সরকারী ঠিকাদার সত্যেন সেন ধরতে এসেছিল, তাকে এক ঘুঁসিতে বসিয়ে দিয়ে হাসপাতালের উঁচু পাঁচীল টপকে একেবারে হাওয়া। লোম্যান মারা গেছে, হড্‌সাহেবের আঘাতও খুব গুরুতর।

শুরু হলো অত্যাচার। মেডিকেল ছাত্রদের অকথ্য প্রহার করা হলো, একজন প্রহার সইতে না পেরে বলে দিয়েছিল বিনয় বসুর নাম। ইংরেজ বিনয়ের ছবি জোগাড় করে সারা শহর ছেয়ে দিয়েছে। জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার।

কিন্তু ঢাকার চারদিকে জালের মতো পুলিশ বেষ্টন করে থাকা সত্ত্বেও বিনয় বসুকে ধারা যাচ্ছে না। ব্যর্থ হয়ে পুলিশ আরও ক্ষেপে গেল। যেখানে খুসি যাচ্ছে, যাকে খুসি মারছে। মেয়েদের পর্যন্ত উলঙ্গ করে মারতে বাকি রাখেনি।

বিনয় ওখান থেকে সরে পড়ে দলেরই এক কর্মী মণি সেনের বাড়ি যায়। মণি নিয়ে যায় তাকে শ্রীসংঘের অন্যতম পরিচালিকা বিপ্লবিনী লীলা নাগের বাড়ি। তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে অন্যতম নেতা সুপতি রায়ের মেসে। কী করা যায় ? আরেক বিনয় বোস এগিয়ে এলো। আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলো শশাঙ্ক দত্তের বাড়িতে।

ওদিকে ধড়পাকড়ও শুরু হয়ে গেছে। মণি সেন, জ্যোতিষ জোয়ারদার, নেপাল সেন, ভোলা বসাক, জীবন দত্ত, শৈলেশ রায়, তেজোময় ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই গ্রেপ্তার হলেন।

বিনয় গাঁয়ের গরীব মুসলমান সেজে বেরিয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যে। অনেক কাণ্ড করে অনেক ঘুর পথ পার হতে হতে শেষ পর্যন্ত কলকাতা। এখানে আছে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ টেগার্ট, ওকে সাবধানে থাকতে হবে। কলকাতা থেকে চুঁচুড়া হয়ে কাতরাসগড়। এখানে কিছুদিন থেকে আবার কলকাতায়। এবার রইলো নিরাপদে, বেলেঘাটা অঞ্চলে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি-ভি-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ। সঙ্গে আছেন প্রবীন বিপ্লবী হরিদাস দত্ত, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, প্রফুল্ল দত্ত, মনীন্দ্র রায়, রসময় শূর ও ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতরায়। স্কোয়াড পরিচালনা করতেন নিকুঞ্জ সেন আর সুপতি রায়। এঁদের মধ্যে পরামর্শ-সভা বসলো,—এখন কী করা যায় বিনয়কে নিয়ে? সুভাষচন্দ্রের কাছেও প্রশ্নটা গেল। তিনি বললেন,—ওকে এখুনি দেশের বাইরে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু সব ব্যবস্থা হয়ে গেলেও বিনয় গেল না। বি-ভি-র পরবর্তী প্রোগ্রাম। ও-কাজ তাকে করে যেতেই হবে। বিনয় বেলেঘাটা থেকে মেটেবুরুজে রাজেন গুহের বাড়িতে চলে এলো। রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের পরিকল্পনাও ততদিনে ম্যাপ এঁকে নিখুঁত করে রাখা হয়েছে। বিনয়ের সঙ্গে থাকবে বিক্রমপুরেরই অবনী গুপ্তের ছেলে বাদল, আর সতীশ গুপ্তের ছেলে দীনেশ। ৮ই ডিসেম্বর হলো তারিখ। তিন জনেই দামী স্যুট্ পরে প্রস্তুত। বেলা তখন বারোটা। ওরা নামলো রাইটার্সের সামনে। কুড়ি থেকে বাইশের খতম মধ্যে ওদের তিনজনের বয়স। কর্ণেল সিম্পসনের ঘরে ঢুকে প্রথমে খতম করলো তাকে।

আই-জি অব প্রিজনস্ এই সিম্পসনই আলিপুর জেলে সুভাষচন্দ্রকে লাঞ্ছিত করেছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে হোম

সেক্রেটারির ঘর। বাধা দিতে এলেন একজন ইংরেজ সেক্রেটারি। খতম। সঙ্গে সঙ্গে ত্রাসের সৃষ্টি। পালাচ্ছে সব। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ ক্রেগ উদ্যত পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলেন। শুরু হলো পিস্তলে পিস্তলে খণ্ডযুদ্ধ। ইনি আহত হতেই ফোর্ড এঁর পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। তারপর এলেন জোন্স্,—কিন্তু এঁরাও রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলেন। খবর গেল লালবাজারে চার্লস টেগার্টের কাছে। একদল পুলিশ নিয়ে তখ্‌খুনি ছুটে এলেন তিনি। সঙ্গে সহকারী সাহেবরা। বারান্দা-যুদ্ধ আরও জমে উঠলো। বিনয় একসময় সহকর্মীদের বললো,—এবার থামো। এবার যেতে হবে পাসপোর্ট অফিসে। টেগার্ট তখন উপায় না দেখে গুর্খা ফৌজ আনিয়েছে। শুরু হলো রাইফেলে-পিস্তলে মোকাবিলা। মিঃ নেলশন বলে আর একজন সেক্রেটারি আহত হলেন। আহত হলো মিঃ টয়নাম। এবার বিনয়-বাদল-দীনেশের পালা। প্রথম গুলি লাগলো দীনেশের বাঁ হাতে। কিন্তু তবু তো ডান হাতখানা আছে, চালিয়ে যেতে লাগলো সে। ওদিকে বাদলের গুলি গেছে ফুরিয়ে। দীনেশের কাছে মাত্র একটা গুলি। বিনয়েরও একটা। শত্রুদের দিকে পিস্তল তাক্ করে রেখে ওরা একটা ঘরে ঢুকে গেল। খালি ঘর। অফিসার পলাতক। বাদল সায়নাইডের পুরিয়া মুখে পুরল। ওরা পিস্তল নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফায়ার করে দিলো। মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল তিনটি দেহ। বাদল সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। দীনেশ আর বিনয় গুরুতর আহত। বাদলের মতো তারাও বিষ খেয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবার ফলে তা আর পেটে যায়নি, গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। টেগার্ট বিচক্ষণ মানুষ, ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। বিনয়ের তখনো জ্ঞান ছিল। টেগার্ট তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে উঠলো,—বিনয় বসু।

টেগার্ট লোম্যান-হত্যাকারীর খোঁজ পায়নি এতদিন। রেগে বুট দিয়ে ওর একখানা হাতই গুঁড়িয়ে দিলো।

বাদল চলে গেছে, কিন্তু ওদের দুজনকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টার শেষ নেই। কিন্তু বিনয়কে বাঁচানো গেল না। দীনেশ উঠলো বেঁচে, ফাঁসিতে প্রাণ দেবার জন্য। দীনেশের কর্মক্ষেত্র ছিল ঢাকা এবং মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের সিংহশিশু নির্মলজীবন ঘোষ, বিমল দাশগুপ্ত, পরিমল রায়, ফণী দাস, ফণী কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক, প্রভৃতিরা ছিল ওর সহপথিক। এরা বসে থাকেনি। ৭ই এপ্রিল অত্যাচারী জেলাশাসক পেডিকে খতম করেছিল। ফাঁসির আগে এখবরটা কানে শুনে গিয়েছিল দীনেশ। তার ফাঁসির তারিখ ১৯৩১ এর ৭ই জুলাই। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের কাগজ 'অ্যাডভান্সে, পরদিন বিশাল হরফে শিরোনামা ছাপা হলো,—'**Dauntless Dinesh Dies at Dawn**!' শিরোনামা দিয়েছিলেন অ্যাডভান্সের প্রধান সাব-এডিটার ইন্দু মিত্র।

এরপরে দার্জিলিঙের লেবং মাঠের ঘটনা। ১৯৩৪ সালের মে মাস। কুখ্যাত বাংলার গভর্ণর স্যর জন অ্যাণ্ডারসনকে খতম করতে হবে। ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের ভার পায়। এদের সাহায্য করেছিলেন সুকুমার ঘোষ, উজ্জ্বলা রক্ষিত রায় প্রভৃতি। ভবানীপ্রসাদের জন্ম ঢাকা জেলায় ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুর গ্রামে ১৯১৫ সালে। ভাওয়ালের রাণী বিলাসমণি তার বোন। এদের বাবা থাকতেন বরিশালের বানরীপাড়ায়। স্কুলে পড়ার সময়ই ভবানী 'বেঙ্গল ভলান্টিয়াস''-এর বিপ্লবী কামাখ্যা রায়ের সংস্পর্শে আসে। ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ভবানী। তারপরেই আসে ঐ কাজের দায়িত্ব। রবীন্দ্র ব্যানার্জীকে নিয়ে ভবানী ওঠে দার্জিলিঙের জুবিলি স্যানাটেরিয়ামে। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী আর উজ্জ্বলা দেবী হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলভার লুকিয়ে স্নো-ভিউ হোটেলে আলাদা গিয়ে ওঠেন। গভর্ণর ৮ই মে লেবং-এ ঘোড়দৌড় দেখবেন। সুযোগ বুঝে গভর্ণরকে গুলি করে ভবানী। রবীন্দ্রও করে, কিন্তু দুটো গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরের

দেহরক্ষীরা রুখে দাঁড়িয়ে পাল্টা গুলি ছোঁড়ে, ওরা দুজন গুরুতর আহত হয়ে ধরা পড়ে যায়। পরে কলকাতা থেকে উজ্জ্বলা দেবী, সুকুমার ঘোষ ও মধুসূদন ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করে দার্জিলিঙে চালান দেয় পুলিশ। রবীন্দ্র ব্যানার্জীর সাজা হয় ২০ বছরের কারাদণ্ড। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদের জেল। ভবানীপ্রসাদের ফাঁসী। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসী মঞ্চে মাত্র একুশ বছর বয়সে 'জীবনের জয়গান' গেয়ে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করেন, ১৯৩৪-এর ৩রা ডিসেম্বর। এই ১৯৩৪ সালেই মেদিনীপুরে তিন-তিনটি লালমুখো ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হয়েছিল।

মেদিনীপুরের কথায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কথা স্মরণ করতে হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনিই ছিলেন মেদিনীপুরের অগ্রণী দেশপ্রেমিক।

কুখ্যাত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে খতম করা হয় ১৯৩১-এর ৭ই এপ্রিল। তাঁর জায়গায় আসেন রবার্ট ডগলাস। পেডি-হত্যার জন্য বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মামলা টেঁকে না, প্রামাণাভাবে দুজনকেই আদালত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এর কিছুকাল পরেই ঘটে ডগলাস-হত্যা। দুটি ছেলে অসীম সাহসে এক সভার মধ্যে ঢুকে ওঁকে গুলি করে পালিয়ে গেল। পিছনে পিছনে ছুটে এলো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাঁর দেহরক্ষী-দল আর মিঃ জর্জ, তমলুকের এস-ডি-ও।

বীর যুবক দুটির একজন হচ্ছে প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য। মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অপর জন হচ্ছে প্রভাংশু পাল। দুজনের বাড়ি ছিল ঘাটাল অঞ্চলে। প্রদ্যোতের পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় জর্জ ও রক্ষীরা তাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। প্রভাংশুকে কলকাতায় সন্দেহ বশে ধরে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে। কিন্তু কিছু হদিস না পাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে সপ্তাহ খানেক পরে আবার ধরে মেদিনীপুরে চালান দেয়। কিন্তু

কেউ তাকে ডগলাসের হত্যাকারী বলে সনাক্ত না করায় মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। পরে অবশ্য বার্জের হত্যার পর ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত রাজবন্দী করে ওকে রাখা হয়েছিল। যতিজীবনকেও ঐভাবে ঐ সময় পর্যন্ত আটক করে রেখে দিয়েছিল।

এবার আসছে মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে হত্যার কাহিনী। ভদ্রলোকের ফুটবল খেলার খুব সখ ছিল। ১৯৩৩-এর ২রা সেপ্টেম্বর তিনি পুলিশ-মাঠে খেলতে নামা মাত্র দুটি কিশোর এগিয়ে রিভলবারে গুলি বর্ষণ করে। তৎক্ষণাৎ মারা যান বার্জ। দেহরক্ষীর দল ছুটে এলো গুলি করতে করতে। তাদের গুলিতে অনাথবন্ধু পাঁজা ওখানেই মারা যায়। অপর জন মৃগেন্দ্র কুমার দত্ত, গুলিতে গুলিতে জর্জরিত দেহ নিয়ে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে পরদিন দেহত্যাগ করে। দুজনেই ছিল ছাত্র। একজন কলেজের, অপর জন স্কুলের। কিন্তু ইংরেজ এতে পরিতৃপ্ত হবে কেন? শুরু হলো মেদিনীপুরের ওপর অকথ্য দমন-পীড়ন। গ্রেপ্তারও হলো অনেক। বিচারও বসলো। অনেকের হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কিন্তু প্রাণদণ্ড হলো তিনজনের। ১৯৩৪-এর ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর ফাঁসির মঞ্চে আত্মবিলোপ করলো ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় এবং নির্মলজীবন ঘোষ। যতিজীবনেরই ভাই নির্মলজীবন। এঁদের আর এক ভাই নবজীবন ঘোষকে ১৯৩৩ সালে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্মলজীবনের মামলার রায় বেরোনোর পরেই তাকে গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী হিসাবে বহরমপুর জেলে রাখে। যতিজীবনও তখন ওখানে। সেখান থেকে নবজীবনকে ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের থানায় ধরে আটকে রেখেছিল। ১৯৩৬ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সে আত্মহত্যা করেছে বলে সংবাদ রটানো হয়। আসলে অকথ্য মারের ফলেই সে মারা যায় বলে সকলের দৃঢ় ধারণা।

এইসব আত্মদান ব্যর্থ হবার নয়। এঁদের কথা ভাবতে ভাবতেই

সুভাষচন্দ্র সে সময় বলেছিলেন,—'বিপ্লব আনতে হলে আমাদের চোখের সামনে এমন একটি আদর্শ তুলে ধরতে হবে, যা বিদ্যুতের মতো আমাদের সচকিত করবে।

আর একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, সে হচ্ছে ১৯২৯ সালের কথা,—"যে সমাজ আজ আমরা গড়ে তুলতে চাই, তার মূল কথা হবে সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ধন-সম্পত্তিতে সকলের সমস্বামিত্ব, সমাজের বৈষম্যমূলক বিধান প্রত্যাহার।"

এইখানে বলা দরকার, আন্দামানের সেলুলার জেলের বন্দীরা, যারা ১৯৩২-৩৮-এর যুগে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁরা নবদিগন্তের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে স্বীকার করে গেছেন। প্রথমেই বন্দীদের মধ্যে তৈরী হয় কমিউনিস্ট কন্সোলিডেশন। এই সময়কার অন্যতম বন্দী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার লিখে গেছেন, "আমরা যখন এসে পৌঁছই, ততদিনে বন্দীদের অধিকাংশই এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে। যাঁরা মার্ক্সবাদের ক্লাস নিতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো,—ডাঃ নারায়ণ রায়, বিজয় সিং ধন্বন্তরী, অমলেন্দু বাগচী, সুশীল চ্যাটার্জী, নলিনী দাশ, বঙ্গেশ্বর রায়, গোপাল আচার্য প্রভৃতি।"

প্রসঙ্গত বলা উচিত, বিখ্যাত গদর বিপ্লবী গুরুমুখ সিং, যিনি প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সেলুলার জেলে কাটিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বন্দী অবস্থাতেই ট্রেন থেকে পালিয়ে বহুকাল আত্মগোপন করে থেকে মস্কোতে শিক্ষালাভ করে এসে পাঞ্জাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠক রূপে কাজ করছিলেন, তিনি ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে আবার ধৃত হয়ে সেলুলার জেলে ফিরে আসেন।

এই সময়, অর্থাৎ ১৯৩৭-য়ে, নতুন আইন অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ১১টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গড়ে উঠেছে।

দমন-নীতি কিছুটা শিথিল, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নও সোচ্চার। এই অবস্থায় রাজনৈতিক ভিত্তিতে আন্দামান-বন্দীরা অনশন করা স্থির করেন। ২৪শে জুলাই শুরু হলো এই অনশন। দীর্ঘ দিনের অনশন। দেশে সাড়া পড়লো। কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তারবার্তায় বন্দীদের জানালেন,—'তোমাদের দাবি আদায়ের দায়িত্ব দেশবাসী নিয়েছে। অনশন ভঙ্গ করো।' অন্য এক তারবার্তায়ও বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় (ফজলুল হক ও সিকান্দার হায়াত খান) অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানালেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার স্বরাজ্য দলের চীফ হুইপ সত্যমূর্তিও জানালেন,—তোমাদের দেশে ফেরৎ পাঠানোর দাবি সরকার মেনে নিয়েছে।

বন্দীদের আরও একটা দাবি ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করতে হবে সবাইকে। এ দাবি মেনে নেওয়া হয়নি, বন্দীরা তাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত অনশনের ৩৬।৩৭ দিন পরে চীফ কমিশনার নিজে গেলেন বন্দীদের সঙ্গে কয়েকটি টেলিগ্রাম নিয়ে দেখা করতে। টেলিগ্রাম করেছেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, মুজফ্‌ফর আমেদ প্রভৃতি। গান্ধীজীর তারবার্তায় ছিল, 'তোমাদের Full relief দেওয়ার চেষ্টা করবো।'

বন্দীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এই Full relief মানে কী? বন্দী মুক্তি?

গুরুমুখ সিং বললেন,—ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠাও। ততক্ষণ অনশন ভঙ্গ হবে না।

সেই অনুসারে আসে গান্ধীজীর দ্বিতীয় বার্তা। নলিনী দাশ লিখেছেন,—'Full relief means release.

যাইহোক, গুরুমুখ সিং প্রভৃতি সব বন্দীরাই এবার অনশন ভঙ্গ করলেন। তার পরে দেশে ফেরার পালা। সত্যেন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, প্রথম ব্যাচে গেলেন সর্দার গুরুমুখ সিং, লাহোর, দিল্লী,

গয়া ষড়যন্ত্রের ও মাদ্রাজের বন্দীরা। সঙ্গে বাংলার অসুস্থ বন্দী নলিনী দাশ, সুশীল চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

শেষ দল ফিরে আসে ১৯৩৮-এর জানুয়ারি মাসে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও চট্টগ্রামের বাখুয়া ডাকাতি, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র, ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমার মামলা, মেদিনীপুরে বার্জ হত্যার মামলা, লেবং-এর গভর্ণর মারার চেষ্টার মামলা ও হিলি ডাকাতির মামলা, এ-সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বন্দীরাই দেশে ফিরে এলেন। মুক্তি পেলেন না, দেশের জেলে দণ্ড ভোগ করতে লাগলেন। তবে মুক্তির জন্য আন্দোলন চলতে লাগলো। কেউ কেউ ছাড়া পেলো, কেউ কেউ তখনো আটক রইলেন।

গুরুমুখ সিং-এর কথা, হরদয়ালের কথা মনে পড়ে যায়। হরদয়াল জার্মাণী থেকে চলে যান সুইডেনে। ব্রিটিশ সরকার নিষেধ প্রত্যাহার করে নিলে তিনি লণ্ডনে আসেন ১৯২৭ সালে। সেখানে তাঁর দাদা কিষেণ দয়াল তাঁকে স্বাগত জানান। এই কিষেণ দয়াল ভাইয়ের জন্য যথাসাধ্য করতেন। হরদয়ালের স্ত্রী দেশে ওঁর কাছেই থাকতেন। তিনি হরদয়ালের একমাত্র মেয়ে শান্তিকেও বি-এ পর্যন্ত পড়িয়ে ব্যারিস্টার বিষণ নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। হরদয়াল দাদার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দেশে ফেরার তখনো প্রশ্ন ওঠে না। উনি লণ্ডনে পড়াশোনা নিয়ে মেতে উঠলেন। ১৯৩২ সালে তাঁর থিসিসের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল পান। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে শোনা গেল, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দেশে ফেরবার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এই অনুমতিপত্র পাবার আগেই লালাজী আমেরিকায় রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে খবরটা পৌঁছাল ডিসেম্বরে। দেশের লোক উন্মুখ হয়ে রইলো তাঁকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায়। ফিলাডেলফিয়াতে ব্যাকড্রাফ্‌ট-যোগে তাঁকে পথ খরচের টাকা জোগাড় করে পাঠানো হলো। সকলেই অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। তাঁর স্ত্রী অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে তাঁর

মেয়ে শান্তি, যে কখনো বাবাকে চাক্ষুষ দেখেনি। কিন্তু দেশে আর তাঁর ফেরা হলো না। ১৯৩৯-এর ৪ঠা মার্চ ঐ ফিলাডেল ফিয়াতেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন, বয়স তখন মাত্র চুয়ান্ন বছর।

এবার বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। ১৯২৬ সালে জার্মাণ কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন বলে অনুমান করা হয়। ১৯২৭ সালে ব্রাসেল্‌সে যে 'ঔপনিবেশিক পীড়ন ও সাম্রাজ্যবিরোধী সম্মেলন' হয়, তাতে তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। এতে ভারতীয় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা বীরেন্দ্রনাথ ও বরকৎউল্লাকে নিয়ে হচ্ছেন ১০ জন। এর মধ্যে জহওরলাল নেহেরুও ছিলেন, ছিলেন কে-এম পাণিক্কর। যাইহোক, হিটলারের জার্মাণী ১৯৩২ থেকে যে রূপ নিচ্ছিল, তাতে জার্মাণীতে বীরেন্দ্রনাথ আর থাকতে না পেরে রাশিয়ায় চলে যান। এখানে অবনীনাথের মতো তাঁরও কেটেছিল পড়াশোনা ও গবেষণায়। ১৯৩৩ সালে যোগ দিয়েছিলেন লেনিনগ্রাদের ইন্সটিটিউট অব এথনোগ্রাফিতে। এখানে কাজ করতে করতেই এখানকার এক কর্মী শ্রীমতী লিডিয়া করুনোভস্কাইয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে একেই বিবাহ করেন। অবনীনাথেরও যা হয়েছিল, এঁরও হলো তাই। স্তালিন আমলে ১৯৩৭ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশে রুশ-বিপ্লবে প্রভাবিত হয়ে যে ভারতীয়রা কাজ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সাপুরজী সাকলাৎওয়ালার নাম করতে হয়। ১৮৭৪ সালে বোম্বাইয়ের এক সমৃদ্ধ পাশী পরিবারে জন্ম, মৃত্যু ১৯৩৬-এর ১৬ই জানুয়ারি। আরও দুজন ভারতীয়ের কথা বলা উচিত, যাঁরা ব্রিটেনে বাস করে সাম্যবাদের কাজ করে গেছেন অক্লান্তভাবে। দুই ভাই এঁরা। ক্লেমেন্স দত্ত এবং রজনী পাম দত্ত। রমেশচন্দ্র দত্তের ভাইপো উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তর ছেলে এঁরা। এঁদের

মা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ শতকে সাকলাৎওয়ালা ও রজনী পাম দত্তের সান্নিধ্যে এসে বিলেতে বহু ভারতীয় ছাত্র সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

রাশিয়াতে অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল গোড়াতেই। তাঁরা ঘনিষ্ঠও ছিলেন। দুজনে ইস্তাহার লিখেছেন। India in transition বইখানাও লিখেছেন দুজনে। সঙ্গে তখন ছিলেন মানবেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী এভ্‌লিন রায় বা শান্তিদেবী। অবনীবাবুর সঙ্গে ১৯২২ সালে কেন যে মানবেন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল জানা যায় না। অবনীনাথ এই সময়েই লুকিয়ে ছদ্মবেশে দেশে এসেছিলেন।

১৯২২ সালের ৫ই নভেম্বর থেকে একমাস পর্যন্ত কমিউনিস্ট চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন চলতে থাকে। লেনিনের জীবিতকালে এই শেষ কংগ্রেস। এতে ভারতের চারজন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তাতে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র একজন। শোনা যায়, এতে নাকি যোগ দেবার কথা ছিল সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধু-পুত্র চিররঞ্জন দাসের। যোগ দেবার কথা ছিল ডাঙ্গেরও। কিন্তু নানা কারণে তাঁরা তখন যেতে পারেন নি। যোগ দিয়েছিলেন নলিনী গুপ্ত, আলি শাহ, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

মাদাম কামার কথাও এই সূত্রে বলা উচিত। প্রথম মহাযুদ্ধ-কালে তাঁকে আর সপরিবারে রাণাজীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ফ্রান্সেরই ভিসি-তে, একটি দুর্গে। এখানে রাণাজীর স্ত্রী ও পুত্র উভয়েই মারা যায়। ১৯১৯ সালে মুক্ত হন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা তখন জেনেভায়। ১৯৩০ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সস্ত্রীক ওখানেই বাস করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তান ভানুমতীও জেনিভাতে থেকে যান, ১৯৩৩ এর ২৩শে আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

মাদাম কামা ১৯৩৩-এর পর হিটলারের অভ্যুদয়ে আশান্বিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এইবার ব্রিটেনের দর্পচূর্ণ হতে যাচ্ছে।

কিন্তু স্বাস্থ্য তখন তাঁর ভেঙে পড়েছে। রাণাজীর চেষ্টায় অনেক কষ্টে তিনি দেশে ফেরার অনুমতি পেলেন। বোম্বাইতে এসে স্বামীর ঘরে স্থান পাননি। উঠেছিলেন দাদাভাই নৌরজীর এক অতি বৃদ্ধা নাতনীর ঘরে। এর কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান। স্বামী শেষ সময়েও দেখা করেন নি। সাভারকর লিখে গেছেন,—'Madam Kama died unnoticed in Bombay amidst ungrateful surrounding'।

মাদাম কামার 'তলোয়ার' পত্রিকার প্রচ্ছদ তখনকার দিনের অনেকেই দেখে ছিলেন। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। ঐ পতাকাকে লক্ষ্য করেই মাদাম কামা তার বিভিন্ন ভাষণে বলতেন,—'This is the flag for which Khudiram and Profulla chaki died.'

রাণাজী অবশ্য পরে দেশে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং প্রমথনাথ দত্তের নামও উল্লেখ করা উচিত। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বিদগ্রামে বাড়ি বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের। যদিও তাঁর বাবা ইশানচন্দ্র জলপাইগুড়িতে উকিল ছিলেন। ১৮৮৮ সালের ১৩ই মে ঐ জলপাইগুড়িতেই বীরেন্দ্রনাথের জন্ম। ১৯০৫-এর দেশাত্মবোধক আন্দোলনে স্কুলের ছাত্র হিসাবে জড়িয়ে পড়েন। বিলাতি কাপড় পোড়ানোর অপরাধে একটি ছাত্রকে হেডমাস্টার বেত মারলে, প্রতিবাদে ঐ স্কুল ছেড়ে দেন। কলকাতার জাতীয় শিক্ষালয়ে এসে ভর্তি হন। শিক্ষকরূপে পান শ্রীঅরবিন্দকে। আর পান রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসেই বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। ১৯১১ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদই তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠান। ১৯১৪ সালে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পেলেন। প্রথম

মহাযুদ্ধ বাঁধবার পর বিনয় কুমার সরকারের ছোট ভাই ধীরেন্দ্রনাথ সরকার আসেন আমেরিকায় জার্মানী থেকে, বার্লিন কমিটির হয়ে 'গদর'-গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ইনি ছিলেন বীরেন্দ্র দাশগুপ্তের সহপাঠী। ধীরেনবাবুর সহায়তায় জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে মির্জা আলি হায়দার নামে এক পাসপোর্ট বার করে বীরেন্দ্রনাথ বার্লিনে চলে গেলেন। এখানে কিছুকাল সামরিক শিক্ষা নিয়ে মৌলানা বরকৎউল্লার সচিব হিসাবে গেলেন ইস্তাম্বুলে। সেখান থেকে জেরুজালেম। সিনাই অঞ্চলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তুর্কি সেনাবাহিনীর 'মেজর' হয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। অসুস্থ অবস্থায় তাকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্র দত্ত সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের স্টকহলমে ভারতীয় বিপ্লবীরা একটি সম্মেলনে মিলিত হন, তাতে খানাখোজে ও বীরেন্দ্র দাশগুপ্তও ছিলেন অন্য অনেকের সঙ্গে। ১৯২৯ সালে তাঁরা মস্কো যান। দলে বরকৎউল্লা, ভূপেন্দ্রনাথ ও খানাখোজে ছাড়া আরও একজন ছিলেন, তিনি ডাঃ মনসুর। মানবেন্দ্রনাথ তখন রুশ দেশে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ১৯১৪ সালে দেশে ফিরে আসেন বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তারপরে আর রাজনীতিতে নিজেকে জড়ান নি।

এবার প্রমথনাথ দত্তের কথা বলা যাক। সুকিয়া ষ্ট্রিটের দত্ত পরিবারে জন্ম। অল্প বয়সেই 'অনুশীলন' সমিতির সংস্রবে আসেন, সামরিক শিক্ষা লাভের আশায় আমেরিকায় চলে যান ১৯০৬ সালে। কিন্তু সামরিক স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে ফ্রান্সে যান। মাদাম কামা ও রাণাজীর চেষ্টায় সৈনিক হয়ে আফ্রিকা থেকে ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়ান। তারপরে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবার পর সাংবাদিক হয়ে আবার যান ইস্তাম্বুলে। এইখানেই দাউদ আলি নাম নেন। সেই থেকে দাউদ আলি দত্ত নামেই তিনিই বিখ্যাত হয়ে পড়েন। পরে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান সীমান্ত

অঞ্চলে ঢুকে ভারতের পথ খুঁজতে গিয়ে সান্ত্রীর গুলিতে পায়ে আঘাত পান। ফলে, ওঁকে ক্রাচ্ নিয়ে চলতে হতো। ইরাণ সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের তুলে দিতে থাকে ইংরেজদের হাতে। প্রমথনাথ ও খানাখোজে একাধিকবার ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়েন, একাধিকবার পালাতে সমর্থ হন। প্রমথনাথ শেষ পর্যন্ত ইরাণের এক পার্বত্য উপজাতির কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন সেদিন। এর পরের দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা হচ্ছে রুশ-বিপ্লব। ভারতীয়দের 'বার্লিন কমিটি' বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ১৯২১ সালে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, খানাখোজে, এঁরা মস্কো যান সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে। তাঁদেরই চেষ্টায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রমথনাথ বা দাউদ আলিকে উদ্ধার করে রাশিয়ায় নিয়ে আসে। খোঁড়া মানুষ, কী কাজে এঁকে লাগানো যায়? 'ইন্সটিটিউট ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ তৈরী হয়েছিল লেলিনের নির্দেশে। এখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলো। বাংলা ভাষাই তার মধ্যে প্রথম। শিক্ষক হলেন প্রমথনাথ। উনি হিন্দী ও উর্দু পড়াতেন। ভেরানোভিকোভা প্রভৃতি হচ্ছেন তাঁর প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। দাউদ আলি নামেই তিনি খ্যাত। বিয়ে করেন এক রুশ মহিলাকে। তাঁর ছেলের নাম ইগর দাউদোভিচ দত্ত, পরে হয়েছিলেন পরমাণু-বিজ্ঞানী। প্রমথনাথ বা দাউদ আলির কথা পরে আর বলা হবে না বলে এখানেই বলে রাখা যাক, ১৯৫৪ সালে ঐ সোভিয়েট দেশেই মৃত্যু হয় কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের প্রমথনাথ দত্তের। মৌলানা বরকৎউল্লার কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনিও আর দেশে ফিরতে পারেন নি, মারা যান ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সানফ্রান্সিস্কোতে। এইসব প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রসঙ্গে অনেকের কথাই মনে আসে, তার মধ্যে কবি হবিব ওয়াফা অন্যতম। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের মতো তাঁরও হৃদয়ে

আবেগ ছিল অদম্য। নজরুলের মতো লেখার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হননি বটে, কিম্বা চারণ কবি মুকুন্দদাসের মতোও ধৃত হন নি। কিন্তু দেশে আর ফিরতে পারেন নি। খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দীপনায় যাঁরা অসীম কষ্ট স্বীকার করে মধ্যপ্রাচ্যের পথে বিভিন্ন দলে রাশিয়া পৌঁছেছিলেন, তাদের মধ্যে শওকৎ উসমানী, নাজির সিদ্দিকি, রহমৎ আলি জাকারিয়া প্রভৃতিদের সঙ্গে এই হবিব ওয়াফাও একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ঐ সোভিয়েত দেশেই যক্ষ্মায় মারা যান হবিব ১৯৩৬ সালে। খানাখোজের কথাও বলা হয়েছে আগে। সুখের বিষয়, তিনি দেশে ফিরতে পেরেছিলেন তাঁর বেলজিয়ান স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। খানাখোজে মারা গেলেন ১৯৬৭ সালে নাগপুরে। সুরেন্দ্র কর আমেরিকার জেলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দেশে যাঁরা ফিরতে পারে নি, তিনি তাঁদের একজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মাণীতে গিয়ে সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। মারা যান ঐ জার্মাণীতে ১৯৩৪ সালে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় কিন্তু দেশে ফিরে আসতে পেরেছিলেন ১৯৩০ সালে। বেশ কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছিলেন। সঙ্গে ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। তিনিও একটি রাজনৈতিক দল গড়েছিলেন এদেশে। মারা যান দেরাদুনে।

এই সব কাহিনী বলতে বলতে সাবিত্রী দেবীর কথা বলা হয় নি। নিবেদিতার মতো আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়ে শ্রীমতী এলিস। তরুণ বয়সে ব্যারিস্টার জাফর আলিকে বিয়ে করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় একাই থাকতেন এলাহাবাদে। পড়াশুনা করতে করতে হিন্দু দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন গভীর ভাবে। তখন তাঁর নতুন নাম হলো,—সাবিত্রীদেবী। বৃদ্ধা এই সাবিত্রীদেবীর আশ্রয়ে আসতেন লুকিয়ে লুকিয়ে বহু বিপ্লবী। তাঁদের মা ছিলেন তিনি, জননীর মতো যত্ন-আত্তি করতেন। 'লাহোর

ষড়যন্ত্র' মামলা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ভগৎ সিং-যতীন দাসকে পুলিশ ধরে ফেলেছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে যশপালকে। এই যশপালকে পরে পুলিশ ১৯৩২ সালে সাবিত্রীদেবীর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে। বিপ্লবীকে আশ্রয় দেবার জন্য সাবিত্রীদেবীরও জেল হয়েছিল,—চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ১৯৩৬ সালে জরাজীর্ণ দেহে জেলখানার বাইরে এসেছিলেন। তার পরে খুবই অসহায়তা ও দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ কটা দিন তাঁর কেটেছিল এই দেশের মাটিতেই।

জাপানে কিন্তু রাসবিহারী চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনি দেশের খুঁটিনাটি সব খবর রাখতেন। তাঁর শাশুড়ী তাঁকে আবার বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কথাটা শুনে ম্লান একটু হেসেছিলেন রাসবিহারী, বলেছিলেন,—তা হয় না মা। তোসিকোকে ভুলবো কেমন করে?

শ্রীমতী সোমা কিন্তু রাসবিহারীকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন। তিনি জানতেন, রাসবিহারী কাজ ছাড়া থাকতে পারেন না, হয় তিনি পড়াশোনা করছেন, নয় লিখছেন, আর নয়তো শিক্ষকতা ছাড়া নানান সভা-সমিতির মাধ্যমে জাপান-ভারত মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করার চেষ্টা করছেন। বলছেন,—এশিয়া এক। এশিয়ার সংহতি না হলে এশিয়া বাঁচবে না।

এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পান শ্রীমতী সোমার কাছে গিয়ে বসেন, ছেলে-মেয়ে দুটিও তাঁকে ঘিরে ধরে। শ্রীমতী সোমাও তাঁকে কাছে বসিয়ে এটা-ওটা খাওয়ান। ওঁর কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন। হিজলী জেলখানার বন্দীদের ওপর গুলি চালালে সারা দেশ জুড়ে ধিক্কার উঠলো, তার ঢেউ এসে পৌঁছলো জাপানে। রাসবিহারী শ্রীমতী সোমাকে বললেন।—জানেন মা, ময়দানে যতীন সেনগুপ্তের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সুভাষ বোস কী বলেছে? **If Bengal lives, who dies? If Bengal dies who lives?**

১৯৩৭ সালে চীন-জাপানের সংঘর্ষকালে রাসবিহারী 'ভারত

স্বাধীনতা সংঘ' স্থাপিত করলেন। 'এশিয়া এশিয়াবাসীর'—এই স্লোগান দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাসবিহারী। তাঁর কাছে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন দুর্নিবার হয়ে দেখা দিলো। দেশের মর্মবাণীও কান পেতে তিনি শুনতে লাগলেন। একটি পুরাণো কথা তাঁর ক্রমাগতই মনে পড়তো। ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অনিল বরণ রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—কবে স্বাধীন হবে, ভারত ?

তিনি বলেছিলেন,—'ভারত স্বাধীন হবে এটা ভগবানের নির্দেশ, তবে সে-সময় এখনো আসে নি।

দশ বছর কেটে গেল তার পর। কিন্তু কখন আসবে সে সময় ? ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করতে থাকেন রাসবিহারী। ১৯৩২-৩৩ সালে সুভাষকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ইয়োরোপে যেতে দেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ১৯৩৪ সালে মুমূর্ষু পিতাকে দেখতে দেশে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়। ছ-সপ্তাহ কাটাবার পর আবার ইয়োরোপ। ১৯৩৬-এর ১১ই এপ্রিল বোম্বাইতে পা দেওয়া মাত্র আবার গ্রেপ্তার। আসন্ন কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল বললেন,—'সমস্ত দেশ জুড়ে যে ব্যাপক ও তীব্র দমন নীতি চল্‌ছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ সুভাষের গ্রেপ্তার।'

দেশ ব্যাপী জনগণের বিক্ষোভ। ভগ্নস্বাস্থ্য সুভাষকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ইংরেজ ঐ ১৯৩৭ সালেই। একটি ছোট্ট ঘটনা। সুভাষচন্দ্রের বাল্যবন্ধু বিপ্লবী শৈলেন ঘোষ বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন। দেশে ফিরতে পারেন নি। এবার ফিরে এসেছেন, সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী। সুভাষের অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীও রয়েছেন। ঢুকলেন নেলী সেনগুপ্তা। ধবধবে শুভ্র বিধবার বেশ। দেশপ্রিয় চলে যাবার পর এই প্রথম দেখা। সুভাষচন্দ্রের চোখে জল দেখা দিলো। নেলী এসে পাশে দাঁড়ালেন। কিন্তু

কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। উপস্থিত সবার চোখই সেই মূর্তিমতী শোকের দিকে তাকিয়ে ভিজে উঠেছিল সেদিন।

আরেকটি ঘটনা। শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে সুভাষ ও গান্ধীজী। গান্ধীজী গম্ভীর মুখে সুভাষকে বলেছিলেন,—'বিপ্লবীদের সংস্রব তোমাকে ছাড়তে হবে'।

—না।

—কেন?

সুভাষ উত্তর দিয়েছিলেন,—'তা হলে সবার আগে আপনার সংস্রবই ছাড়তে হয়।

—আমি কি বিপ্লবী?

সুভাষের উত্তর,—'সব থেকে বড়ো আর বিপজ্জনক।'

একথার তাৎপর্য ১৯৪২-এর আগে বোঝা যায়নি। কিন্তু তার আগে ১৯৩৮-এর কথা কিছু বলা দরকার। এই সালেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান বিশ্বকবি, বলেন,—"সুভাষ, বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে আমি তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।"

অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন সুভাষ, পরের বছরে তাঁর নাম ও পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম সভাপতি রূপে প্রস্তাবিত হওয়ায় একটা সংকট দেখা দিলো। সুভাষ বললেন,—'স্বভাবতই একজন বামপন্থীকে সভাপতি পদে নির্বাচিত হতে দেওয়া দক্ষিণপন্থীদের ইচ্ছা নয়। ওদের আলোচনা ও বোঝাপড়ায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে।'

বলা বাহুল্য, ভোটের ফলে সুভাষই জিতেছিলেন। তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ আহ্বান,—"আমাদের শেষ প্রস্তাব ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করা হোক।"

এই সময় হিন্দুসভার সাহায্যে বীর সাভারকরের সঙ্গে রাসবিহারীর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল গোপনে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত সাভারকরই ছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

ঐ সময় জাপানেও হিন্দুমহাসভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রাসবিহারী। তিনি সাভারকরকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন গোপনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর সাভারকর এই চিঠি দেখিয়েছিলেন সুভাষকে, বলেছিলেন,—কোনো রকমে দেশের বাইরে চলে যান। শত্রুদের হাতে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বন্দী হচ্ছে ও হবে, তাদের নিয়ে দল গঠন করে রাসবিহারীর সঙ্গে একযোগে কাজ করুন। এ ধাক্কা ব্রিটিশ সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না।

এর পরের ঘটনা বিখ্যাত ত্রিপুরী কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতিকে বলা হতো রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি সুভাষ মঞ্চে উঠলেন অসুস্থ শরীরে, রোগজর্জর দেহ নিয়ে, চিকিৎসকদের বারণ না শুনে। একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়ে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক আগেই তৈরি হয়েছিল, তার সংগঠন এবার হয়ে উঠলো জোরদার।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কিছু দিন আগে রাশিয়া আর জার্মাণীতে সন্ধি হয়, ২৫শে আগস্ট ১৯৩৯ সালে। সুভাষ তখন দ্রুতগতিতে তাঁর কাজ করে চলেছেন। মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করালেন বিশ্বকবিকে দিয়ে। তারপরে রামগড় কংগ্রেস। কংগ্রেসীরা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করে জাঁকজমকে সভা করবেন। অন্যদিকে কিষাণ নগরে সুভাষচন্দ্র করছেন আপোষবিরোধীদের নিয়ে সম্মেলন, কংগ্রেস-সম্মেলনের আগে। তারপরে আরও একটি কাজ। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক আর মুসলিম লীগের মধ্যে প্যাক্ট গড়ে তোলা। মেয়র হলেন আবদার রহমন সিদ্দকী, অল্ডারম্যান—সুভাষ। নেতারা সচকিত হলেন এই প্যাক্টে। তাঁরা যা পারলেন না, সুভাষ তা অতো সহজে করে বসলেন কী ভাবে? গান্ধী মুসলিম লীগের কর্তা মহম্মদ আলি জিন্নাকে যে-কোনো সর্ত, অর্থাৎ 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিতে চেয়েছিলেন,

তবু তিনি রাজী হননি। তারপরে আসে নাগপুরের সম্মেলন। নাগপুরের কাজ সেরে সুভাষ গেলেন ওয়ার্দায়, গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। শেষ সাক্ষাৎ।

নাগপুরে সুভাষ বলেছিলেন,—All power to the Indian people.

পরে আর এক বিবৃতিতে বললেন,—'অস্থায়ী জাতীয় সরকার এখুনি তৈরী করে তার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাতে হবে। সংগ্রামের গতি যেন কমে না আসে। আমরা বিশ্বাস করি না যে, বিনা সংগ্রামে স্বরাজ আসবে।

এ সময়ে সুভাষের অন্ধকূপহত্যার কলঙ্কী স্মৃতিচিহ্ন-অপসারণের আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় আলিপুরে শিখ রেজিমেণ্ট ছিল। ১৯৪০ এর প্রথম দিককার কথা। 'দেশদর্পণ'-এর সম্পাদক নিরঞ্জন সিং তালিব রবি সেনকে খবর দেন,—'ওরা কলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়।'

রবি সেন গোপনে ওদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বিদ্রোহের কথা হয়। তাঁরা সুভাষের নেতৃত্বে বিশ্বাসী, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও চান। দেখা হলোও গোপনে। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই শিখ-রেজিমেন্টকে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হয় আম্বালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সীমান্তে পাঠাবার হুকুম আসতেই তারা তা অগ্রাহ্য করে। কোর্ট মার্শালে অনেককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়, অনেককে বন্দী করা হয়। বন্দীদের কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে এনে পরে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সুভাষবাবু খুব গোপনে বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন। সাভারকর ও রাসবিহারীর কথা অনুক্ষণ তাঁর মনে বাজছিল। জাপানী কন্‌সালের অফিসের মারফৎ জাপান যাওয়ার চেষ্টা করলেন, নানা কারণে ফলপ্রসূ হলো না।

সুভাষচন্দ্র বললেন, ১৯৪০-এর ৩রা জুলাই আমরা সিরাজদ্দৌল্লা-

দিবস পালন করবো। মিথ্যা কলঙ্কের ঐ নিরীখ 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম প্রান্ত থেকে উৎখাত করবোই।

কিন্তু ২রা জুলাই ইংরেজ তাঁকে বন্দী করলো। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। তার আগে বিলেতে, ঐ সালেরই ১৩ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো। ১৯১৯-এর জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অনুষ্ঠাতা মাইকেল ও-ডায়ার তখন অবসর জীবন যাপন করছিলেন। ক্যাক্সটন হলের টিউডর রুমের একটি শোভায় এসে যোগ দিলেন তিনি। সভা যখন শেষ হলো, যখন সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় অতর্কিতে ও-ডায়ারের ওপর একজন গুলি চালালো, পরপর কয়েকটি গুলি।

জালিওয়ানাবাগের প্রতিশোধ! একটি শিখ যুবক। উধম সিং। বিলেতেই বিচার হয় তার। ১৯৪০-এর ১২ই জুন তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই খবরে সারা ভারতের জনগণ যে চকিত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই!

সুভাষচন্দ্রের কথা বলছিলাম। জেলে বন্দী, ঐ সালেরই ২৮শে নভেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নিবাচিত হলেন। আর তারপর দিন থেকেই তিনি, বাংলার গভর্ণর স্যার জন হার্বাটকে যে চরম পত্র দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে আমৃত্যু অনশন শুরু করলেন। ৫ই ডিসেম্বর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ছেড়ে দেওয়ার পর রুদ্ধ কক্ষে সুভাষচন্দ্র আত্মসমাহিত হয়ে বাস করতে থাকেন। কোন কথা নেই, কিছু নেই, অখণ্ড মৌনভাব।

তাঁর অন্তর্ধানের তারিখ হচ্ছে ১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু তাঁকে রাত সওয়া একটায় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে যান পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। শিশির আর সুভাষচন্দ্র ছাড়া গাড়িতে কেউ ছিল না। তাঁর পরণে ছিল পশ্চিমা মুসলমানের পোষাক। সঙ্গে বিছানা, স্যুটকেশ ও একটি অ্যাটাচি

কেস্। শিশির বসু বলেন,—'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ি ছুটলো। সমস্ত রাত চলার পর ভোরবেলা আমরা এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। ধানবাদের কাছে, এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সন্ধ্যাবেলা আবার যাত্রা শুরু। অনেক রাত্রে পৌঁছলাম গোমোতে। শেষ রাতে ট্রেনে তিনি উত্তর ভারতের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।'

উত্তমচাঁদের একটি রেডিওর দোকান ছিল কাবুলে। তিনিই ওঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,—তিনি মৌলবীর বেশে পেশোয়ারে আসেন। এসে মৌলবীর শেরওয়ানি ও ফেজের বদলে পাঠানোর পোশাক পরলেন। রহমৎ খাঁ বলে বিশ্বাসী এক ব্যক্তির সঙ্গে তারপরে তিনি রওনা হলেন কাবুলের দিকে। নানান দুর্গম পথের পরে কাবুল নদী। কতগুলি চামড়ার ভিস্তি একসঙ্গে বেঁধে নদী পার। বাক্স বোঝাই একটি লরীর ওপরে হু-হু-করা ঠাণ্ডায় কোনক্রমে বসে রাত কাটানো। ভোরবেলা আফগান-গোয়েন্দার প্রশ্ন। রহমতের উত্তর,—আমার ভাই জিয়াউদ্দীন, হাবা ও কালা। আলী সাহেব মসজিদে তীর্থ করিয়ে আনতে যাচ্ছি, যদি রোগ সারে।

এইভাবে কাবুলে আসা এবং উত্তমচাঁদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা। দেশে তখন তাঁকে নিয়ে তোলপাড় চলছে। কাগজ নিয়ে হকার হাঁকছে,—টেলিগ্রাম। সুভাষবাবুর অন্তর্ধান!

সুভাষচন্দ্র ওদিকে কাবুলে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর ইটালির রাষ্ট্রদূত ভবনের ব্যবস্থায় রাশিয়া হয়ে বার্লিনে পৌঁছান একজন ইটালিয়ানের ছদ্মবেশে। বার্লিনে তখন হিটলারের রাজত্ব এবং যুদ্ধের সময়। এ সময় জার্মাণীর সদিচ্ছা, তাঁর জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য, আদায় করা অতো সহজ ছিল না। হাল না ছেড়ে তবু তিনি চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হলেন তিনি। স্বাধীন ভারতের একটি সংস্থা গঠিত হলো জার্মাণীর বুকে ঐ ১৯৪১ সালে। তার দেশবাসীও তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো বার্লিন রেডিও থেকে, তাঁর অন্তর্ধানের নয় মাস পরে। জার্মাণ

অঞ্চলের বন্দী ভারতীয় সৈনিক ও ভারতীয় সাধারণ মানুষদের নিয়ে গঠন করা হলো স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী, আর তার সর্বাধিনায়ক রূপে সুভাষচন্দ্রের নাম হলো 'নেতাজী'।

১৯৪১-এর ৮ই ডিসেম্বরে জাপানও যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ফলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায়। জাপানী বিমান ও নৌবহর একযোগে পার্ল-হারবার আক্রমণ করে মার্কিণ ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় ও জাপানী সৈন্য মালয়ে অবতরণ করে।

২৭শে ডিসেম্বর রাসবিহারী আনন্দমোহন সহায় প্রভৃতিকে নিয়ে জাপানপ্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এক সমিতি গঠন করেন।

"এই সময় আমার দাদুও ওখানে ছিলেন",—বলে শেফালী আমার (অর্থাৎ শ্রীসঞ্জয়ের) মুখের দিকে তাকালো।

আমি বললাম,—"তা বলে থামলে চলবে না।"

—কী করবো ?

—বইপত্তর ঘাঁটো।

শেফালী বললে,—তার থেকে দাদুকে ধরলে হয় না, দাদু এবার হয়ত কিছু বলতে পারবে।

—সাল তারিখ ?

—সেগুলো আমরা ওঁর ডায়েরী বা বই দেখে বসিয়ে নেবো।

—ঠিক আছে।

আমরা দুজন সুবিধামতো দাদুকে ধরে বসলাম। উনি আমাদের কাজ কদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন। কিছু বলেন নি, কেমন যেন চুপচাপ, আত্মসমাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা কাছে গিয়ে কিছুটা আলোচনা করতেই যেন সম্বিত ফিরে এলো। স্মৃতিও যেন ফিরে এলো সঙ্গে সঙ্গে। বলতে লাগলেন—

তোয়ামা রাসবিহারীকে জাপানের ওয়ার অফিস-এর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তাঁদেরই অনুরোধে রাসবিহারী তাঁর নিজের স্কীম পেশ করেন। এতে ছিল দুটি

প্রস্তাব,—মালয়ে ভারতীয় বাহিনী গঠন এবং এশিয়ার সমস্ত প্রবাসী ও নির্বাসিত ভারতীয়দের নিয়ে একটি ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক সমিতি গঠন।

অনেক টানাপোড়েনের পর তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলো। ডিসেম্বরে পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের মোহন সিং-এর হাতে সমস্ত বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের কর্তৃত্বভার তুলে দেওয়া হলো। ১৯৪২-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন হলো। পরদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী তেজো ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। ৯ই ও ১০ই মার্চ সিঙ্গাপুরে বিশিষ্ট ভারতীয়রা সভা করলেন। রাসবিহারী প্রস্তাব পাঠালেন, পূর্ব এশিয়ার বিশিষ্ট ভারতীয়দের সভা হোক টোকিওতে। ২৮ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত তাঁর সভাপতিত্বে এই সভা হলো। জুন মাসে ব্যাঙ্ককে আরও বড়ো আকারে সভা করার প্রস্তাবও গৃহীত হলো। এই সভায় ভারতীয় বাহিনী গড়বে ভারতীয় স্বাধীনতা সংসদ, এই প্রস্তাব পাশ করা হয়। রাসবিহারীকে সভাপতি ও আরও বার-ভনকে সদস্য করে কাউন্সিল ও অ্যাকশন' তৈরী হলো। ঠিক হলো ভারতীয় বাহিনীর সর্ববিধ কর্তৃত্ব থাকবে ভারতীয়দের হাতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারত বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই যে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হবে, তার স্বীকৃতি দেবে জাপান সরকার, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে কোনো বিদেশীর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ থাকবে না। এই সভায় আরও একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পূর্ব এশিয়ায় আসবার জন্য আহ্বান করা হোক।

রাসবিহারী জার্মাণীতে সুভাষচন্দ্রকে রেডিও-টেলিফোন যোগে সেই মর্মে জানিয়ে দিতে দেরি করেন নি। কিন্তু ব্যাঙ্কক প্রস্তাব নিয়ে জাপান সরকারের সঙ্গে মন কষাকষি দেখা দিলো। মোহন সিং-কে জাপানীরা গ্রেপ্তার করলো। রাসবিহারীর সঙ্গেও তাঁর

মতান্তর হয়েছিলো। মালয়ের মিঃ রাঘবনের সঙ্গে জাপানীদের মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীও হতাশাগ্রস্ত।

তার আগে, ১৯৪২-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাসবিহারী মণীষী তোয়ামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, তখন তাঁর ৮৮ বছর বয়স, দু-হাত তুলে ওঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বলেছিলেন,—ভারতের স্বাধীনতা অচিরেই লব্ধ হোক।

এই সময় একটা কথা বলা দরকার। ভারতে ব্রিটেনের দূত ক্রীপস্ সাহেব আসেন একটা প্রস্তাব নিয়ে। ভারত যদি যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে সাহায্য করে, তাহলে অখণ্ড ভারতকে অখণ্ড স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কোনো প্রসঙ্গই ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে। কিন্তু নেতারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। এই সময়েই বিখ্যাত আগস্ট আন্দোলনের শুরু। অহিংস গান্ধীজীর ঐতিহাসিক উক্তি, 'করেঙ্গে ইয়া মরঙ্গে'।

ব্রিটিশ সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে দেশে যে ধরপাকড় আর দমন পীড়ন শুরু করলো, তা তুলনাবিহীন। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে দেশে এনেছিল তারা শ্মশানের হাহাকার।

একজনের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৪০ সালে হংকং-এর ব্রিটিশের জেল থেকে তিনজন ভারতীয় সৈনিক পালিয়ে যান। মালয় প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করাই ছিল এঁদের প্রথম কাজ। জাপানীদের সাহায্যে কোবে হয়ে ব্যাঙ্ককে হাজির হলে ওখানকার ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের অমর সিং ওদের খাতির-যত্ন করেন। এই সূত্রে ওখানকার জাপানী দূতের সঙ্গে অমর সিং ও তাঁর সহকারী প্রীতম সিং-এর আলাপ পরিচয় হয়। তার পরে যুদ্ধ বাঁধলে মেজর হুজিয়ারা টোকিও থেকে ব্যাঙ্ককে এসে প্রীতম সিং-এর সঙ্গে মিলিত হন। যুদ্ধে ওখানে ইংরেজ-পক্ষীয় সৈন্যদের পরাজয় করে জাপানী সৈন্য এগিয়ে গেলে

কর্তৃপক্ষ প্রীতম সিংকে বললেন,—যুদ্ধে যেসব ভারতীয় সৈন্য ধরা পড়েছে, তাদের তোমাদের স্বাধীনতা সঙ্ঘে নিয়ে নাও, আর নগর-রক্ষার ভার দাও।

প্রীতম সিং বেছে মোহন সিং-এর ওপর ভার দেন। মোহন সিং এর কুশলতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে ওখানে। তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়েই তাঁকে ভারতীয় সৈন্যদের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এরপরে টোকিও থেকে আসে রাসবিহারীর আহ্বান। মোহন সিং, অমর সিং প্রভৃতিদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হয়, একটি শুভেচ্ছা-দল প্রথমে পাঠানো হোক।

সেইমতো ঐ দল সায়গনে আসে। এখান থেকে দুটি বিমানে ওঁরা রওনা হন। প্রথম বিমানটি ছাড়বার দুদিন পরে দ্বিতীয় বিমানটি যাত্রা করে, কিন্তু মাঝপথে দুর্ঘটনায় পড়ে। মারা যান প্রীতম সিং, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, আয়ার ও আক্রাম খাঁ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম শহীদ বলতে পারা যায় এঁদেরই। প্রধানমন্ত্রী তোজো পর্যন্ত এঁদের শোক-শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন।

এর পরে এক মহতী সভা। রাসবিহারীকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব দান। রাসবিহারীর ব্যাঙ্কক যাত্রা। এবং যাত্রার পূর্বে শ্বশুরালয়ে গমন। মাসাহিদে তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়েছে, তেতিকো কিশোরী। ওদের কাছে বিদায় নিয়ে টোকিও স্টেশনে এসে রাসবিহারী দেখলেন, ছেলে ঠিক এসেছে বাবাকে বিদায় দিতে। কিন্তু সে-ই ছিল শেষ বিদায়। দুজনে আর দেখা হয়নি জীবনে।

ব্যাঙ্ককের মহাসভাই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত করেছিল। এই সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হলো ব্যাঙ্ককে, আর আজাদ হিন্দ ফৌজের,—সিঙ্গাপুরে। এই সভায় যে সব বিপ্লবী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন সহায় একজন। ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাসিত। ভারত থেকে আমেরিকা যাবার পথে

কোবেতে নামেন এবং এই কোবেতে থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ করছিলেন, পরে রাসবিহারীর সঙ্গে যুক্ত হন। সত্যানন্দ পুরী ছিলেন ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক।

১৯৪২ সালে জাপানী সৈন্য মাত্র দু-মাসের মধ্যে রেঙ্গুন, মান্দালয়, লাসিও প্রভৃতি অধিকার করে ফেলেছে। ৮ই আগস্টের গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া'—প্রস্তাব সারা ভারত ব্যাপী বিদ্যুতের চমক সৃষ্টি করলো। পরদিন অবশ্য সকালেই গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু এসব খবর আগেই বলা হয়ে গেছে। ৪২-এর আন্দোলন দেশের এক বিশেষ ঐতিহাসিক অধ্যায়। মেদিনীপুরের বীরঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার নাম এই অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

রাসবিহারী আজাদ-হিন্দ-ফৌজের পুনর্গঠনের কাজে মন দিয়েছেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনপণ চেষ্টায় ফৌজ আবার শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ওদিকে মাসাহিদে বা রাসবিহারীর প্রিয় পুত্র অশোক বাবাকে দেখতে পায় না, কিন্তু বাবার কথা মনে রেখেই সে যুদ্ধে যোগ দিয়ে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার কর্ম-কুশলতার জন্য তাকে নয়-নম্বর ট্যাঙ্ক বিভাগের সর্বাধিনায়ক করা হয়। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে সে মারা যায়। সিঙ্গাপুরে বসে রাসবিহারী তাঁর এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন।

কিন্তু তখন শোক করার সময় নয়। বুকের ব্যথা বুকে রেখে রাসবিহারী কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই সময়ই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ প্রথম দেখা দেয়। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করলে চলবে কেন? এই মুহূর্তে সুভাষকে এখানে না আনলে উপায় নেই। আজীবনের সব স্বপ্ন তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন,—**I was a fighter. One fight more. The last and the best.**

সুভাষের প্রসঙ্গে একটি কথা শোনা যায়। একজন লেখক তা বলেও গেলেন। রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে দেশ থেকেই সরাসরি জাপানে আনবার চেষ্টা করেছিলেন একবার। তখনো জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। দেবনাথ দাসকে তিনি পাঠিয়েও ছিলেন এই উদ্দেশ্যে। দাস ছদ্মবেশে লুকিয়ে একটি জাপানী জাহাজে এসে আকিয়াবে নামেন। জাপানের কন্‌স্যুলেট জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই স্থির হয়েছিল যে, তিনি একটি জাপানী জাহাজে করে সুভাষচন্দ্রকে সরাসরি আকিয়াবে পাঠিয়ে দেবেন। আকিয়াব থেকে জাপানী প্লেনে করে দেবনাথ তাঁকে একেবারে টোকিও নিয়ে আসবে। আকিয়াবে যা ব্যবস্থা করবার তা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জাপানের কন্‌স্যুলেট জেনারেলই কিভাবে পেরিয়ে গেলেন। তখন যদি রাসবিহারীর এই প্ল্যানটা কার্যকরী হতো, তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভাগ্য অন্যরকম হয়ে দাঁড়াতো।

যাইহোক, নেতাজী অনেক কাণ্ডের পর এক জার্মাণ সাবমেরিনে রওনা দিয়েছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে এতোটা পথ জলপথে আসা তখন খুবই বিপজ্জনক। তবু সেই বিপদের মধ্যেই পা বাড়ালেন নেতাজী। শত্রু-পরিবেষ্টিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে, আফ্রিকা হয়ে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে সুমাত্রার কাছ দিয়ে একেবারে পেনাং। পুরো তিনমাস লেগেছিল সময়। পেনাং থেকে বিমানে জাপান। টোকিওতে প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে দেখা করলেন। বেতার ভাষণ দিলেন। তারপরে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন ১৯৪৩-এর ২রা জুলাই। দু-দিন পরে এক বিরাট জনসভায় রাসবিহারী নেতৃত্বভার তুলে দিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে, যাঁর পথ চেয়ে দীর্ঘদিন তিনি অপেক্ষা করে আছেন।

নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ সরকার স্থাপিত হলো, নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠলো আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। সৈন্যদের সর্বাধিনায়ক রূপে প্রথমেই যে স্লোগান বা উদ্দীপক বাণী তিনি দিয়েছিলেন,

তাহলো,—"চলো দিল্লী।" আর অভিবাদনের ঐতিহাসিক রীতি প্রবর্তিত করলেন,—'জয় হিন্দ।' তাঁর মন্ত্রিসভা ছিল এইরূপ:

রাসবিহারী বসু—প্রধান উপদেষ্টা।

সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, সমর মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি।

এস-এ আয়ার—প্রচার মন্ত্রী।

লেঃ কর্ণেল ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী-সংগঠন বিভাগীয় মন্ত্রী।

লেঃ কর্ণেল এ-সি-চ্যাটার্জী—অর্থ মন্ত্রী।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি—কর্ণেল শাহ নওয়াজ, লেঃ কর্ণেল জে-কে-ভোঁসলে, এ-পি লোকনাথন, আজিজ আহমদ, এন-এস-ভগত, গুলজারা সিং, এম-জেড-কিয়ানী, আহসান কাদির।

আনন্দমোহন সহায়—সেক্রেটারি (মন্ত্রীপদের সমতুল্য)।

আইন বিষয়ক উপদেষ্টা—এ-এন-সরকার।

অন্যান্য উপদেষ্টা—দেবনাথ দাস, সর্দার ঈশ্বর সিং, করিম গণি, ডি-এম-খান, জে-থিবি ও এ ইয়েলাপ্পা।

এর পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি। নেতাজীর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীন মাটিতে পদার্পণ। ইম্ফল ও কোহিমা।

ওদিকে রাসবিহারী ফিরে এসেছেন টোকিওতে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে। তোমাদের বলবো কী, প্রথম দেখে তাঁকে চিন্‌তে পারি নি! জীর্ণ, শীর্ণ, বিপর্যস্ত চেহারা। অসুস্থ হয়ে শীগ্‌গিরই শয্যা নিলেন। প্রাণপাত করে সেবা করেন তাঁর মেয়ে, তাঁর শ্বাশুড়ী শ্রীমতী কোকো সোমা। কিন্তু রোগ ক্রমশ বেড়েই চললো। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা,—স্বাধীন ভারতের মাটিতে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন।

বিধি বাম। নেতাজীর কাছ থেকে খবর এলো,—'মুক্তিসেনা কোহিমা ও ইম্ফল রণক্ষেত্র থেকে পিছু হট্‌তে বাধ্য হয়েছে।'

এ নিদারুণ দুঃসংবাদে নির্বাক হয়ে গেলেন রাসবিহারী, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারি

রাসবিহারী মহাপ্রয়াণ করলেন। তেতুকো ও শ্রীসোমা শোকে মুহ্যমান। সমগ্র জাপান শোকদিবস পালন করলো। নেতাজী বেতারে বললেন,—"আজ তিনি নেই। এ যে কতো বড়ো 'নেই', তা আমার মতো করে আর কেউ বুঝবে না। এই দুর্দিনে তাঁকে খুবই প্রয়োজন ছিল।"

সাভাকার বললেন,—'যাঁরা বলেন ১৯৪২-এর আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে, তাঁরা হাস্যকর কথা বলেন। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই দিন থেকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, যে-দিন রাসবিহারী ও নেতাজী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ রোপন করতে সমর্থ হয়েছেন।'

এরপর আসে ১৯৪৬-এর কথা। ১৬ই মে বিলাতের মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হলো। এ প্রস্তাবে ভারতবিভাগের কথা তখন ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ এটা গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দ তা গ্রহণ করেন নি। বিলাতের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশ সরকারের শেষতম প্রস্তাব লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন ঘোষণা করলেন, তখন কী কংগ্রেস, কী মুসলিম লীগ,—তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না। এ প্রস্তাবে ভারত ভাগ করার কথা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ শুনে বলেছিলেন,—'Not a solution but an ordeal.

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবসে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। এ উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন,—"ভারতের অভ্যুত্থান স্থূল স্বার্থ-সেবার জন্য নয়, কেবল নিজের প্রসার, মহত্ব, শক্তি, সমৃদ্ধিলাভের জন্য নয়, যদিও এ সমস্ত কিছুও অবহেলা করা উচিত হবে না,—তবে তার জীবনধারণ হবে ভগবানের জন্য, বিশ্বের জন্য, সকল মানবজাতির সহায় ও নেতারূপে। এইসব আকাঙ্ক্ষা, স্বাভাবিক ক্রম অনুযায়ী হচ্ছে নীচের মতো :

(১) এক বিপ্লব, যার ফলে ভারতের হবে মুক্তি ও ঐক্য ;

(২) এশিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি।

(৩) মানবের জন্য একটি নতুন মতের উজ্জ্বলতর জীবনধারা, তার পূর্ণরূপ বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের ওপরে।

(৪) ভারতবর্ষ বিশ্বকে দেবে তার অধ্যাত্ম চেতনা।

(৫) সর্বশেষে এক ঊর্দ্ধতর চেতনায় মানবের উত্তরণ।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজীর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষেও শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন,—"যে মহাশক্তি স্বাধীনতা দিয়েছে, সেই শক্তিই আনবে ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের হবে। জননী তাঁর চারদিকে তাঁর সন্তানদের একত্রিত কববেন, তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে এক অখণ্ড জাতীয় জীবনের সমষ্টিগত একমুখী সামর্থ্যে গেঁথে তুলবেন।"

যখন ওপরের কথাগুলো পড়বার পর আর পড়বার মতো কিছু নেই বলে শেফালী নির্বাক হয়ে গেল, তখন সে, আমি আর দাদু, দাদুর ঘরে বসেছিলাম। বিকেলের আলো নিষ্প্রভ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, পিছনের বাগানের গাছে কাকগুলো 'কা-কা' করে উঠছিলো। আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারছিলাম না অনেকক্ষণ। শেষের দিকে শেফালীকে আমি কিছুটা সাহায্য করছিলাম বই পত্তর বা দাদুর ডায়েরী ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাই আমিও জানি, আমাদের উপকরণ সব শেষ। আর লেখার মতো কোনো সূত্র কোথাও আমাদের হাতের কাছে নেই। এখন একমাত্র যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, সে হচ্ছে দাদুর স্মৃতি।

দাদু চুপচাপ বসে আছেন। হয়ত স্মৃতির অবগাহনে নিজেই মগ্ন হয়ে গেছেন, আমাদের দিকে চেয়ে থাকলেও দৃষ্টি আমাদের ওপরে নেই। আমাদের দুজনকে ছাড়িয়ে সে-দৃষ্টি অনেক দূরে চলে গেছে।

ঘর অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু হাতের কাছে স্যুইচ্‌টা থাকা সত্ত্বেও শেফালী তাতে যখন হাত দিচ্ছে না, তখন আমিই বা অযথা আলো জ্বালাতে যাই কেন?

কিন্তু সময় তো সত্যিই কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না! নিতাইয়ের মা চা-টা নিয়ে এসে ঢুকলো, আলোটা হাত বাড়িয়ে জ্বেলে দিলো নিতাই। আমাদের স্বপ্নের ঘোর যেন সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল। দাদু চমক ভেঙ্গে একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর নিতাই আর নিতাইয়ের মা চলে গেলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন,—কতো কথাই না বাকী রয়ে গেল। আমি এবার সুযোগ পেলাম প্রসঙ্গ উত্থাপন করার। বললাম,—জাপানে জয়সোয়াল বা রাসবিহারী ছাড়া দেশের আর কোনো বিপ্লবীকে আপনি দেখেন নি দাদু?

দাদু মুহূর্তে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। শেফালী আগ্রহান্বিত হয়ে তাকালো। দাদু বলতে লাগলেন,—সে কী একজন! অনেককেই দেখেছি!

দাদু একটু থেমে থেকে তারপরে বলতে লাগলেন,—আমি তখন সামান্য বালক মাত্র। কলেজ স্কোয়ারে একজনকে বক্তৃতা দিতে দেখতাম। তিনি বক্তৃতা দিতেন ইংরেজীতে, আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তবু অন্য অনেকের সঙ্গে শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম। বঙ্গভঙ্গ-রোধের আন্দোলন বা স্বদেশী বয়কটের জোয়ার আসবার আগেকার ঘটনা। বিদেশী শাসন ও শোষণ আমাদের কী সর্বনাশ করছে, ভদ্রলোক নাকি তাঁর বক্তৃতায় এই সবই বলতেন জ্বালাময়ী ভাষায়। বড়োদের মুখে আলোচনা শুনেই আমরা কয়েকটি বালক মিলে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। এঁর নাম ছিল,—টহলরাম গঙ্গারাম। ডেরা-ইসমাইল খাঁ-তে বাড়ি। উচ্চ শিক্ষিত। আই-সি-এস পরীক্ষা দিয়েছিলেন বিলাতে গিয়ে, কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলতেন বলে ও-পরীক্ষা আর তাঁকে পাশ করতে দেওয়া হয়নি।

উনি কী সূত্রে কেমন করে কলকাতায় এসেছিলেন জানি না, কিন্তু সেই ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে ওঁর নাম খুব শোনা যেতো।

তাঁকে গুণ্ডা লাগিয়ে মারধর করা হয়। তারপরে ফিরিঙ্গি কতগুলি ছেলে এসে একদিন ওঁর গায়ে মলমূত্র ঢেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। "সঞ্জীবনী" পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র নিজে এসে তাঁকে সেবা করেন। নিজের হাতে জল-টল ঢেলে শরীর থেকে ময়লা পরিষ্কার করে দেন।

দাদু এরপর বললেন, তখনকার আরও একজনের কথা। বললেন,—এঁর কথা আগেই বলা হয়েছে, তবু আর একটু শোনো। ইনি হচ্ছেন 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্র বা পি-মিত্র। বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়বার সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আলাপ-আলোচনা ও পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবাদের স্ফূরণ। দল গড়ার ইচ্ছা। সে সময় ফরাসী ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল। প্রমথবাবু যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লিখিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ধি হয়ে যুদ্ধ থেমে যায় বলে আর যেতে পারেন নি। দেশে ফিরে এসে চাষীদের নিয়ে এক বিরাট দল গড়েন। শরীরচর্চা, লাঠি-খেলা,—এইসব ছিল ওইদলের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর বাবা তাঁকে ধরে আবার বিলাতে পাঠিয়ে দেন। এবার ফিরে আসেন ব্যারিস্টার হয়ে। জগৎপুর আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ। তাঁরই অনুশীলন-তত্ত্বের প্রেরণায় যে মিত্র মশায় অনুশীলনের দল গড়ে তোলেন একথা আগেই বলেছি। যোগীপুরুষ, যোগে ভারত স্বাধীন হবে, তরবারিতে নয়,—শেষের দিকে এই বিশ্বাসই তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। তাঁর শিষ্যস্থানীয় 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র আশুতোষ দাশগুপ্তকেও আমি দেখেছিলাম। দেখেছিলাম ঢাকার 'অনুশীলন'-এর নেতা পুলিন দাসকেও।

আর একটি মানুষের কথাও জানতাম। বারীন্দ্র ঘোষ-

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-উল্লাসকর দত্তের সহকর্মী,—দেবব্রত বসু। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী। ইনি পরে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, নাম হয়েছিল—প্রজ্ঞানন্দ। বিপ্লবী-জীবনে আসবার সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ সালের কথা। কটকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন, ওখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ব্রাহ্ম। একবার পুরী বেড়াতে গিয়ে ফেরার সময় তাঁরই বাড়িতে উঠেছিলেন দেবব্রতবাবু। কটকে এইভাবে বিপ্লবীদের একটি ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ধীরেনবাবু তো ছিলেনই, বিশ্বনাথ কর বলে একজন ছিলেন, ছিলেন আরও ওড়িয়া ও প্রবাসী বাঙালী, দুই-ই। একদল ছাত্রও ছিল। বাহ্যতঃ একটি শরীর-চর্চার আখড়া তৈরী হয়। অন্তরালে চলতো আসল কাজ। এই আখড়ারই একটি ছেলে, অধরচন্দ্র নস্কর, কটকের সার্ভে স্কুলের ছাত্র, দেবব্রতর কথাবার্তায় উদ্দীপ্ত হয়ে কলকাতায় চলে আসে। অধর পরে জাপান হয়ে আমেরিকা গিয়ে কৃষিবিদ্যা শিখে দেশে ফিরে আসে। এই অধর নস্করকে প্রমথনাথ* মিত্র খুবই পছন্দ করতেন। কটকে ধীরেনবাবুই ছিলেন তখনকার দিনে দলের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। তাঁর বাড়িতে বাংলার বিপ্লবীদের যাতায়াত ছিল। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) গিয়েছিলেন, বারীন্দ্রকুমার গিয়েছিলেন। তারপরে পাঠানো হয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে। র‍্যাভেন্‌শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন রাও, ত্রৈলোক্য মিত্র,—এঁরাও দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন। আবার ঠিক ঐ সময়েই কলকাতা থেকে সরলাদেবী কটকে গিয়ে উৎকল নেতা মধুসূদন দাসের বাড়িতে উঠেছিলেন। মধুসূদনবাবুর পালিতা কন্যা শৈলবালা ছিলেন বাঙালী এবং সরলাদেবীর বান্ধবী। এঁদের যোগাযোগে আরও একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল কটকে। আমি এসব কথা শুনেছিলাম ঐ অধর নস্করের কাছ থেকে।

দাদু এরপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপরে একসময়

হঠাৎ কি যেন মনে পড়েছে, এমনিভাবে বলতে থাকেন,—আরও একজনের কথা বলতে পারি। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রায় সারাটা জীবন কেটেছে জেলে। পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করেও ওঁকে দমাতে পারেনি। ১৯১৬ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সংগ্রামও করে গেছেন, জেলেও খেটে গেছেন ক্রমাগত। ১৯৪৫ সালে জেলের ভিতরে মরণপণ অনশন শুরু করেছিলেন। এঁর কাজ চলতো প্রধানত বাংলার বাইরে।

আরও একজন আদর্শবাদী দেশসেবক ছিলেন, বগুড়ার যতীন্দ্রমোহন রায়,—দাদু বললেন,—বগুড়ায় তাঁর 'গণমঙ্গল আশ্রম' সারা ভারত জুড়ে নাম করেছিল। আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক যতীন্দ্রমোহনকে সবাই শ্রদ্ধা করতো তাঁর অনাবিল চরিত্রের গুণে। ১৯২৩ সালে যখন তাঁর 'গণমঙ্গল' এর প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তার ভিত প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন চারণ কবি মুকুন্দদাস। এই মুকুন্দ দাস ও ভূষণ দাসের স্বদেশী যাত্রা সেদিন দেশব্যাপী যে কী উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল তা আর কী বলবো। এঁরা নিজেদের গান ছাড়া অন্য কবিগানও গাইতেন। সুশীল সেনকে কিংসফোর্ডের আদালতে বেত মারার ঘটনার পর কাব্য বিশারদ গান লিখেছিলেন,—

আমায় বেত মেরে কি, মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মাকে ফেলে ?

এই গান ভূষণ দাসও গাইতেন। নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া, কিম্বা, 'কারার ওই লৌহ-কপাট' মুকুন্দদাস অনেকবার গেয়েছেন তাঁর যাত্রার আসরে। তিনি স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের 'স্বদেশ-স্বদেশ করিস কারে, এদেশ তোদের নয়,'-ও গেয়েছেন।

দাদু বলতে লাগলেন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও বাঘা

যতীনদের যুগে একজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ছিলেন। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও হেমচন্দ্র ঘোষের নামও এই সঙ্গে করা উচিত। পরবর্তী যুগে সন্তোষকুমার মিত্র, সুবোধ লাহিড়ী—এঁদেরও আমি দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম আবুল কালাম আজাদকে।

আজাদ সাহেবের নাম তোমরা জানো, কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের কাহিনী শুনলে তোমরা মানুষটার পরিচয় পুরোপুরি পেতে পারবে। ওঁর জন্ম মক্কায়, ১৮৮৮ সালে, এক অভিজাত পরিবারে। জন্মের দু বছর পরে ওঁর বাবা সপরিবারে চলে আসেন সুদূর মক্কা থেকে কলকাতায়। আসার একটা কারণ ছিল। জেড্ডাতে পড়ে গিয়ে তাঁর একটা পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। সেটা ঠিকমতো বসেনি। তাই তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয় কলকাতায় চলে যেতে। সেখানে সার্জেনরা ঠিকমতো বসিয়ে দেবে। কলকাতায় বেশীদিন থাকবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের আগ্রহে আর যাওয়া হলো না। কলকাতায় আসবার পরে আজাদ সাহেবের মা মারা যান। আজাদ তখন শিশু। বড়ো হয়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আসেন। তারপরে তাঁর মাধ্যমেই বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ। তারপরে একটা সুযোগ আসে বাইরে যাওয়ার। ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও তুর্কি। এসব ১৯০৮ সালের কথা। মিশরে তিনি নব্য তুর্কির জনক মুস্তাফা কামাল পাশার অনুগামীদের সংস্পর্শে আসেন। তারপরে দেশে ফিরে এসে উর্দু পত্রিকা 'আল্ হিলাল'-এর প্রকাশ। আলহিলাল তখনকার দিনে দারুণ জনপ্রিয় ছিল, বহুবার রাজরোষেও পড়েছিল জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার পর ১৯১৫ সালে 'আল হিলাল' প্রেসই ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করেছিলো। আজাদ আর একটা প্রেস করে তার নাম দেন ' আল বলখ,' পত্রিকাও বার করেন ঐ নামে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুরা তাও বন্ধ করে দেয়। ওঁকে কলকাতা থেকে বের

করে দেওয়া হয়। তারপরে রাখা হয় রাঁচীতে অন্তরীণ করে। ১৯২০ সালে অন্য সব বন্দীদের সঙ্গে উনিও মুক্তি পান। এরপরে খিলাফৎ ও গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। গান্ধীজীর সংস্পর্শে এলেন আজাদ। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন বসে, যাতে লালা লাজপৎ রায় সভাপতিত্ব করেন, তাতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এরপরে ঐ সালেরই ডিসেম্বরে বসলো কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন নাগপুরে। লালাজী ও দেশবন্ধুর সমর্থনে অসহযোগ আন্দোলন যখন বেশ জোরদার তখনই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন, কায়েদে আজম জিন্না, পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের প্রবক্তা ও পাকিস্তানের স্রষ্টা। আজাদ সাহেব ওই সময় দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সঙ্গে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন। ১৯২২ সলের গয়া কংগ্রেসের পর মতিলাল নেহরু ও হাকিম আজমল খানকে নিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ্য পার্টি' গড়ে তুলেছিলেন, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে আজাদ সাহেবের নাম খাঁটি জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে।

দাদু আর কিছু বলেন নি, আমরা আস্তে আস্তে উঠে অন্য ঘরে চলে এসেছিলাম। একটা জানালার ধারে শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলো শেফালী। তার কাজ যেন শেষ হয়ে গেছে,—এখন আর করার কিছু নেই,—কিন্তু তবু তার রেশ তার সমগ্র সত্তায় যেন রিণ্‌রিণ্‌ করে বাজছে! আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ফিস-ফিস করে বলার মতো সুরে, ঐ আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করলো,—তোমার উত্তর পেয়েছো?

আমি খুব সংক্ষেপে একটি কথা উচ্চারণ করলাম,—বোধ হয়।

শেফালী আমার দিকে আরও একটু সরে এসে দাঁড়ালো, বললো,—আমার দাদুর স্মৃতির দরজা তুমি খুলে দিয়েছো সেজন্য

আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

একটা আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, কোনক্রমে বললাম,—আর আমি? আমি যে নতুন জীবন পেলাম! ও হাতখানা চেপে ধরলো, বললো,—আমাদের কাজ কী শেষ হয়েছে? হয় নি। ইতিহাসের জের টেনে আমি আজকের দিনের কথা পর্যন্ত আসতে চাই। আজকের কথা দাদু অবশ্য জানেন না, কিন্তু তুমি ত জানো? তুমি আমাকে যেমন সাহায্য করেছো, তেমনি করবে না? একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

ও তেমনি করে আমার হাতখানা ধরে রইলো, বললো,—কতো কথাই না আমরা জানতে পারলাম। ঐ যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন,—শিক্ষাভিমানী ভদ্রলোক নয়, দীন দরিদ্র কৃষক-মজুরই জাতির মেরুদণ্ড,—কথাটার ব্যঞ্জনা কি কম? আবার দেশবন্ধুর কথা স্মরণ করো। তিনি বললেন,—আমাদের জাতীয়তা ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানীর মতো একদেশদর্শী নয়, আমাদের জাতীয়তা অন্য কোনো দেশের স্বার্থে আঘাত করে না। এর পরে আসে নেতাজীর কথা। তিনি বলে গেছেন,—আমরা চাই জাতিকে মহাজাতিরূপে গড়তে। আমাদের সামনে আদর্শ নেই, শুধু মরীচিকা,—এ-কথা বলা চলে কী?

বলা বাহুল্য, আমি শেফালীকে কিছু বলতে পারি নি সে সময়। ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা সেদিন ছিল বিপ্লবীদের মানসিক ভিত্তিভূমি, কিন্তু আমাদের।

অবশ্য আমাকে এ-যুগের প্রতিভূ ধরলে ভুল হবে, কিন্তু আমি তো, ঐ যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বতন্ত্র-সত্তা নই। সেজন্যই আমি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। ভাবছি, শেফালীর কাজে সত্যি সত্যিই লেগে যাবো কি না।

অথবা, শরীর যখন সেরে গেছে, তখন ছুটি নিয়ে চলে যাই।

কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে বেশিদিন থাকতে হলো না। দাদু হঠাৎ চলে গেলেন। একদিন রাত্রিশেষে দেখা গেল, বিছানা ছেড়ে তিনি ওঠেন নি, শান্ত হয়েই ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু চিরনিদ্রায় অভিভূত। যেন তাঁর সমস্ত বোঝা আমাদের কাছে নামিয়ে দিয়ে, হাল্‌কা হয়ে, নিজের পথে চলে গেছেন।

সলিলবাবু এলেন, লোকজন আরো এলো, শবানুগমন ইত্যাদি। কিন্তু শেফালী আমাকে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখলো, বেরুতে দিলো না। বললে - তুমি বেরিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু আমার চলবে কী করে এখন, তোমাকে ছাড়া? কে আছে আমার?

অতএব, থেকে গেলাম আপাতত। দাদুর শেষ কাজটা চুকে যাবার পর শেফালী নতুন খাতাপত্র নিয়ে আমার সামনে বসতে শুরু করলো। শুরু হলো আমাদের কাজ। এ কাজও একদিন শেষ হবে জানি, কিন্তু তারপরে কী হবে জানি না।

শেফালী কাজ করতে করতে একদিন বললে—দাদু সব বলেছেন, একটি কথা বলেননি। সেটা পেলাম আরেকখানা ছোট্ট খাতায়। কখন ভুলে বিছানার তলায় রেখেছিলেন কে জানে। তাতে লেখা আছে নিবেদিতার কথা। নিবেদিতা গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র বেড়াতে। সেই কুরুক্ষেত্র, যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা এক পরিচিত কর্ণেলের বাংলোয় অতিথি হয়ে আছেন। একদিন রাত্রে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা শব্দে। কে যেন কী আবৃত্তি করছে কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর থেকে। সম্মোহিতের মতো সেই অন্ধকারে কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরেব দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন নিবেদিতা। যতো যান, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই অশরীরী কণ্ঠের আবৃত্তি, গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোক,—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভারতে যখনই ধর্মের গ্লানি ঘটবে, আমি তখনি আসবো: দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করতে, যুগে-যুগে।

আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।